সূর্যাবর্ত

অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত

নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

সম্পাদকের কথা

বর্তমান সংকলন সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথা বলা দরকার তা হল এই যে, গত বৈশাখ মাসে ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় যে-রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল আলোচ্য সংকলনে সে রচনাগুলি ছাড়াও আরও কিছু অত্যন্ত মূল্যবান রচনা ও চিত্র সংযোজিত হল। এখানে প্রবীণ এবং নবীন বহু সমালোচকের রচনা একত্রে স্থান পেয়েছে; সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে একেবারে প্রথম যুগের রবীন্দ্র-সমালোচকদের কিছু কিছু রচনা। তাছাড়াও বাংলার বাইরের কয়েকটি রচনাও গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সমস্ত মিলিয়ে আলোচ্য সংকলনটি সাধারণ পাঠককে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বহুব্যাপ্ত প্রতিভা সম্বন্ধে—অল্প পরিমাণে হলেও—একটা সর্বাঙ্গীণ ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

একটি রবীন্দ্রনাথের মালা গাঁথতে বসে ‘নানা রবীন্দ্রনাথের মালা’ হয়তো গাঁথা হল। তাতে রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি নেই কিন্তু পাঠকের বিলক্ষণ লাভ আছে। সেই লাভের কথা স্মরণে রেখেই আমরা ‘সূর্যাবর্ত’ প্রকাশে উদ্যোগী হলাম। আশা করি সংকলনটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

সূচীপত্র

॥ সংকলনে সংযোজিত চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ॥
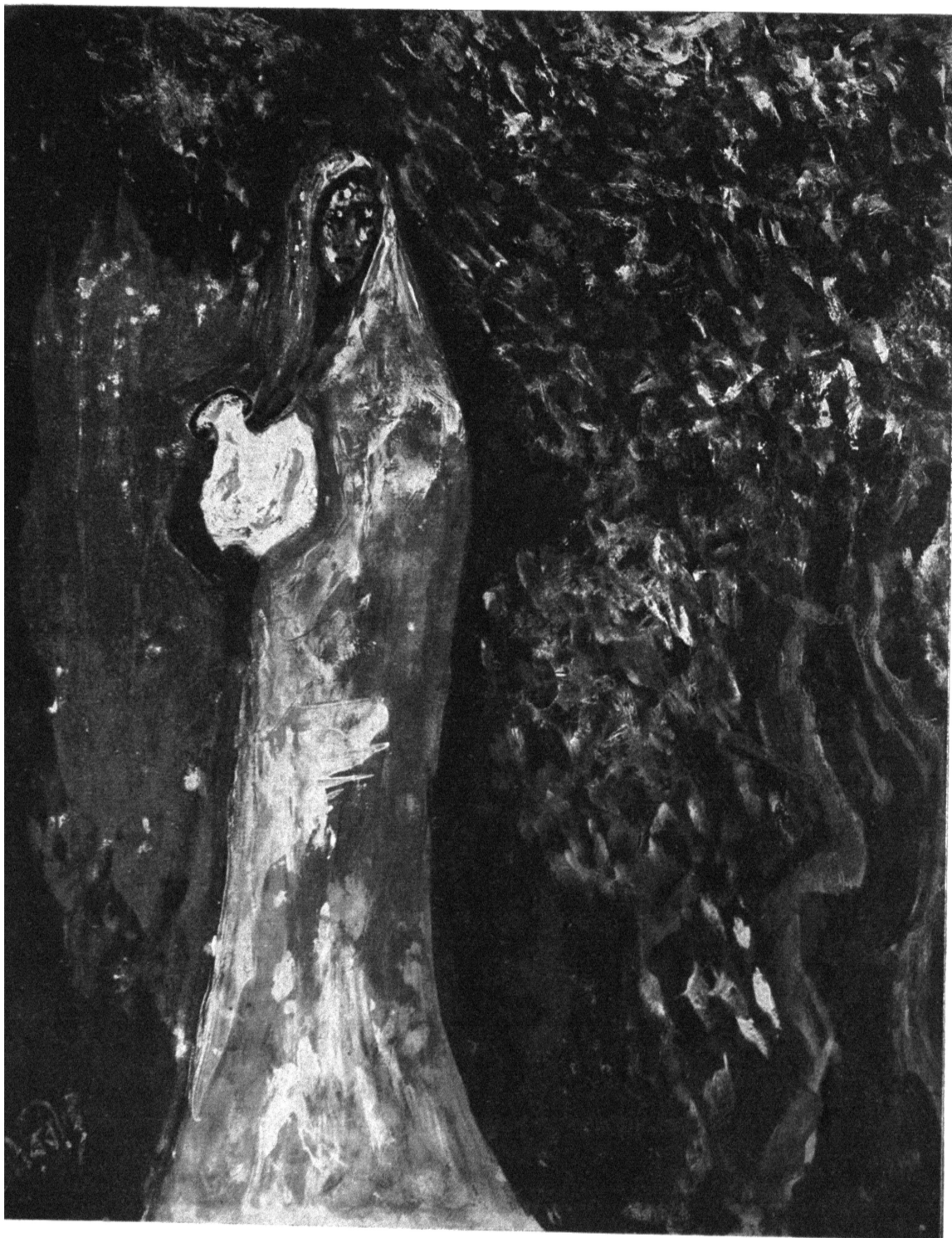
রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক ॥ বুদ্ধদেব বসু

এক

বাংলায় স্বভাবকবি কথাটা বোধহয় প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ ক'রে। কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কোনো এক বোদ্ধা ব্যক্তিই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো, তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে-শ্রেণীবিভাগের অনুক্ত উল্লেখ আছে সেটাকেও অর্থহীন বলা যায় না। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেছিলেন, তাতে মুক-মিল্টনী কুসংস্কারের উচ্ছেদ হ'লো, কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা যে টিকে গেলো তার রীতিমতো একটা কারণ আছে। অবশ্য সাধারণ অর্থে কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, যেহেতু কোনো-রকম শিল্পরচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না, কিন্তু বিশেষ অর্থে অনেকে তার ব্যতিক্রম—বা বিপরীত—যদিও সেই উল্টো লক্ষণের এরকম কোনো সহজ সংজ্ঞার্থ তৈরি হয়নি। এই অর্থে 'স্বভাবকবি' বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি—সেকথা তো না-বললেও চলে; বোঝায় সেই কবিকে, যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যাঁর মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিনসম্বন্ধ। এ-কথা সত্য যে কবিতায় আবেগের তাপ না থাকলে কিছুই থাকলো না, কিন্তু সেই আবেগটিকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হ'লে তার দাস হ'লে চলে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে শাসন করতে হয়। এই শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যেখানে নেই, সেখানেই এই বিশেষ অর্থে 'স্বভাবকবিত্ব' আরোপ করতে পারি। এই লক্ষণ কবিদের মধ্যে বর্তায় কখনো বা ব্যক্তিগত কারণে আর কখনো বা ঐতিহাসিক কারণে; কেউ-কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি, আবার কোনো-কোনো সময়ে সাহিত্যের অবস্থার ফলেই স্বভাবকবি তৈরি হয়ে থাকে। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে বলা যায় স্বভাবতই স্বভাবকবি, একেবারে খাঁটি অর্থে তাই; কেননা, হার্দ্যরসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, অসংযমজনিত পতনের তিনি উল্লেখ্য উদাহরণ, উপরন্তু তাঁর রচনায় এই অদ্ভুত ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বমুদ্ধ তিনি অনুভব করেননি। অথচ এ-কথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে তিনি রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেতো, কেননা ঐ দীক্ষার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা: রবিরাজত্বের প্রথম পর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তাঁদের সংখ্যা বড়ো কম না।

এ কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবি-কিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো, বলতে গেলে বিধিলিপি? কেন? অবশ্যই রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। রবীন্দ্র-নাথের মধ্যাহ্ন তখন, তাঁর প্রতিভা প্রখর হ'য়ে উঠছে দিনে-দিনে, আর যদিও সেই আলোকে কালো ব'লে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ব'সে ভোগ করা যায়; তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে-পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও

আমরা ভালো করে জানি না—কিংবা বুঝি না—সে-কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান। তবু আজকের দিনে তাঁর সম্মুখীন হবার সাহস পাওয়া যায়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আরো কিছু ঘ'টে গেছে—কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে—দ্বিতীয় দশকেও—কী অবস্থা ছিলো? অপরিসর ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্য—তার মধ্যে এই বহ্নিবীজ, আগ্নেয়সত্তা: একি সহ্য করা যায়? না;—দাশরথি রায়ের নেহাৎ চাতুরী, রামপ্রসাদের কড়া পাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা, এমনকি মধুসূদনের তূর্যধ্বনি—আগে যখন এর বেশি আর-কিছু নেই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত হওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু সহজ ছিলো না তাঁকে সহ্য করা, এমনকি— সেই প্রথম সংঘাতের সময়—গ্রহণ করাও সম্ভব ছিলো না। এর প্রমাণ দু-দিক থেকেই পাওয়া যায়: সমালোচনার মহলে নিন্দার অবিরাম উত্তেজনায়, আর কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের প্রতিরোধহীন আত্মবিলোপ। উপরন্তু অন্য প্রমাণও মেলে, যদি পাঠকমণ্ডলীর মতিগতি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠকসংখ্যা আজ পর্যন্ত অল্প—তাঁর খ্যাতির তুলনায়, তাঁর বিচিত্র বিপুল পরিমাণের তুলনায় অল্প; আর যাঁরা বাংলাদেশের পাঠকসাধারণ, বড়ো অর্থে পাব্লিক, তারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের স্বাদ নিয়েছে—রবীন্দ্রনাথে না, তাঁরই দুই তরলিত আরামদায়ক সংস্করণে: গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা—যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন, এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদ্গত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন—তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এতো অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না—আর সত্যেন্দ্র দত্তও শেষ পর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হ'য়ে থাকলেন—এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক। এ-সব লক্ষণ থেকে সংগত মীমাংসা, এই কবিদের শক্তির দীনতা নয়, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা অনেকেই এঁরা লিখেছেন—সে-মীমাংসা এই যে তাঁরা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য দেশের অধিবাসী—কিংবা পরবাসী। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা, বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মায়াত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাঁদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর 'চিত্রা', 'চিত্রা'র পর 'কথা ও কাহিনী', আর তারপরে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি' —সেই মায়ায় না-ম'জে কোনো উপায় ছিলো না তাঁদের;—সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের রমণীয় হলো; স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হ'লো আত্মচেতনা; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে রিনিঠিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হ'লেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না; তাঁদের কাছে এ-কথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে-গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই

সরলতা প্রকৃতপক্ষেই জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপতিকরূপে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত কুটিল; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্যমথিত; আরো গভীর ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো—এমনকি—খরদন্ত মকর-নক্রের দুঃস্বপ্ন-নীড়। যে-আশ্রমে তাঁরা স্থিত হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ্য করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তা-ই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই করেননি। এই ভুলের জন্য—ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ;—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা;—আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হলেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক ক'রে গেছেন।

দুই

আবার বলি, এ রকম না হ'য়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ছিলো না। এ-কথাটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু রবিপ্রতিভার বিস্তার, আর তার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করলে এ-বিষয়ে প্রত্যয় জন্মে। আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের—দিতে হচ্ছে। সে-মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন ক'রে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয়; তাঁর পরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেননি; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে—ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা—তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকা চাই। আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হ'য়ে গেলো; ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্ররকমের স্তবক-বিন্যাসের নমুনা—সব তৈরি আছে, আর কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখার আরম্ভ এবং শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলো না সেটা—কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হ'ঠে যাননি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই—আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক—তিনি সব সময় দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!' পরবর্তীদের দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে ভক্তির সঙ্গে সুবুদ্ধি-জাগানো ভয়ের ভাবও জাগতে পারে। দান্তের মতো, গ্যেটের মতো, স্বর্গ-মর্ত্য-নরকব্যাপী বিরাট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর মধ্যে, নেই শেক্সপিয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা, এমনকি মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের ব্যূহরচনাও নেই। তাঁকে পাঠ করার অভিজ্ঞতাটি একেবারেই নিষ্কণ্টক—আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনে যেন মৃণালসূত্রেরও ব্যবধান নেই; কোনোখানেই তিনি দুর্গম নন, নিগূঢ় নন—অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তা-ই মনে হয়; একবারও তিনি অভিধান পাড়তে ছোটান না আমাদের, চিন্তার চাপে ক্লান্ত করেন না, অর্থ খুঁজতে খাটিয়ে নেন না কখনো। আর তাঁর বিষয়বস্তু—

তাও বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্য নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভ'রে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন, আবহমান-ইতিহাস লুঠ করেননি, পারাপার করেননি বৈতরণী অলকনন্দা। এইজন্য তাঁর অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তাঁর প্রলোভনও তেমনি দুর্দমনীয়। 'মনে হচ্ছে আমিও অমন লিখতে পারি ঝুড়ি-ঝুড়ি', এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রশ্রয় দেয় তাঁর রচনা, যাতে আপাতদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও না—এতই সহজে তা ব'য়ে চলে, হ'য়ে যায়—মনে হয় যেন 'ও-রকম' লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যায়—একটুখানি 'ভাব' আসার শুধু অপেক্ষা। অন্ততপক্ষে আলোচ্য কবিরা এই মোহেই মজেছিলেন, রবীন্দ্র-নাথের 'মতো' হ'তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা—কি বড়ো জোর তাঁর ছেলেমানুষি সংস্করণ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; এই নির্ভরতা এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ তিনি। যেহেতু তাঁর লেখায় পাঠকের কোনো পরিশ্রম নেই, তাই এমন ভুলও হ'তে পারে যে চোখ ফেললেই সবটুকু তাঁর দেখে নেয়া যায়; যেহেতু তাঁর বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যাপ্তি নেই, তাই এমনও ভুল হ'তে পারে যে ক্ষুদ্রতর কবিদের পক্ষে তাঁর পথই প্রশস্ত। 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসেবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'—রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে তাঁর নিজের এবং অন্য কবিদের বিষয়ে অনেক কথাই বলা আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন, 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী'-পূর্ব কবিতাবলীকে লক্ষ্য ক'রে, যে-সব কবিতার দুষ্যতা তিনি দেখেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায়। উপাদান বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে তাঁর পরিণত কালের অনেক কবিতাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-'প্রভাতসংগীতে'র সধর্মী, এমনকি সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যই তা-ই; তাঁর কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই 'ছেলেমানুষি', যাকে তিনি বিষয় হিশেবে 'অতি উত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'ছেলেমানুষি'র মানে হ'লো তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানারকম পদার্থের সন্নিপাত নয়, ভিতর থেকে আপনি হ'য়ে-ওঠা, যেন ঠিক মনের কথাটির অবারিত উচ্চারণ। চারদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে-দিনে যেমন ক'রে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তাই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন; প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক-একটি রঙিন বেদনা—তাই ধ'রে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণ বিমুখ; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা, আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়, কিন্তু কেমন করে তা ক'রে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু; শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হ'তে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বের জন্য—আর-কোনোই কারণ নেই তার।

এই রকম কবিতা জীবনের পক্ষে সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ অনবরত চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা বিপদে পড়েন। বিপদটা কোথায় তা বুঝিয়ে বলি। সব মানুষেরই অনুভূতি আছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আছে; যখন দেখা যায় যে তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হ'য়ে উঠছে আর সেই প্রকাশটাও 'নিতান্তই

সোজাসুজি', তার পিছনে কোনো আয়োজন আছে ব'লে মনেই হয় না, তখন যে-কোনো রকম অনুভূতির কাছেই আত্মসমর্পণের লোভ জাগে অন্য কবিদের, কিংবা খাঁটি বস্তুটির অভাবে—নিজেরাই তাঁরা নিজের মন উশকে তোলেন। আর তার ফল কী রকম দাঁড়ায় তারই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাই—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। অনেকের মধ্যে তাঁকে বেছে নিলুম সুস্পষ্ট কারণে; সমসাময়িক, কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে রচনা শক্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ, এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা যায়। হ্যাঁ, চেনা যায়, আলাদা একটা চেহারা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই চেহারাটা কী-রকম তা ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো কেন, রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না। তফাৎটা জাতের নয় তা বলাই বাহুল্য; একই আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও নয় এটা; আবার বড়ো কবি ছোটো কবির তফাৎ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও একে বলা যায় না। ইনি ছোটো কবি না বড়ো কবি, কিংবা কত বড়ো কবি—সমালোচনার কোনো-এক প্রসঙ্গে এ সব প্রশ্ন অবান্তর; ইনি খাঁটি কবি কিনা সেইটাই হ'লো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই—সেটাকে তো অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাত দৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজসরঞ্জাম—সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম, কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এই রকম প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই, যে-বিশ্বাসের উত্তাপ, যার জন্য 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা, সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা প'ড়ে অনেক সময়েই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতি'-টাই কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা।

যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ'লো দিবাস্বপ্নে; যে-ফুল ছিলো বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা হ'য়ে উঠলো শৌখিন খেলনা, ভাবুকতা হ'লো ভাবালুতা, সাধনা হ'লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হ'লো লাল পরি নীল পরির আমোদ-প্রমোদে। সেই সঙ্গে রীতির দিক থেকেও ভাঙন ধরলো; রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যে-মধুরতা, যে-মদিরতা, তার অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম, রুচি, সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে যে-ধরনের লেখার প্রবর্তন হ'লো তাতে থাকলো শুধু মিহি সুর, ঠুনকো আওয়াজ, আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতার অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল ক'রে নিয়েছিলেন, যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'তে পারে। তখ্‌কার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো, বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন ক'রে চেয়েছিলো, তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ। শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকের কাছে; তাই তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা লেখা খেলা বা ছন্দঘটিত ব্যায়াম। খেলা জিনিশটা সাহিত্য রচনায় অনুমোদনযোগ্য, যতক্ষণ তার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে; সেটি না-থাকলে তা নেহাৎই ছেলেখেলা হ'য়ে পড়ে।* আর এই উদ্দেশ্যহীন কসরৎ, শুধু ছন্দের জন্যই ছন্দ লেখা, এই প্রকরণগত ছেলেমানুষি, কোনো-

* এই উদ্দেশ্য মানে সুস্পষ্ট কোনো বিষয় নাও হ'তে পারে; অনেক সময় শুধু একটি অনুভূতি থেকেই লক্ষ্য পায় রচনা, পায় সার্থকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি। উদাহরণত তুলনা করা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলতুল টুকটুক। টুকটুক তুলতুল। কোন্ ফুল

এক সময়ে ব্যাপক হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো বাংলা কাব্যে ; সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমে, যখন, এমনকি তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো, সেই সময়ে যে-সব ভূরিপরিমাণ নির্দোষ, সুশ্রাব্য এবং অন্তঃসার-শূন্য রচনা 'কবিতা' নাম ধ'রে বাংলাভাষার মাসিকপত্রে বোঝাই হ'য়ে উঠেছিলো, কালের করুণাময় সম্মার্জনী ইতিমধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের, তারপর তাঁর শিষ্যদের হাতে সাত দফা পরিস্রুত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত যখন ঝুমঝুমি কিংবা লজঞ্চুষের মতো পদ্যরচনায় পতিত হ'লো, তখনই বোঝা গেলো যে ওদিকে আর পথ নেই—এবার ফিরতে হবে।

তিন

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু ঐতিহাসিক অবস্থাটি দেখাতে চাচ্ছি। তাঁদের সপক্ষে যা-কিছু বলবার আছে তা আমি জানি ; প্রবন্ধের প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে তা বলাও হয়েছে। সময়টা প্রতিকূল ছিলো তাঁদের, বড্ড বেশি অনুকূল ব'লেই প্রতিকূল ছিলো ; রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করা—এছাড়া আর কবিকর্মের ধারণাই তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দুজন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাই আমরা—প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাথ ; কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলাদেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময় ; রবীন্দ্রনাথের প্রথম, এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটি তাঁরা সামলে নিলেন—অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন ; তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী আমরা। এই শেষের কথাটা শুধু বিচার ক'রে বলছি না, এ-বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অধিকার আছে আমার। কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল ; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের জাদু—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার ; আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম* এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি ; সে-কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর

তার তুল। তার তুল কোন্ ফুল। টুকটুক রঙ্গন। কিংশুক ফুল্ল। নয় নয় নিশ্চয়। নয় তার তুল্য' ; আর রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী। তুমি মধু মঞ্জরী। পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন। স্বর্ণের পাত্রে। ফাল্গুন রাত্রে। মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।' এ-দুটি একই ছন্দে লেখা, প্রায়ই একই রকম খেলাচ্ছলে রচিত, আর কোনোটিতেই স্পর্শসহ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু কেন যে দ্বিতীয়টি ছন্দের আদর্শ হিশেবেও অতুলনীয় রূপে বেশি ভালো হয়েছে তার কারণ শুধু অনুপ্রাস আর যুক্তবর্ণের বিতরণ দিয়েই বোঝানো যাবে না, তার কাব্যগুণের কথাটাই এখানে আসল। প্রথম উদাহরণটি অনুভব ক'রে লেখা হয়নি, নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে বানানো হয়েছে, তাই ওর ছন্দটাও এমন কাঁচা, এমন বালকোচিত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে প্রাণের যে-স্পর্শটুকু আছে, যার জন্য ওটি কবিতা হ'তে পেরেছে, তার ছন্দোনৈপুণ্যেরও মূল কারণটা সেখানেই খুঁজতে হবে। কথাটা এই যে, ভালো কবি না-হ'লে ভালো ছন্দও লেখা যায় না ; যিনি যত বড়ো কবি কলা-কৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর ; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে—শেষ পর্যন্ত—ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।

* অবশ্য একটি বিরুদ্ধ ভাবও দেশের মধ্যে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো, কিন্তু তার সমস্তটাই সমালোচনার ক্ষেত্রে· আর সেই সমালোচনাও বুদ্ধিমান নয়, শুধু ছিদ্রান্বেষী। যেটা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' যাওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপ চিনিয়ে দেয়া। এইখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিপিনচন্দ্র পাল কোনো সাহায্য করেননি ব'লেই বাংলা কবিতার ভাঙা-গড়ায় তাঁরা একটুও আঁচড় কাটতে পারলেন না।

লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ; রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর 'বলাকা' ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না। আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই ; আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটেনি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে ; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যও কিছু বেশি ; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতার যে-আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই, কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, ভিন্ন একটা ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে—শহরে নয়, মফঃস্বলে, স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে ; বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে ; তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না ক'রে উল্টে আরও সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন। তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো সে-পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন ; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না কিংবা তেমন কাজে লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানাদিকে ; এলেন 'স্বপনপসারী'র সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য বিধর্মিতা,—আর এইসব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।

চার

নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন ; তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না-হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না-থাকতো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিল না, সেটা তিনি সংক্রমিত ক'রে দিলেন

অন্তরের মনে; যে-প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল-'যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্য প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর-কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ্য করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেইসব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে। অত্যধিক মধুপানজনিত অগ্নিমান্দ্য ব'লে উড়িয়ে দেয়া যাবে না এটাকে, কেননা, চিকিৎসাও এরই মধ্যে নিহিত ছিলো, ছিলো ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হ'লো। ফজলি আম ফুরোলো ফজলিতর আম চাইবো না, আতাফলের ফরমাশ দেবো—'শেষের কবিতা'র এই ঠাট্টাকেই তখনকার পক্ষে সত্য ব'লে ধরা যায়।* অর্থাৎ, রবীন্দ্রেতর হ'তে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ মাত্র হ'তে হয়, এই কথাটা ধরা পড়লো এতদিনে;—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো—রবীন্দ্রেতর হওয়া।

অবশ্য এইভাবে কথাটা বললে ব্যাপারটাকে যেন যান্ত্রিক ক'রে দেখানো হয়, খানিকটা জেদের ভাব ধরা পড়ে। জেদ একেবারেই ছিলো না তা নয়, স্রোতের টানে জঞ্জালও কিছু ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এই বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো, যখন, 'কল্লোলে'র ফেনা কেটে যাবার পরে, চিন্তায় স্থিতিলাভের চেষ্টা দেখা দিলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়ে', আর 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের স্বাক্ষর পড়লো একে-একে। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা হাওয়ার ধোঁয়া কাটাতে সাহায্য করলো; এদিকে, নজরুলের চড়া গলায় পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পরে, বাংলা কবিতায় দেখা দিলো সংহতি, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রকম পরিবর্তন কাল-

* এর আগের লাইনেই অমিত রায় বলছে, 'এ-কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' এটা একেবারেই খাঁটি কথা। কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে ভালো আর আরো-ভালোর তফাৎটা তেমন জরুরি নয়, সমগ্রভাবে কবির সঙ্গে কবির তুলনাই এই তারতম্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ অন্যান্য বাঙালি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদিও অপরিমেয় ব্যবধান, তবু যে-কোনো ক্ষুদ্র কবির কোনো-একটি ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই 'সমান' ভালো হ'তে পারে যদি তাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে চরিত্রের পরিচয়। আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ফজলি আম ফুরোবার পর চালান-দেয়া মাদ্রাজী আম অথবা আম্রগন্ধী নিরাপের চাইতে ঢের ভালো ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত আতাফল, যেমন ভালো মাইকেলের পরে, 'বৃত্রসংহারে'র চাইতে 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতাটিতে 'কল্লোল'কালীন আন্দোলনেরই একটি বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—যদিও পরিহাসের ছলে, আর অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়মও লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তীর ওকালতি ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু বক্তৃতার পর কবিতাটি যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হ'লো না ব'লেই তার মামলা কেঁশে গেলো শেষ পর্যন্ত।

প্রভাবেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু তার ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োজন হয়। আর বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ-দুজনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত, তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন; এঁদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের চিত্ত শুধু ভোগ না-ক'রে, তাকে সাধ্যমতো সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে-জিনিশটি পাই না। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো—অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই কাজ ক'রে গেছে এঁদের মনে; কোনো কবি, জীবনানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রে গেলেন, আবার কেউ-কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে—সংগ্রামই বলা যায় এটাকে—এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে; দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনভুক্ পিশাচ-প্রমথর বর্ণনায়, রাবীন্দ্রিক বাক্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে দিলেন, আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই জগতের অধিবাসী হ'য়েও তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানারকম গদ্য বিষয়ের আমদানি ক'রে। অর্থাৎ, এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। 'বেলা যে প'ড়ে এলো জলকে চল্'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো', আর 'কলসী কাঁখে ল'য়ে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলছি মৃদু তালে'—এই রকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই; দশ বছর আগে এ-রকমটি হ'তেই পারতো না। সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন নিজেরা তা না জেনে—সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে; আর এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্তো-আস্তো লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিঃকুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস—এটাই এঁদের আত্ম-বিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকম ভাবেই কীটদষ্ট হোক-না, এঁরা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হ'লো অন্তত এই কারণে যে বাংলা কবিতার একটি সংকটের সময়ে এঁরা এই মৌল সত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন যে সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে জীবন দিয়ে সন্ধান করতে হয় এবং কাব্যকলাও উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।

নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরও পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর-কোনো ভয় থাকলো না তাঁদের, সে-ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য দুটো-একটা বিপদ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে; যেমন জীবনানন্দের পাক, কিংবা বিষ্ণু দে-র বা অন্য

কারো-কারো আবর্ত, যা থেকে চেষ্টা ক'রেও বেরোতে পারছেন না আজকের দিনের নবাগতরা। এতে অবাক হবার বা মন খারাপ করার কিছু নেই; এই রকমই হ'য়ে এসেছে চিরকাল; পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোশা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যাঁরা কবিতা লিখছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনিক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত;—সেটা কোথা থেকে এসেছে, তা আমি জানি, যথাসময়ে তার সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ ব'লে মনে না-ক'রে পারি না। 'চোরাবালি' কিংবা 'খসড়া' লেখার সময়ে যে সব কৌশল ছিলো প্রয়োজনীয়, আজকের দিনে অনেকটাই তার মুদ্রা-দোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; আর তাছাড়া যখন ভঙ্গি নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা দেখা যায়—যেমন চলতি কালের ইংরেজ-মার্কিন কাব্যে—তখনই বুঝতে হয় মনের দিক থেকে দেউলে হ'তে দেরি নেই। আমি এ-কথা ব'লে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলা-কৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরেও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে কবিতা লেখা হয়—স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়, কিছু বলবারই জন্য, আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো, যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশ, প্রকরণগত কৃতিত্বও সেখানেই তত বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় এখন বাংলা কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনার সময় এসেছে নতুন ক'রে, প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার। আর এইখানে রবীন্দ্রনাথ সহায় হ'তে পারেন, এ-কথাটি বলতে গিয়েও থেমে গেলুম, যেহেতু আদি উৎস বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তি বন্ধন থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘ'টে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই; রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে; বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে এইখানে।

রবীন্দ্রোত্তর কাল ॥ সরোজ আচার্য

সাহিত্যের কাল-চিহ্ন সব সময়ে অর্থবোধক নয়; বিশেষ করে সমসাময়িক সাহিত্যের কাল-লক্ষণ নির্ণয় করতে যাওয়া দুঃসাহসিকতা। তবু সময়ের এক একটি পর্বকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রায় বারো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বারো বৎসরকে অনেকেই হয়তো রবীন্দ্রোত্তর যুগ বা যুগের সূচনা বলে অভিহিত করতে চাইবেন। কিন্তু যুগ বলতে কতগুলি সুদৃঢ়, সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ও সেগুলির পূর্ণ বিকাশের সাক্ষ্য থাকা চাই। এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্ব এখনও ঠিক যুগ-হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পারে না। হয়তো এই সময়টাকে রবীন্দ্রোত্তর কাল বলাই ঠিক—সময়ের বিপুল প্রবাহে নানা সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে; বিচিত্র, পরস্পর-বিরোধী আবেগ ও কল্পনা, প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতির ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আমাদের এই কাল মুখর, বেগবান। এটা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু কালপ্রবাহের মতোই আমাদের এই সাম্প্রতিক সাহিত্য-প্রচেষ্টা অস্থির, চঞ্চল।

তাই একে যুগ হিসেবে চিহ্নিত করার সময় এখনও আসেনি। হয়তো সব কালেই সাহিত্যিক প্রয়াস এই রকম। তবে রবীন্দ্রনাথের যুগে সাহিত্যধর্মের একটা দৃঢ় ভিত্তি ছিল, মানস-কেন্দ্র স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেত, এটা আমরা অনুভব করেছি। সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সকলের অনুভূতি এখনও এমন কোনো স্থিতিস্থাপক ভিত্তিভূমি পায়নি। এ নিয়ে আক্ষেপ করার কারণ নেই, এর জন্য সমসাময়িক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে লাভ নেই।

মাত্র বারো বৎসরের ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু থেকে। বারো বৎসর এই রবীন্দ্রোত্তর কালে আমরা কি হারিয়েছি এবং কি পেয়েছি তার হিসাব-নিকাশ করা সহজসাধ্য নয়। আরও একটা কথা—বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কালে যেসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার মূলে নিছক সাহিত্য সম্পর্কিত ভালো-মন্দ, দোষ-ত্রুটি ক্রিয়া করছে না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে আদর্শ-সংঘাত, মোহভঙ্গ অথবা নূতন মোহসৃষ্টি—সব কিছু মিলে সাম্প্রতিক সাহিত্যের পটভূমি জটিল করেছে; জীবনে এবং সাহিত্যেও সংকটের চেতনা তীব্র হয়েছে। কেবল সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেরই লক্ষণ এটা নয়; যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে পৃথিবীর অনেক দেশেই সংকটের তীব্র অনুভূতি সাহিত্য-জগৎকে নানাভাবে খণ্ডিত, বিভক্ত করেছে।

তবু মনে হয় অন্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রয়াস অনেক বেশি সুস্থ, আদর্শনিষ্ঠ। সাহিত্যিক গোষ্ঠীগত বিতর্ক ও বিবাদ চিরদিনই ছিল এবং থাকবে। আমাদের সাহিত্যিকেরা নিরুদ্যম হননি—নানা বিপর্যয় এবং ভাব-সংঘাতের মধ্যেও। ই, এম, ফর্স্টার একবার রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাঙালীদের প্রবল উৎসাহ, ব্যর্থতায় তারা ভেঙে পড়ে না, কারণ বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের স্বভাব। বিশ্ব-সমস্যার অর্থ অবশ্য রাজনীতি নয়—মানুষের সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা নিয়ে আমাদের সাহিত্যিকদের কৌতূহলের অন্ত নেই, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার এবং অনেক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রোত্তর কাল রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী।

রবীন্দ্রনাথ থেকে সময়ের হিসাবে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তাঁকে ভুলতে পারিনি, পারা সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই রবীন্দ্রোত্তর কালের সূচনা। ইংরেজি সাহিত্যে যাকে বলে 'পোস্ট শেক্সপীয়রীয়' যুগ সেইকালে শেক্সপীয়রের প্রতিভা ও শিল্প-কৌশল অনুকরণে, ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে অনেকখানি বিকৃত হয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রোত্তর কাল কিন্তু এদিক থেকে প্রায় দোষমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারত্ব সগৌরবে স্বীকার করেও আমাদের সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের রোমন্থনে মন দেননি। অনেকে হয়তো কল্পনা করে আনন্দ পান, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কী-ই না হত। এই কল্পনা রবীন্দ্রনাথের উপরে আমাদের অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন; পূর্বগামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এটা একটা লৌকিক রীতিও বটে। মনে পড়িয়ে দেয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রসিদ্ধ সনেটের আক্ষেপ—আহা, মিল্টন যদি আজ বেঁচে থাকতেন! যদি থাকতেন তবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আশা পূর্ণ হতই এ-কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বর্ণসের সমাধিস্থান দর্শনে গিয়ে স্কটল্যাণ্ডের সমসাময়িক রুচিবিকার ও বিষয়ী সংকীর্ণতা দেখে কীটস মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন, বর্ণস বেঁচে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতেন দ্বিতীয়বার। রবীন্দ্রোত্তর কালে আমাদের দেশের হালচাল দেখে রবীন্দ্রনাথ কিরকম অনুভব করতেন সেটা কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু কথাটা আমাদের সমসাময়িক কালের নিন্দা বা প্রশংসা নিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রোত্তর কালের কথা ভাবাই অসম্ভব। তাই বলে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল বোধ করাও হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথ নেই বলে আমাদের সমস্ত সাহিত্য প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ হচ্ছে, এরকম কার্যকারণযোগে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

প্রতিভার আবির্ভাব কোনো নিয়ম মেনে চলে কিনা, সেই দুরূহ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নিয়ে পণ্ডিতদের বিতণ্ডা কোনোদিন শেষ হবে না। তবে প্রতিভার চাহিদা এবং যোগান ব্যাপারে প্রকৃতি বা সমাজের মিতব্যয়িতা খুবই স্বাস্থ্যকর। প্রতিভা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে বিবর্তিত হত, একের পর এক রবীন্দ্রনাথ কি শেক্সপীয়র সৃষ্টি হত, তাহলে অবস্থা ভয়াবহ হত, এতে সন্দেহ কি! বড়ো প্রতিভার কোনো সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত উত্তরাধিকারী নেই এবং সেইটাই যুগে যুগে সাহিত্যের বিচিত্র বহুমুখী প্রয়াসের পক্ষে উৎসাহপ্রদ, মঙ্গলজনক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের পকেট সংস্করণ, বার্নার্ড-শ'-এর পর ক্ষুদে ক্ষুদে বার্নার্ড-শ'-এর আবির্ভাব, ভাবতেও ভয় করে। এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কাল মোহমুক্ত বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে পূর্ণস্বীকৃতি দিয়েও অনুকরণ ও রোমন্থনেই সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রয়াস নিঃশেষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে পথ নির্দেশ করেছেন—নূতন কালের দাবিকে তিনি উপেক্ষা করেননি, তার আতিশয্য ও বিকারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সকলকে সাবধান করেছেন। কিন্তু তিনি ভোলেননি একদিন তাঁকেও নূতন কালের পথ-মোচন করতে হয়েছিল, সাহিত্যিক স্থিত-স্বার্থের-বিরোধিতা ও নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, মানুষের আবেগ ও চিন্তার বিশেষ দাবি ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন হয়; যে জীবন সহজ ও স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল তা হয়তো কালের প্রভাবে জটিল আবর্তময়, অস্থির হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে 'সোনার তরী' বা 'মানসী'র প্রাণোচ্ছল অবাধ কল্পনাময় রূপটি আমাদের সাহিত্যে গভীরভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে না। কিন্তু যা হচ্ছে সবই নিষ্ফল কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো নয়, এ-রকম আক্ষেপ করার কারণ নেই। অবিস্মরণীয় প্রতিভা এমন নয় যে, তার প্রভাব সর্বকালে সমান শক্তিশালী ও সজীব থাকবে। শেক্সপীয়রের নাট্য-প্রতিভা তুলনাহীন, অননুকরণীয়। শেক্সপীয়রের পরও নাটক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে।

সে নাটক শেক্সপীয়রের নাটকের অনুরূপ গুণসম্পন্ন নয়, কিন্তু সে নাটকও অনেক ক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সমকালীন জীবন-বোধকে রূপায়িত করে স্থায়িত্বের মর্যাদা পেয়েছে। প্রাণধর্মের এই সাহিত্যিক প্রকাশ কখনও ঠেকিয়ে রাখা যায়নি, যাবে না।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল্য-বিচারে তাই রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র মানদণ্ড ধরে নেওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা, পর্ব থেকে পর্বান্তরে তাঁর স্বচ্ছন্দ উত্তরণ সর্বজনীন এবং সমকালীন জীবনবোধকে উদার মানবিকতার দৃষ্টিভূমি থেকে গ্রহণ করার ব্যাকুলতা তাঁকে আমাদের মানসক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দিয়েছে। সমসাময়িক কোনো সাহিত্যিকগোষ্ঠীই রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যেতে পারে না, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে এবং এগিয়ে যাওয়াটা কেবল কর্তব্য নয়, সাহিত্য এবং জীবনের ধর্মও। আমাদের সমসাময়িক সাহিত্য যে অনেক পরিমাণ সমস্যা-সচেতন হয়েছে তার মূলেও রয়েছে সেই গভীর জীবনবোধ, যা রবীন্দ্র ঐতিহ্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অতিরিক্ত সমস্যা-সচেতনতা অবশ্য সাহিত্যের শিল্পরূপকে অবহেলা করতে পারে, ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন অপ্রচুর নয়। আবার সাম্প্রতিক বাস্তব চেতনা কোনো কোনো সাহিত্যিকের রুচি, প্রকৃতির অনুকূল নয়, তাই তারা অন্তরাশ্রয়ী হতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুভূতি এবং তীব্র গভীর সমস্যাসংকুল অভিজ্ঞতা দুই-ই তাঁদের কাছে সমতুল্য গণ্য হয়েছে; তাঁরা বেছে নিয়েছেন প্রথমটাই এবং নিছক ব্যক্তিগত অনুভব ও কল্পনা-বিলাসকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ, এ-বিষয়ে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু সে অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য হবে না।

আসলে সাম্প্রতিক সাহিত্য-প্রতিভা ও প্রচেষ্টা নানা কারণে খণ্ডিত হয়েছে। এই খণ্ডপ্রতিভা ও প্রচেষ্টার শিল্প-মূল্য যাই হোক না কেন, সর্বজনীন স্বীকৃতি তার স্বপক্ষে নেই। অতীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বজনীন স্বীকৃতির প্রতীক। তিনি কেবল বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মিলনসূত্র ছিলেন না; যুগ পরম্পরায় তাঁর সাহিত্য-প্রয়াস সকলরকম নূতন ও পুরাতন ভাবধারার সঙ্গমস্থল হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর পর্বের প্রস্তুতি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশক থেকে যে-সব তরুণ বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে, তাদের আধুনিকতায় বিদ্রোহ প্রবণতায় নিঃসন্দেহেই ভেজাল ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ঝোঁকটা আন্তরিক ছিল, যদিও বাস্তবতার দোহাই দিলেও তাঁরা অনেকেই জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারেননি।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না, নাগরিক সভ্যতার, ঔপনিবেশিক সমাজের নিচুতলার নির্মম ভয়াবহ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমস্যা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যুগে সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে। কডওয়েল যাকে বলেছেন—

Witches sabbath of bourgeois experience.

তাকে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছেন রবীন্দ্রোত্তর কালের কোনো কোনো সাহিত্যিক। সামাজিক বাস্তবতার যে প্রবল ঝোঁক চতুর্থ দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে, গল্পে, উপন্যাসে ও কাব্যে দেখা গিয়েছে তার গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। এই ঝোঁক শিল্পরীতির বিচারে সার্থক, সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে, এরকম দাবি কোনো সাহিত্যিকই করবেন না। তবুও লক্ষ্য করতে হবে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃততর করার প্রয়াস, গণজীবনের অনুভূতি, সমস্যা ও অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত ও প্রকাশ করবার চেষ্টা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হচ্ছে। আবার কোনোও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মতবাদ গ্রহণ না করেও কোনো কোনো সাহিত্যিক গল্পে এবং

উপন্যাসে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে পারছেন—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত আশাপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ, বীরবলের পরেও বাংলা সাহিত্যে মননশীল কৌতুক-রসোজ্জ্বল প্রবন্ধ ও চরিত্র-চিত্র নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কার করতে পারে, এটা আমাদের প্রায় কল্পনাতীত ছিল। এক্ষেত্রে সফলতার কারণ কতকটা হয়তো আমাদের সাংবাদিকতার মান ক্রমশ উন্নত হয়েছে বলে। এছাড়া কোনো কোনো মননশীল লেখক বোধ হয় সামাজিক সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করে আদর্শ সংঘাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য স্টাইলের উৎকর্ষ বিধানে মন দিয়েছেন, পাঠকদের সমস্যা ভারাক্রান্ত মনকে সব সমস্যার পাশ কাটিয়ে নূতন রসের আস্বাদ দিচ্ছেন। এই প্রচেষ্টা শিল্প-বিচারে অন্তঃসারশূন্য নয়, তবে সম্ভবত শিল্পীর আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির চিহ্নসূচক।

ছোটগল্পে ও উপন্যাসে রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি প্রয়াসে ক্লান্তি বা ক্ষান্তির লক্ষণ নেই। বরঞ্চ নূতন ও পুরাতন লেখক অনেকেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনায় কৃতকার্য হয়েছেন, এ দাবি অন্যায্য নয়।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর কাল কিন্তু সার্থক হতে পারেনি; বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ, একথা বলাও দুঃসাহসিক হবে। সাম্প্রতিক কবিতা অনেক ক্ষেত্রে হয় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়তো অতিরূঢ়, গদ্যাশ্রয়ী এবং উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার সামিল। কবিতার যে অবিস্মরণীয়তা ভাব ও ভাষার পূর্ণ মিলনে, তার প্রতিশ্রুতি সাম্প্রতিক বাংলা কবিরা সামান্যই দিতে পারছেন। কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোনো "ছুঁৎমার্গী" ধারণা নিয়ে এই অভিযোগ করা হচ্ছে না। জীবনের অতি সাধারণ অথবা রূঢ় বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে কবিরা বিস্ময়ের উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁদের এই স্বাধীনতা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তাঁদের সেই বিস্ময়কে পাঠকের কাছে শ্রোতার কাছে বিস্ময়কর আবেগ ও ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করা চাই। কোনো সাম্প্রতিক কবিতাই বিস্ময়করভাবে আবেগ ও ব্যঞ্জনাময় হচ্ছে না, একথা অবশ্য সত্য নয়। তবু সাধারণভাবে বলা চলে, সাম্প্রতিক কাব্যধারা 'পাবলিক পোয়েট্রি' ও 'পার্সনাল পোয়েট্রি'র আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আমরা আশা করে বসে নেই। মেনেই নিতে হবে আমাদের যুগ খণ্ড-প্রতিভার যুগ, কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, সব দেশের সাহিত্যেই—যেখানে আদর্শ-সংঘাতের ফলে শিল্পসৃষ্টির সর্বজনীন আবেদনের ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু গৌরবের কথা বলতে হবে, অনেক ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও, অতীতের মোহান্ধতা এবং সাময়িকতার ঘোর লাগা বক্তৃতা বিলাস সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কাল যেমন শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছে, তেমনি নূতন প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ হয়েছে।

[প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে ভালবাসা সাবেগ, যে ভালবাসার ভিত্তি মনঃপ্রকর্ষে, অথবা যে ভালবাসার আবেদন শুধু শরীরের কাছে, কিংবা যে ভালবাসা পরিণামে খোঁজে শুধু উদ্বাহ-বন্ধনকে—চতুর্লক্ষণ ভালবাসার জন্য যুগে যুগে রচিত হয়েছে চতুর্বিধ ভালবাসার কবিতা। এর মধ্যে আবেগময় ভালবাসার আকর্ষণেই সৃজিত হয়েছে মহত্তম কবিকীর্তি। অবশ্যই এমন কবি বিরল হলেও দুঃসন্ধেয় নন যিনি প্রেমের কবিতা লেখেননি, এমন সাহিত্যিক যুগও অবিদ্যমান নয় যখন প্রেমের গান ক্ষীণ। তথাপি যেভাবেই হোক কবিতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘের সম্পর্কের ন্যায় সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষ থেকেই বিজড়িত। আবেগময় ভালবাসার মূল ভাবের সঙ্গে বোধ হয় সদা সর্বদাই লগ্ন হয়ে আছে করুণ রসের বিভাব। কেননা নিষিদ্ধতার প্রতিকূল মৃত্তিকায় প্রেমের ফুলের আশ্চর্য প্রস্ফুটন যে সুরভি বিতরণ করে তা সামাজিক বা গোষ্ঠীগত, শ্রেণীগত কিংবা জাতিগত নিষিদ্ধতার জন্যই একাধারে করুণ-কোমল, একই সঙ্গে অরুণ-ধূসর। Unfortunate love was admitted to be beautiful and good to the extent it was woeful. মধ্যযুগ থেকে আবেগময় প্রেমের কাব্যের তীব্র স্রোতোধারা গণতন্ত্রের যুগে এসেই হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব কারুণ্য এবং স্বভাবসঙ্গত বিষাদান্তিকতা। প্রেম যত তার নিষিদ্ধ নিঃসঙ্গতা হারিয়ে গণতন্ত্রীভবনের পথে পদার্পণ করেছে, তত বিনষ্ট হতে শুরু করেছে তার পুরাতন রসশ্রী। এ যুগের কবির প্রেমের কবিতায় প্রেমের স্মৃতিই দুর্মর। তার প্রত্যক্ষ উপভোগের বা প্রতিক্রিয়ার অগ্ন্যুত্তাপ সেখানে দুর্লভ। শেলি অথবা বায়রনের উচ্ছ্বাস অথবা মত্ততা এখন থিতিয়ে এসেছে ব্রাউনিঙের শান্ত নিরাসক্ত পথে। জীবনের বোধ-সংক্রান্ত বিবর্তন শতাব্দীর চক্রাবর্তনে অধিকতর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করেছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনার সাক্ষ্য প্রেমের কবিতায় লাভ করেছে সমধিক স্পষ্টতা। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাতেও সেই স্পষ্টতার বিবর্তন সন্ধেয়।

যে চোখে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন প্রেমকে তাকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে, কী চোখে বাঙালী কবি যুগে যুগে দেখেছে প্রেমকে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন। জয়দেব এবং বড়ু চন্দীদাসে নায়ক নায়িকার প্রেমের শারীরিকতা নিঃসন্দেহেই আবেগবহ নয়। শারীরিকতার সঙ্গে আবেগের শত্রুতা নেই, কিন্তু শারীরিকতার সীমা ছাড়াতে না পারলে সে স্বকণ্ঠে কথা বলতে পারে না। তাই জয়দেব, বড়ু এবং বিদ্যাপতির রূপ বর্ণনায় বিশ্ব মন্থনের বাড়াবাড়ি রসিক হৃদয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করে না। অথচ পরবর্তীকালের মহাজন পদকার যখন রাধার কেশরাশির ‵র্ণনায় চারু চিত্রকল্পের সুসার্থক প্রয়োগ ঘটান—'কাঁদিয়া আঁধার কনকচাঁপার শরণ লয়্যাছে আসি' —তখন সেই চরণে সৌন্দর্যমুগ্ধের আর্তির প্রতিধ্বনি মেলে। অবশ্য বিদ্যাপতির অতৃপ্তি হয়তো এই চরণেরই পূর্বসূরী—নয়ন না তিরপিত ভেল। তথাপি রূপজ আবেগের আকাশকেই তখনকার কবিরা অনন্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন দিগন্তরের সন্ধান করেননি, এ কথার বিপরীত সাক্ষ্য সুলভ নয়। অবশ্য সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা প্রেমের কবিতায় রাধাকৃষ্ণের বিষয় নিষিদ্ধতার আবেগে সমৃদ্ধ হবার অবকাশ পেয়েছিল বলে রূপভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তার আবেদন ছিল রসোত্তীর্ণ। কিন্তু এই আবেগ-সমৃদ্ধি জয়দেব বড়ুর কালে ঘটেনি চৈতন্যোত্তর পদকারদের হাতে। এঁদেরই হাতে শরীরের মত্ততা আবেগের আলোড়নে রূপান্তরিত হল। 'যদিও রূপ লাগি

আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' এই চরণের দোসর পংক্তিতে 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'—অনেকখানি সচেষ্ট এবং হিসেবী, তথাপি এমন মহাজন পদের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে যেখানে একটি চরণের দুর্লভ বচনে নিষিদ্ধ প্রেমের দুঃখার্ত আবেগের আশ্চর্য প্রতিফলন সম্ভব হয়েছে। 'এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে' এই দুই চরণের ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে—একটি এই ধরনের কবি-অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। এর পাশে লৌকিক গ্রাম প্রান্তরচারী প্রেমোক্তি—'কোথায় পাব কলসি কন্যা, কোথায় পাব দড়ি। তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি'—সরল গ্রাম্যতায় বলিষ্ঠ হলেও আবেগধর্মী নয়।

নিষিদ্ধতা যদি প্রেমের পথে বাধার সৃষ্টি না করে তাহলে তাও কেমন করে আবেগের শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, শুধু উপভোগ্যতা কেমন ভাবে প্রেমাবেগের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তার নিদর্শন হিসাবে বিদ্যাসুন্দর নিশ্চয় উল্লেখ-যোগ্য। এখানে নিষিদ্ধতা কোনো মহত্তর আবেগের জন্ম দেয়নি। অথচ রোমিও এবং জুলিয়েটের প্রেমের তরু নিষিদ্ধ লালনে বর্ধিত এবং পুষ্পিত। বাংলা প্রেমের কবিতার দুর্ভাগ্য এই যে অষ্টাদশ শতকে এ হারিয়ে ফেলল এর নিষিদ্ধ ন্যায়। বৈষ্ণব পদকারদের নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যে যে নৈতিক ভঙ্গি এবং মনোভাব ছিল, অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণব-সাহিত্যে তা ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে লাগল অবৈধ। নিষিদ্ধতার মধ্যে নীতির উপস্থিতি থাকলে তবেই আবেগের জন্ম সম্ভব। অবৈধতা কদাচ আবেগজননী নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কবি ওয়ালাদের প্রাধান্যের যুগেও প্রেমের কবিতার সুযোগ্য আবেগের পুনরুজ্জীবন হল না, কবিওয়ালাদের রচনায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার আভাসপাত সত্ত্বেও একথা সত্য। 'মনে রয়ে গেল মনেরই বেদনা' প্রমুখ গানে কৌলীন্য-জর্জর বাঙালী বধূর বেদনা আছে। কিন্তু এ প্রেমেও আবেগের ঘনীভূত প্রেরণা নেই। 'ভালবাসবে বলে ভালবাসিনে' প্রভৃতি গানে আবেগের ভাবাদর্শমুখিতা থাকলেও তার ভাববস্তুমুখিতার সাক্ষাৎ মেলে না। কাজেই তারা বাংলা গানের ধারাকে যতটা স্পর্শ করেছে ততটা বাংলা কবিতার কূল ঘেঁষে যায়নি। এবং সে বিচারে উনিশের শতকও আবেগের পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হয়েও পূর্ণ সফলতা লাভ করেনি। বিহারীলাল, দেবেন সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও অক্ষয় বড়াল সকলেই প্রেমের কবি। নিঃসন্দেহই স্বাদ বিতরণে পরস্পর পার্থক্যও যথেষ্ট বিদ্যমান। তথাপি অধিকাংশ প্রেমেই দাম্পত্য আদর্শকে স্বীকার করে রাখার ফলে কবিতাগুলি অবশ্যই দাম্পত্য বিধিসম্মত কবিতা হতে পেরেছে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয় বড়ালের দুটি-একটি কবিতা ব্যতীত আবেগ প্রতিধ্বনিত হয়েছে কদাচ। এবং একমাত্র দেবেন সেন ও অক্ষয় বড়ালের প্রেমের কবিতাতেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুভূতিময় স্মৃতি কখনও কখনও কার্যকরী, নতুবা অধিকাংশ প্রেমের কবিতায় প্রেমের জন্য তীব্র আকুলতা আবেগের বিকল্প হতে উদ্যোগী হয়েছে। আকুলতা (দাম্পত্য প্রেম, কাজেই তার পরিমাণও অল্প) প্রেমিকার জন্য অনুভূত হলে কিছুটা রক্ত মাংসের স্পন্দন হয়তো গভীরতর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করত।

তদুপরি ভারতীয় পরিবার জীবনের প্যাটার্নে দাম্পত্য সম্পর্কও ধর্মীয় অনুশাসন মুক্ত নয় বলেই দাম্পত্য সম্পর্ক উপভোগের কবিতাতেও আবেগ আড়ষ্টতা মুক্ত হতে পারেনি। Donne-এর এই জাতীয় আত্মস্থ আবেগকে বাংলার কবিতায় যে খুঁজে পাওয়া যায় না তার প্রধান কারণ দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার ধর্মানুশাসিত অপরিবর্তনীয়তা। Read সাহেবের ব্যবহৃত Donne-এর Anniversary নামক কবিতাটির উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে পুনঃব্যবহার্য :

All kings and all their favourites,
All glory of honour, beauties, wits,

The Sun itself, which makes times, as they pass,
Is elder by a year, now, than it was
When thou and I first one another saw :
All things to their destruction draw,
only our love hath no decay ;
This, no to-morrow hath, nor yesterday,
Running it never runs from us away,
But truly keeps his first, last, everlasting day.

অবশ্যই Donne-এর অনুভূতির ঋজু সরলতার পশ্চাদপটে বিস্তীর্ণ ক্লাসিক পটভূমি। এবং তারই উপরে দীপ্যমান হয়ে রয়েছে রেনেশাঁর স্বর্ণময় ফসল-স্বরূপে—নিখুঁত বাস্তব রস এবং প্রত্যক্ষ মানবিক ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা। আমাদের উনিশ-শতকীয় প্রেমের কবিতার দৌর্বল্য এই যে, ক্লাসিক পটভূমির সুনির্বাচিত প্রয়োগের বিষয়ে সে ছিল অসম্পূর্ণ। উপরন্তু বিলম্বিত রেনেশাঁর অসংগঠিত ভূমিতে ব্যক্তিত্বের সুরও সাবলীল স্পষ্টতায় সর্বত্র শ্রুত হয়নি। Donne এর সরল স্বকণ্ঠ নির্ভর ক্লাসিক পুষ্ট স্বরের আভাস মাত্র বিহারীলালে বা দেবেন্দ্রনাথে পাওয়া গেলেও, আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—বাংলা প্রেমের কবিতার চরিতার্থ রূপ তবেই আমরা দেখতে পেলাম।

দুই

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উপভোগের কবি নন। যদিও ঝুলন কবিতার উচ্ছ্বসিত আতিশয্যে উপভোগের আবেগাতিরেক ধ্বনিত হতে চেয়েছে, তথাপি কবিতাটির বহুভাষী লক্ষ্যহীনতায় একথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে ঝুলনের রসভূমির তিনি অভ্যস্ত পথিক নন। সম্ভবত এই অনভ্যস্ততার জন্যই প্রেমের কবিতায় নিজের স্বরূপকে চিনে নিতে তাঁকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছে। তাঁর প্রেমের কবিতার প্রথম অধ্যায়ে তিনি অবশ্যই ঐতিহ্যের কাছে প্রার্থী। কিন্তু এ পর্যায়ে তিনি সফলতার অভিমুখী হলেও রসের সংকীর্ণতাকে এড়িয়ে মুক্ত হতে পারেননি। এখানে তিনি অসম্পূর্ণ। যখন ঐতিহ্যের প্রসাদের সঙ্গে তিনি নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করলেন তখনই এসেছে প্রেমের কবিতায় তাঁর পরিণত ফসল তোলার কাল। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা এই সূত্র অনুসরণেই আলোচ্য। তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রেম কবিতায় প্রেমের বিলাসকেই ব্যবহৃত হতে দেখি। সচরাচর এবং অ্যাভারেজ প্রেমই কবির বিষয় বলে তখন পরিগণিত হয়েছে :

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
লাজে বাধো বাধো সোহাগের বাণী
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়ন কূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

মানসীর এই প্রথম কবিতাটিতে কবির সৃষ্টির স্বাক্ষর নিঃসংশয়ে উপস্থিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় নৈঃসঙ্গ্য-দীপ্ত-চেতনার রাগে এ রঞ্জিত নয়। একে বলা যায় সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রেমবিলাস। এর মধ্যে ভালবাসার গৌরব যত, ভালবাসার গভীরতা তত নেই। এ ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমরা একটা ব্যক্তিকে চিনে নিতে পারি না, বুঝতে পারি না যন্ত্রণায় বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্বকে। এখানে প্রেমের বেদনায় বৈষ্ণব কবিতার ছায়া, প্রেমের আকূতিতে বৈষ্ণব কবিতার আকুলতা :

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

অথবা

ওগো ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে-কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু তবে কেন এসে
মুখ পানে শুধু চাও।

বৈষ্ণব কবিতার অনুষঙ্গ কবিতা দুটির রসমণ্ডলে নানাভাবে উপস্থিত। এবং সে উপস্থিতি শুধু প্রথম উদ্ধৃতির চরণাশ্রয় বাসনা ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতির বাঁশরির উল্লেখেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রথমটি পুরুষের উক্তি। দ্বিতীয়টি নারীর। রাধার উক্তি এবং কৃষ্ণের উক্তির প্যাটার্নে এরা কল্পিত। এবং সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যায় 'মানসী'র নারীর উক্তি এবং পুরুষের উক্তি এই দুই বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় প্রেমের কবিতার পরিকল্পনা 'বলাকার' পূর্ব পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে বারে বারে। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা গীতাঞ্জলিতে সমস্ত প্রেমের কবিতাগুলিই কোনোটি বলা হয়েছে নায়িকার কণ্ঠে, কোনোটি বলা হয়েছে নায়কের কণ্ঠে। এবং নায়িকার কণ্ঠে যখনই কবি কথা বলেছেন, দেখা যায় তখনই বৈষ্ণব কবিতার রসমণ্ডলকে তিনি ব্যবহার করেছেন সমধিক। আমাদের প্রেমিকা নায়িকার টাইপ চিরকালই রাধা—রবীন্দ্রনাথের কবিতার নায়িকাদের স্বগত বাণীতে সে কথাই অভিব্যক্ত। রাধা বিরহের আদর্শকে বিরহের কবিতা-রচনার সময় অতিক্রম করা তাই দুরূহ। এই দুরূহতার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিশিষ্টতা সম্ভব করেছেন সেখানে নায়িকাদের আধুনিক আত্মসচেতনতাই প্রধান হয়ে উঠেছে—প্রেমের গভীর গৌরব সেখানে হয়েছে গৌণ। নায়িকাদের মুখ দিয়ে বলানো অধিকাংশ কবিতাই এক ধরনের একোক্তি। সেখানে সাধারণ নারীমানসের তন্নিষ্ঠতা অনুসৃত হয়েছে কঠিনভাবে। রাধার বিভিন্ন অনুভূতিময় যন্ত্রণার ছায়ায়, প্রেমের বেদনায় এই নারীমূর্তিগুলি রচিত। অথচ তাদের হৃদয়-নিঃসৃত বাণীর আত্মসচেতনতায় আধুনিক রবীন্দ্রনাথের দান।

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

এই উক্তিতে হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা যদিবা রাধা-সুলভ, 'অপবিত্র ও করপরশ' এই ঘোষণায় উনিশ শতকীয় নীতি-সচেতনতা,—আত্মসচেতন মর্যাদা-জ্ঞান যার মূলে। অথচ নিছক নারী-সম্ভব আত্মনিবেদনের কবিতাতেও তুলনাত্মক আত্মবিশ্লেষণের দেখা মেলে। এও এক ধরনের ব্যক্তি-চেতনা:

ভালবাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালবাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফোটে যার হাসিতে।

* * * *

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে
ভালবাসিতে পারি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

এমন কি এমন নায়িকা-উক্তির সাক্ষাৎও মেলে যেখানে নায়িকা প্রেমিকা না হয়েও প্রেমের প্রতি করুণাময়ী শ্রদ্ধায় বিশিষ্ট। 'সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে। তাকে আমার মাথার একটি কুসুম দে'—এই জাতীয় কবিতা। প্রেমের প্রতি এই বিবেক-সম্মত শ্রদ্ধা মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতায় অথবা উনিশ শতকীয় গার্হস্থ্য প্রেমের কবিদের রচনায় নেই।

তথাপি নায়িকাদের মুখ দিয়ে কথা বলাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও উনিশ শতকীয় কবিদের সমান অসুবিধা ভোগ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব প্রেমের কবিতা তার প্রধান শক্তি সংগ্রহ করেছে নিষিদ্ধতা থেকে। এই ছিল তার আবেগের উৎসভূমি। উনিশ শতকের প্রেমের কবিতা স্বভাবতই আর নিষিদ্ধতার কাছে আবেগান্বিত হতে পারেনি। গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার প্রমুখের কবিতায় নারীবন্দনা যে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বিশিষ্ট হোক না কেন প্রেমের কবিতার উপযুক্ত আবেগস্পন্দন সেখানে ক্ষণে ক্ষণে বাধাহত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁর প্রেমের কবিতাকে দাম্পত্য-প্রেমের কল্পনায় গড়ে তোলেননি। কিন্তু তিনিও মধ্যযুগীয় বাংলা প্রেমের কবিতার সুদৃঢ় আবেগভূমির কোনো বিকল্প প্রথম দিকে আবিষ্কার করতে পারেননি। তাই তাঁর নায়িকা-উক্তিতে প্রেমের ক্লান্তি, অভিযোগ ইত্যাদি ধ্বনিত হয়েছে অধিক। আমাদের শত গ্রন্থি সঙ্কুল পরিবার জীবনের সামন্তযুগীয় প্যাটার্নে নারী-জীবনের অচরিতার্থতাই এই একোক্তিগুলির পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। স্বাধীন-প্রেমের গৌরবময় তৃপ্তি অথবা দুঃখ এখানে নেই। সে কারণেই এ জাতীয় কবিতার রসের সংকীর্ণতার হাত থেকে তিনিও রেহাই পাননি।

সম্ভবত এই সীমাবদ্ধতাকে তিনি নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেখা যায় যে 'বলাকা'র কালে এসে নায়িকাদের একোক্তি রচনা তিনি পরিহার করেছেন। সবলা কবিতার বক্তব্যে যে পরিমাণ সরলতার

ঘোষণা সে পরিমাণে প্রেম নেই। তবুও মহুয়ায় সবলা কবিতার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে বলাকার পরবর্তী কবিজীবনে কবির নিজস্ব প্রেমিক সত্তাই নিজ কণ্ঠেই কথা বলতে চেয়েছে। এবং এইগুলির ভিতরেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার পূর্ণ পরিণতি।

তিন

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণীয়। প্রেমের লীলাময় কারুণ্যের বীণা তাঁর কবিতার নায়িকাদের হাতেই বেজেছে ভালো। তাঁর উপন্যাসের নায়িকাদের জীবনে বড়ো হয়েছে প্রেমের চেয়েও গভীরতর অস্তিত্বের যন্ত্রণা। প্রেমের করুণ-কোমল অরুণ-ধুসর কান্তিকে তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা চেনে না। তার জন্য রইল তাঁর প্রথম-প্রভাতের প্রেমের কবিতার নায়িকা। প্রেমের ব্যর্থতায় সে নায়িকার অনুপম রসশ্রী। কিন্তু প্রেমেরই প্রেরণায় তাঁর রানীর বেশ পরিহৃত ভিখারিনীর চির অঙ্গে ধারণ করে তিনি অন্ধকার গৃহ-চারিণী। সে প্রেমকে প্রকাশ্যে বরমাল্যে ভূষিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তিনি জানান তাঁর অক্ষমতা—'যে সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে। উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে।' কাজেই প্রেমার্থীর কাছে তাঁর সকরুণ আবেদন—'অমন দীন নয়নে তুমি চেয়ো না।' তিনি জানেন যে—'আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি।' প্রেম যমুনার তীরে ব্যর্থ অভিসারের বেদনাতেই তাঁর আক্ষেপোক্তি মৃত্যুহীন—'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?' তাই প্রেমের ব্যর্থতায় বিফল যৌবনের বহ্নিমান যন্ত্রণায়, বিদ্যাপতির রাধার মতো তিনিও বলেন—'এ বেশভূষণ লহ সখি লহো। এ কুসুম মালা হয়েছে অসহ—এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে।' অথচ রাধা-রূপক পরিবর্জন করে ইনিই কখনো কখনো কথা বলে ফেলেছেন লৌকিক স্বরে; সেই সব আবেগ তীব্র মুহূর্তে মনে হয় যেন 'তোমাকে চিনি গো চিনি।' সে স্বরে উল্লাস নেই, নিরুচ্ছ্বসিত সেই প্রেমে চিরসন্ধ্যার আকাশ, সেই আকাশের নিচে অনন্তকাল বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ পূরবীর ম্লানমন্দ্রসুরে নেমে এসেছে। প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধায় সেই নারী তখন প্রেমের নামও রেখে দিতে চান অনুচ্চারিত :

> তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
> এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো,
> কে বলিতে পারে বলো, যাহা চাও একি তাই!
> তবে ইহা থাক দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,
> যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে যাই;
> এই চির আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।

চার

অবশ্যই, পুরুষের কণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে সোনার তরীর যুগে তিনি হৃদয়-যমুনার মতো সুপরিণত কবিতা রচনা করেছেন। নিটোল রস-সার্থকতা সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে এ ধরনের কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার ধারায় প্রভাব-বিস্তারী নয়। প্রেমের আবেদনে বা প্রেমের প্রার্থনায় তাঁর কবিস্বভাবের দিব্যস্ফূর্তি ঘটেনি। নিরুদ্দেশ যাত্রার আলো-আঁধারি আবেশকে বাদ দিলে দেখা যায় যে তাঁর কবিস্বভাবের এই প্রাথমিক লক্ষণটি সোনার

তরী চিত্রার কাল থেকেই স্ফুটনোন্মুখ। প্রেমের প্রার্থনা তাঁর হাতে শেষ পর্যন্ত মানসসুন্দরীর মতো অতিশয় কথনের আড়ম্বরে পর্যবসিত। বহু সঠিক আবেগোক্তির সঙ্গে লক্ষ্যভ্রষ্ট অতিকথনে আবেগের আতিশয্য শেষ পর্যন্ত আতিশয্যের আবেগে পরিণত হয়েছে মানসসুন্দরীতে। প্রেমিকের যে আত্মমর্যাদা হৃদয়-যমুনা কবিতার বৈশিষ্ট্য বলে, প্রেমের আবেদনেও একপ্রকার অহংকার ধ্বনিত হল, মানসসুন্দরীতে তার অবিদ্যমানতা রবীন্দ্র-স্বভাববিরুদ্ধ। কবি কোনোদিনই প্রেমের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্তমানের বৃন্তে পুষ্পিত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। হৃদয়-যমুনার ভাবঘন আহ্বান বা ঝুলনের অসম উল্লাস সে সব ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম। প্রেম অপেক্ষা প্রেমের স্মৃতিই তাঁর প্রেমের কবিতার আবেগ নির্মাণে অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রেম ব্যর্থ হলেই তা স্মৃতিসঞ্চারিণী। এবং যে আবেগ স্মৃতিবাহন তা সদাই শান্ত। তাই শান্তশ্রী রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মূল শক্তি। অবশ্য কখনই যে কবি এই শান্ত সংযমকে লঙ্ঘন করেননি তা নয়। এমন দিনে তারে বলা যায় এবং হে নিরুপমা—এই দুটি বর্ষাঘন পরিবেশে কবিকণ্ঠে বেদনার পরিবর্তে ঝংকৃত হয়েছে আত্মবিস্মৃতির বাসনা। 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'—এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মূল স্বভাব লঙ্ঘিত। স্মরণীয় যে, সমাজ সংসার বলতে তিনি সেই সমাজ সংসারকেই বুঝেছেন যেখানে প্রেমের তরু মুঞ্জরিত হতে পারে না তার স্বাধীন বিকাশে; তিনি সেই জরদ্গব সমাজ সংসারকেই মিছে বলতে চান এবং জীবনের কলরব বলতে তিনি জীবিকার জন্য যান্ত্রিক কলরবই বুঝেছেন। তথাপি মর্যাদাপূর্ণ যন্ত্রণার সঙ্গে প্রেমের করুণ গৌরব বহনে রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক পুরুষের সত্য রূপের উদ্ভাস একথা অনস্বীকার্য। তাই আবেদন প্রেমের দেবতার কাছে—'হে অতনু বীরের তনুতে লহ তনু।' হে নিরুপমা এবং এমন দিনে তারে বলা যায় এই সুরের ব্যতিক্রম। তাঁর প্রেমের কবিতার প্রেমিক পুরুষের চারিত্র্যে এবং ব্যক্তিত্বেই তাদের প্রেমানুভূতির পরম মূল্য। এই মূল্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাদের করুণ-রঙিন নৈতিক সচেতনতা। এই মূল্যেই তাঁর প্রেমের কবিতা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র।

প্রাসঙ্গিক, পরিণত কবিতাগুলিতে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি-স্বভাব। তিনি কদাচ ভাল-বাসার জন্য সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন না। তিনি দায়ী করতে চান না কোনো কিছুকেই, তাঁর অপ্রাপ্তির জন্য। এই হলে এই হতে পারত এ কথা না বলার মতো দার্শনিকতা তিনি সংগ্রহ করেননি বটে, কিন্তু তাতে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর মানবিক যন্ত্রণা; অথচ প্রেম এবং প্রেমিকা কারো জন্যই তিনি বিসর্জন দেবেন না তাঁর আত্মমর্যাদা, যে আত্মমর্যাদার তরুমূলে তাঁর কবিত্বের অচল আসন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা আত্মবিস্মৃতের কবিতা নয়, আত্মসচেতনের প্রেমের কবিতা। যে প্রেমের নিকষে জীবনের শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করে এ কবিতা তার জন্য। যে বিচ্ছেদের জন্য অভিযোগাতুর সে এ কবিতা থেকে আবেগ-শুদ্ধির প্রেরণা পাবে না। সতী বিরহে শিবের কণ্ঠে ধ্বনিত বিষণ্ণ গম্ভীর ভৈরবীর মতো আত্মস্থ গাম্ভীর্যে এ শিল্প-সার্থক। সেখানে বিরহের সঙ্গে মিশে রয়েছে ব্যক্তির অন্তরের গভীরতম স্তরের নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি। বিরহের শূন্য শুভ্রতাকে কবি এই কারণেই পবিত্র বলে মনে করেছেন।

তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

দেখা শুনা হল সারা
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।

কিন্তু সেই শব্দের স্পর্শের অপর পারে—'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্'—যেখানে যা কিছু 'জীবনের অণিমা সবই মহিমায় দিশাহারা', সেইখানে শূন্যতারই শিল্প-পরিণাম ঘটে কবির হাতে :

তবু শূন্য শূন্য নয়
অগ্নিময়
ব্যথা বাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

তাই, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—কেননা পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে—এই উক্তিতে যদিবা ব্রাউনিঙের সাদৃশ্য সুলভ, 'একা একা সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন'—এখানে রবীন্দ্রনাথ একক। অগ্নিময় ব্যথা বাষ্প থেকে স্বপ্নের ভুবন নিষ্কাশিত করায় যে গৌরব, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের যন্ত্রণার গৌরব শেষ পর্যন্ত সেইখানে উপনীত। এ তাঁর জীবনের গৌরবও বটে।

পাঁচ

শেষ বসন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রেমের কবিতা। যদিও প্রেমের প্রসঙ্গে মহুয়া প্রবল পরিচিত গ্রন্থ, তথাপি একথা স্বীকার্য যে পূরবীর পরে কবির প্রেমের কবিতার আর কোনো নতুন পরিণতি ঘটেনি। পূরবীর এ জাতীয় কবিতাগুলিতেই তাঁর প্রেমের আবেগের যা কিছু শক্তির সুসমাবেশ ঘটেছে। প্রৌঢ় প্রেমের সকল কারুণ্য এবং প্রশান্তির মিশ্রণেই এরা পরিণত ফসল। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক পুরুষ নিজ ব্যক্তিমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই প্রেমাস্পদার ব্যক্তিত্বকেও দেয় সহজ স্বীকৃতি। প্রেম কিছুতেই জীবনকে গ্রাস করে ফেলতে পারে না - মধ্যযুগীয় প্রেমের কবিতা থেকে আধুনিক প্রেমের কবিতার পার্থক্য এই বোধের ওপর স্থাপিত। জীবন এবং প্রেমের দ্বন্দ্বময় অভিব্যক্তিতে আধুনিক কবির নৈতিক তৃপ্তি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এই তৃপ্তির করুণ গৌরবের অন্তরাগ যে-সব ক্ষেত্রে অরূপরতনের দিব্যদ্যুতির জন্য আত্মহারা হয়নি শেষ বসন্ত সেই সব অসামান্য কবিতার অন্যতম। প্রথমেই বিচারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এর স্তবক পরিকল্পনা। মিত পরিসরে বিন্যস্ত কয়েকটি স্তবকে এমন একটি সরল সংহতি যা কবিতার প্রচ্ছন্ন করুণরসকে সংযমে বেঁধেছে। দ্বিতীয়ত, লক্ষণীয় কবিতাটিতে স্তবকপরম্পরায় প্রবাহিত ভাবের বিকাশ। ভাবের এই একমুখী বিকাশকে চিত্রল করে তোলা হয়েছে প্রায় অনায়াসে—পল্লবিত করা হয়নি একেবারেই। তৃতীয়ত, কবিতাটিতে প্রথানুগ চিত্রকল্পের সহায়তা না গ্রহণ করে অর্থগৌরবী ঘটনার সাহায্যে আবেগকে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে।

শেষ বসন্ত সেই পুরুষের উক্তি যার প্রেম বাস্তব সার্থকতা লাভ করেনি। কিন্তু এই অসার্থকতার বোধ কবিতাটিতে কোথাও স্পষ্টত প্রত্যক্ষ নয়। বস্তুত, কবিতাটির সৌন্দর্য এইখানেই। বেদনা এখানে ঋজু

ভঙ্গিতে ব্যক্ত না হয়ে একটা তির্যক ভঙ্গি গ্রহণ করার ফলেই এর রসশ্রীতে এসেছে অনন্যসাধারণত্ব। নায়িকা যেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সম্মুখে একটা বিচ্ছেদের অনিবার্য আসন্ন ভবিষ্যৎ। এ বিচ্ছেদের জন্য নায়িকার কোনো আক্ষেপ আছে কিনা তা জানবার জন্য প্রেমিকপুরুষ কোনো আকুলতা রাখেন না। তাঁর প্রস্তাব অতি সামান্য: 'শুধু এবারের মত। বসন্তের ফুল যত। যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।' এই প্রস্তাবের মর্যাদায় এবং করুণদীপ্তিতে ব্রাউনিঙের 'লাস্ট রাইড টোগেদার'-এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাটকীয়তা নেই, নাট্যরসও ব্যবহৃত নয়। সমগ্র কবিতাটিতে প্রস্তাবটিকেই নিবেদন করা হয়েছে। মাত্র চতুর্থ স্তবকে প্রেমিক পুরুষের আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় নায়িকার আচরণের আভাস ব্যঞ্জিত। এই চতুর্থ স্তবকই কবিতাটির মধ্যমণি। সপ্তচরণে গঠিত সপ্তস্তবকের কবিতায় ভাবের বিকাশ ঘটেছে এই মধ্যমণিস্বরূপ চতুর্থ স্তবককে ঘিরে। এখানে পৌঁছে এরই আঘাতে আবেগের দ্রুত রূপ সৃষ্টি পরবর্তী স্তবকগুলিতে বিচ্ছেদের কারুণ্যকে স্ফুটতর করেছে। শেষতম স্তবকের নির্জনযাত্রার কল্পনাকে মহান করে তুলেছে এই চতুর্থ স্তবকের পরম অনুনয়ের স্মৃতি :

ফিরিয়া যেও না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো,
সময় রয়েছে বাকি
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো,
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

অথচ এ অনুনয়ের গৌরব তখনই শতগুণ বর্ধিত হয় যখন আমাদের স্মরণে আসে যে এক্ষুনি নায়িকাকে এই আশ্চর্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, 'ভয় রাখিও না তুমি মনে। তোমার বিকচ ফুলবনে। দেরি করিব না মিছে।' বলা হয়েছে—'চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি। রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।' কেননা স্মৃতিকে করুণারসে চিরসিক্ত করে রাখা যে সম্ভব নয় বলাকার কাল থেকে কবি সে কথা বারে বারে উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন জীবনের গৌরব তার থেকে অনেক বেশি। তাই যে সর্বগ্রাসী কাল-প্রবাহের তীরে হেমন্তের অনুষঙ্গে কবি জীবনানন্দের মনে হয়েছে :

চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে,
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে। (দুজন)

সেই পরিব্যাপ্ত অনিবার্য নিয়মের ফলেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক পুরুষও এই কবিতায় বলেছে বটে :

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলেছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।

কিন্তু তারই বেদনা ধুসর বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়ে ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—এই বোধের সঞ্চার রবীন্দ্র-মানসে হয় না। বসন্তের বনভূমিতে ফুলগুলি ঝরে ঝরে পড়ছে—সময়েরই আঘাতে। সময়েরই আঘাতে সেই বিচ্ছেদ-ঘন মুহূর্তের আবির্ভাব, যখন মনে হয়—আমার সময় আর নাই। কিন্তু যে ফুলগুলি ঝরে পড়ছে তাই শেষ কথা নয়। বসন্ত শুধু ফোটাফুলের মেলা নয়—ফুল ঝরে পড়ায় সেই বসন্তেরই হৃদয়াভিরাম লীলা। যে প্রেম বিদায় নিতে চলেছে তাও সুন্দরের দান। ঝরা ফুলও বসন্তের দান। তাই স্মৃতিকে করুণারসে সিক্ত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুন্দরকে অক্ষয় করে রাখার প্রয়োজন আছে। তাই প্রার্থনা :

তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

তাই প্রার্থনা যে, পাতার আড়াল থেকে বিকালের আলোটুকু আসুক, কালো চুলের ওপর পড়ুক তার রাঙা আলো। এই রকম পরিবেশে জীবনানন্দের—'চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত ঝরিছে শিশির' —এর মধ্যে যে ধুসর বিনষ্টিবোধ, রবীন্দ্রনাথ তার বদলে এনেছেন সুন্দরের নিষ্ঠুরতা। যা সুন্দর তা কিছুতেই আমার ব্যক্তিজীবনের স্বার্থ-সীমায় বন্দী হবে না—একথা সোনার তরীর লোকোত্তর কৃষক অথবা লৌকিক কৃষক সকলের পক্ষেই সত্য। তাই শূন্য নদী তীরের বেদনা আর নিঃসঙ্গ বসন্তের শেষযাত্রার বেদনার ফলশ্রুতি এক হয়ে যায়। তাই পঞ্চম স্তবকে যখন বলা হয়—'হাসিও মধুর উচ্চ হাসে। অকারণ নির্মম উল্লাসে,' তখন সেই নির্মম মাধুর্যের দিকে তাকিয়েই এ-কথা বোঝা যায় যে সুন্দরের ধর্ম নিরাসক্তিতে। সেই নিরাসক্তির জন্যই সুন্দরের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা। আবিষ্টতার বাণী তাই কবিকণ্ঠে ফোটে না। বরঞ্চ জীবনের প্রতি অপার বিশ্বাসে তিনি বলেন—'ভুলে যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ। দিব না মন্থর করি আজি তব চঞ্চল চরণ।' অন্য যে-কোনো কবির হাতে এ হত অভিমানের বাণী। একমাত্র কবির জীবন-সাধনার প্রসঙ্গেই এর পূর্ণ তাৎপর্য লভ্য। কিন্তু তাহলেও এই প্রেমের দিবসান্তের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমিকের আকাশ পরিক্রমারও যে অবসান অবশ্যম্ভাবী এ বেদনাও অবিস্মরণীয়। সে কারণেই বসন্তের কানন পরিক্রমার শেষে নায়িকার চলে যাওয়াকে কল্পনার কালে কবি বেদনা ধ্বনিত করেছেন কঠিন সংযমে।

তারপরে যেও তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুত পায়ে দলে
নীড়ে ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলি রবে
দিনান্তকে ক্ষুব্ধ করি তোলে—
বেণুবনচ্ছায়া ঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্বশেষ সুরে।

এখানেও প্রেমিকের হৃদয়ের কথা পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষে কিছু বলা হল না—শুধু ব্যক্ত করা হল বাইরের

ঘটনার সাহায্যে হৃদয়ানুভূতির তীব্রতাকে। দ্রুতপায়ে বিদলিত ঝরা পাতার শব্দে হৃদয়ের আর্তি প্রতিফলিত হল—কিন্তু তাকে স্পষ্টত নিবেদন না করে রক্ষিত হয়েছে প্রেমিকের মর্যাদা এবং কাব্যের সৌন্দর্য। আর নীড়ে ফেরা পাখির অস্ফুট কাকলিতে দিনান্তকে ক্ষুব্ধ করে তোলায় কবি শুধু বঞ্চিতের চিত্ত ক্ষোভকেই আভাসিত করেননি; এখানে আর একটি ব্যঞ্জনার তাৎপর্যও লক্ষণীয়। নিভু নিভু আকাশকে পরিহার করে অন্ধকার নীড়ে ফিরে আসায় পাখির আকাশ-হারানোর বেদনা। তারই সঙ্গে এই স্তবকে বিধৃত বেদনাও তুলনীয়। প্রেমের আকাশকে পরিহার করে এবারে একাকী প্রত্যাবর্তন। এর পরে শেষতম স্তবকের সবিশেষ কবিত্বময়তা অধিকন্তু ন দোষায় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কবিতায় দেখা যায় একক স্তবকের অতি উজ্জ্বলতা সমগ্র কবিতাকেই গ্রাস করে ফেলেছে। বলাবাহুল্য রসসৃষ্টির উৎকর্ষের পক্ষে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। শেষ বসন্ত সে জাতীয় কবিতা নয়, এর আসন বরঞ্চ হৃদয়-যমুনা প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে। রস এখানে বিশিষ্ট স্তবকে প্রামাণিকতা দাবি করে না। সমগ্র কবিতাতেই সে বিধৃত হয়ে রয়েছে অখণ্ড আবেগে।

ছয়

যে দুটি কাব্য-গ্রন্থের পরিচিতি প্রেমের কবিতার বই বলে—দুঃখের বিষয় সেই দুটি কবিতার বইয়েই দেখা যায় যে আবেগের খণ্ডীভবন ঘটেছে বারে বারে। স্মরণ আর মহুয়া সেই বহুল পরিচিত কাব্যগ্রন্থদ্বয়, স্মরণের বিষয়গত অতিপ্রত্যক্ষতা টেনীসনীয় কলাবিলাসকে আশ্রয় করেনি, বরঞ্চ তা কথা বলতে চেয়েছে একেবারে শোকাহতের স্বরে। স্মৃতিই যে কবিতার সঞ্জীবনী ধারা তা আর একবার বোঝা গেল স্মরণেরই বিষয় নিয়ে পূরবীতে লিখিত 'কৃতজ্ঞ' কবিতা পাঠ করে। এখানে একান্তই ব্যক্তিগত স্মৃতি গুঞ্জরিত হয়েছে কবিমানসে। শেষ বসন্তের মতো ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন এখানে নেই। অতএব সে জাতীয় গভীরতাও এখানে নেই। এখানে প্রেমের নৈতিকতা বা তার ভালবাসার দর্শনের কোনো অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু কাব্যে গভীরতার অভাবের ক্ষতিপূরণ যদি কিছু দিতে হয় তবে সরলতার সন্ধানই অবশ্য করণীয়। সারল্য সম্পদে এই কবিতা সমৃদ্ধ। বেদনার যে উচ্চারণ এখানে ঘটেছে তা ব্যক্তিগত হলেও এই কারণেই রসপ্রত্যয় উদ্দীপিত করে:

আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে—সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন—
সব মানি—সবচেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

মহুয়াতেও দেখা যায় যে প্রেমের কবিতা যেখানে স্মৃতিমূলক হয়েছে সেখানেই সে হতে পেরেছে রস-সার্থক।

প্রেমের বর্তমান নিয়ে কাব্য রচনার উল্লেখযোগ্য প্রয়াসে বধূকে মহুয়া নাম ধরে ডাকার আবেগসম্ভব উক্তিও সে কবিতার শেষ পর্যন্ত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অথচ 'বাপী' কবিতার মৃদু কাহিনীর সরল গঠনে সেই অতীতই কার্যকরী হয়েছে আশ্চর্য ভাবে এবং রসে। রুক্ষমরুপ্রতিম পথিপার্শ্বে, কূপের কাছে তৃষ্ণার জল তুলে দিয়েছিল যে নারী আর দিয়েছিল দুই চারি দণ্ডের সান্নিধ্য এই কবিতায় তারই স্মৃতি। ইচ্ছে করলেই রবীন্দ্রনাথ এ কবিতাকে রূপকের আবরণ দিতে পারতেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র সে প্রয়াস না করেই প্রেমের সুবর্ণ স্মৃতিকে জীবন্ত করেছেন :

তার পরে কতদিন চলে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নিচে।
বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে
এ পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগল তরু।
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু।

এবং এই কবিতার শেষতম স্তবকে যে সান্ত্বনা তা কবির সান্ত্বনায় ভবিষ্য বিশ্বাসী। শেষ বসন্তের শেষতম স্তবকের মতো নিঃসঙ্গ অন্ধকারকে নিজ ব্যক্তিত্বের প্রসাদে পূর্ণ করে তোলা সেখানে সম্ভব হয়নি। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার প্রেমিক পুরুষের মর্যাদাবোধে সে বেদনার অভিজাত মূল্য স্বতঃই স্পন্দিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকার সত্তায় রাধিকার নিষ্ঠা। প্রেমিকের অস্তিত্বে শিবের শান্ত দৃঢ়তা। ভারতবর্ষের ক্লাসিক ও লৌকিক রসমণ্ডলকে আত্মস্থ করে কবি তাকে ব্যক্তি-স্বাক্ষরে চিহ্নিত করেছেন। সে স্বাক্ষরে নাগরিক শালীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধা এবং অপার নৈতিক সচেতনতা। যদিও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রেমের স্মৃতিতে দেখা যায় ভাগ্যের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ, একটা মৃত্যুর প্রসঙ্গ, তথাপি যে সমস্ত কবিতায় এ ধরনের প্রসঙ্গের ব্যবহার ঘটেনি সেখানেই প্রেমিকার স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি তাঁর কবিতাকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা। সেখানে 'বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে সেই তব দান'—এ জাতীয় উচ্চারণে আমাদের চেনা দর্শনের ছায়া দেখা দিলেও—'কথা ছিল শুধাবার সময় হল যে অবসান' এই উক্তিতে প্রেমের আখ্যানকে শেষ করেও প্রেমের করুণ গৌরবকে ধরে রাখায় লোকোত্তর সান্ত্বনা সন্ধানের থেকে অধিক সার্থকতা।

মহাকবি একটা জাতির জীবনাচরণকে প্রভাবিত করেছেন। আজ আমাদের সকল কিছুর মতো আমাদের ভালবাসায়, তার প্রথম উন্মেষে, তার প্রথম স্বীকারোক্তির অরুণিমায়, এবং অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে তোলায় তাঁরই ছায়া। আমাদের প্রেমের বাণীতে, প্রেমের লিপিতে তাঁরই ভাষা। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন যে, যে-প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে, যে প্রেম পথের মধ্যে পেতে রাখে নিজ সিংহাসন, তার বিলাসের সম্ভাষণকে যেন আমরা পথের ধূলিকেই ফিরিয়ে দিতে পারি।

রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক

মহাকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মোহ ছিল না। তাই মধুসূদন সম্পর্কে যেমন তিনি সুবিচার করতে পারেননি, তেমনি নিজের লিরিক-কল্পনাকে কটাক্ষ করে সকৌতুকে বলেছিলেন, 'পুরাণ চিত্র, বীর চরিত্র অষ্ট সর্গ, কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড নয়ন খড়্গ।' এই কৌতুক তাঁর নাটককেও স্পর্শ করেছে। গীতি-কবিতা তাঁর মহাকাব্য সৃষ্টির যেমন অন্তরায় হয়েছে—তাঁর নাটককেও সেইভাবে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারায় নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা এবং মায়ার খেলার পর্যায় পার হয়ে তাঁর নাট্যকার-সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল রাজা ও রানীতে। এর কিছু আগে অবশ্য নলিনী নামে আর একটি নাট্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রচনাগত ও বিষয়গতভাবে সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অতএব গীত-প্রধান নাটকগুলি বাদ দিলে রাজা ও রানী থেকেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু হল।

পরবর্তীকালে রাজা ও রানীও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রীতি লাভ করেনি। "এর নাট্য-ভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অতি শোচনীয়রূপে অসঙ্গত।" তা হলেও নাটকে যেটুকু সার্থকতা রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তা এই: "যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

'আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।' এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রমাণ করবার জন্য পরজন্ম পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়নি, ইহ-জীবনেও কখনো কখনো সে-কাজ তিনি করেছেন। তাঁর সেই সমালোচনা সর্বত্র শোভন হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। আটাশ বছর বয়েসের লেখা রাজা ও রানী আটাত্তর বছরের কাছে উপযুক্ত মূল্য পায়নি। যে-কোনো নিরপেক্ষ পাঠকেরই মনে হবে রাজা ও রানী রীতিমতো উঁচুদরের ট্র্যাজেডি। অথচ লেখকের নিজের এই অন্যায় মন্তব্যটিই অধিকাংশ সমালোচকের কাছে নাটকটি সম্পর্কে কুসংস্কার তৈরি করে রেখেছে।

কিন্তু এই অবিচার রবীন্দ্রনাথ কেন করলেন? কেন নিজের একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর এই অভিযোগ? এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া গেলে তাঁর নাট্যসৃষ্টির বিবর্তন রহস্যটিও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দুই

রাজা ও রানী শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির ট্র্যাজেডি। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব মহিষী সুমিত্রার রূপে উন্মত্ত, অন্তঃপুরের বাইরে তাঁর কোনো আনন্দ নেই। ফলে রাজকার্য উপেক্ষিত, রানীর কুটুম্ব কাশ্মীরী অমাত্যদের পীড়নে প্রজারা মৃতকল্প। রাজা নির্বিকার। কিন্তু সুমিত্রার অসহ্য হয়ে ওঠে: "অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।" প্রজাদের রক্ষার প্রয়োজনে এবং রাজার মর্যাদা বাঁচাতে সুমিত্রা পলায়ন

করেন। বিক্রমের কামনার আদিমতা অন্ধ-হিংস্রতার মধ্য দিয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটে বেরোয়। সেই হিংসার তাণ্ডবে বীর কুমার সেনের শোচনীয় আত্মবলি, সুমিত্রার মৃত্যু।

পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে ইলা-কুমার সেনের কাহিনী এমন অসহ্য অতিরিক্ত নয়—বরং পশ্চাৎভূমিরূপে কিছু নাট্যিক সার্থকতা তার আছে। লিরিক অবশ্য আছে, কিন্তু তারও প্রাচুর্য দুঃসহ নয়। তা হলে রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ কেন?

সাধারণ ভাবে নাটক হল ঐকতান—তার পূর্ণ ফললাভ সমগ্রতায়। কিন্তু যা বাঁশির সুর—তা একক। যিনি বাঁশিতে নিজের নিঃসঙ্গ সুরটিকে বিকীর্ণ করতে চান, ঐকতান নিয়ন্ত্রণ করবার প্রবণতা সর্বক্ষেত্রে তাঁর না-ও থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথেরও ঠিক তাই হয়েছে।

এই কারণেই রাজা ও রানীর বিচিত্র চরিত্র, তার বিভিন্নমুখী ঘটনা এবং আবেগের সংঘাত, উত্তরকালে একক সুরপন্থী রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। রসসমন্বয়ের বিস্তৃত পটভূমিকা থেকে সরে গিয়ে তিনি রসৈকতার সংকীর্ণ ক্ষেত্র নির্বাচন করে নিয়েছেন। আর তারই ফলে সমগ্র মানুষের 'ধুসর-প্রসর রাজপথ' ছেড়ে ধীরে ধীরে ভাবসর্বস্বতার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন সাংকেতিকতার জগতে, মিস্টিক্ অনুভূতির সূক্ষ্মতায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গে একটু পরে আমরা প্রবেশ করব।

বহির্মুখ সংঘাতধর্মী নাটক এবং একক ভাবের পুষ্পিত উচ্ছ্বাস—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সব চেয়ে করুণ হয়ে ফুটেছে রাজা ও রানীর পরবর্তী সৃষ্টি বিসর্জনে। এই বহুখ্যাত নাটকটির প্রধান লক্ষণীয় বিশেষত্ব হল যে বৈকুণ্ঠের খাতার পরে এইটিই সবচেয়ে বেশি অভিনীত হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশিবার সে অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে। অভিনয়ের দুর্বলতা বা মঞ্চসজ্জার দৈন্যই মাত্র তার জন্য দায়ী নয়। এই ব্যর্থতার কারণ নাটকটির মধ্যেই গুহানিহিত।

হিংসাশক্তির সঙ্গে প্রেমশক্তির সংঘর্ষ এবং হিংসার বিসর্জনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা—নাটকের বক্তব্যটি এই। রাজর্ষি উপন্যাসের বিস্তৃত জটিল কাহিনীর মধ্য থেকে ভাবের এই অংশটুকুই রবীন্দ্রনাথ সযত্নে আহরণ করে নিয়েছেন। নাটকের এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি প্রথম থেকেই অতি মাত্রায় স্পষ্ট—চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে বক্তব্যকে সিদ্ধান্তরূপে নিষ্পন্ন করা হয়নি, প্রতিটি চরিত্র উদ্দেশ্যকে পরিক্রমা করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে, যে রঘুপতি এমন অসামান্য বিরোধী শক্তিরূপে সংকেতিত হয়েছিলেন, তিনি প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে দেবার কাজে নাস্তিকের ভূমিকা নিয়েছেন, 'হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা জলে স্থলে' ইত্যাদি উক্তিতে ডারউইনের তত্ত্বে পৌঁচেছেন, 'মহা মিথ্যা'র সিদ্ধান্তে তাঁকে বৈদান্তিক বলে মনে হয়! গুণবতীর চমৎকার চরিত্রটি কলঙ্কিত হয়েছে ধ্রুবকে হত্যা করবার অহেতুক (তাঁর বিদ্বেষের কোনো পূর্ব ভূমিকা নেই) পৈশাচিক চক্রান্তে। মোগল এবং নক্ষত্র রায়ের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে গোবিন্দমানিক্যের বাণপ্রস্থের সংকল্প রূপ নেয় নিছক কাপুরুষতায়; রাজার সিংহাসনে বসে যিনি অনুজকে নির্বাসন দিতে পারেন—সেই রাজাই কেমন করে মোগলের পরাধীনতাকে ভ্রাতৃপ্রেমের নামে ত্রিপুরাকে উপহার দেবেন—সে-কথা অনুমান করা কঠিন হয়!

কিন্তু এগুলি বাইরের প্রশ্ন। সব চাইতে বড়ো কথা এই যে, একমাত্র ভাবের একক সুরটিকে এই নাটকে ধরতে চেয়েছিলেন লেখক, কিন্তু প্রথাসিদ্ধ নাট্যরীতিকেও তিনি বর্জন করতে পারেননি। তাই এর নাট্যিক সংলাপ রাজা ও রানীর মতো (কিছু আতিশয্য সত্ত্বেও) যথাবিন্যস্ত হয়নি—ঘটনার মৃত্তিকাভূমি ছাড়িয়ে

বারবার ভাবাবেগে উর্ধ্বচারী হয়েছে। জনতার দৃশ্যের স্থূলতা নাটকের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়—অকারণে তারা রসহানি ঘটায়। অর্থাৎ ভাবধর্মিতার সঙ্গে বাস্তবতার অন্বয়-সাধন এতে হয়নি। এই সামঞ্জস্যহীনতার জন্যই বিসর্জনে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ এবং সমুন্নত বক্তব্য সত্ত্বেও এর নাট্যায়ন সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। অপূর্ব লিরিকের অসামান্য নৈপুণ্যে পাঠক এক ধরনের পরিতৃপ্তি পান, কিন্তু দৃশ্যকাব্যরূপে এর উপস্থাপনায় দর্শক অবচেতনভাবে এই ফাঁকাটুকু অনুভব করতে থাকেন।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই প্রচলিত নাটকের বাস্তবভূমি থেকে, চরিত্র-সংঘাত ও ঘটনার দ্বন্দ্বময়তা থেকে একক ভাব—ঐক বক্তব্যের দিকেই তিনি অগ্রসর হলেন। বস্তুর প্রতি আনুগত্যে যে ভাবোচ্ছ্বাসকে তাঁকে বারবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংযত করতে হয়েছে রাজা ও রানীতে এবং বিশেষভাবে বিসর্জনে, তাকে নিরঙ্কুশ মুক্তি দেবার সুযোগ তিনি লাভ করলেন তাঁর কাব্য নাট্যগুলিতে। তাঁর সেই মুক্তির আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে পড়ল চিত্রাঙ্গদায়।

অবলম্বন 'মহাভারত'—কিন্তু কাহিনীর একটি সূক্ষ্ম সংকেত ছাড়া মহাকাব্যের কবির কাছে গীতি-কবিতার কবির আর কোনো আনুগত্য নেই। "এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্র্য-শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়।" অতএব "এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী।"

অর্থাৎ, চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে নাটক রচনা করবার বাসনাই এখানে মৌল-প্রবণতা নয়; মহাভারতের এই মহাবীর্যবতী নারীটির চরিত্রমহিমা পরিস্ফুট করবার জন্যও নাটক লেখা যেত—কিন্তু সে উদ্দেশ্যের দিক দিয়েই লেখক যাননি। ভাবটিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য—চিত্রাঙ্গদা তাঁর প্রকাশ প্রতীক (Expressive Symbol) মাত্র। অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা ছাড়াও অন্য যে-কোনো প্রতীক তিনি আশ্রয় করতে পারতেন, অন্য যে-কোনো জৈব উদ্দেশ্যমুক্ত চারিত্র্য শক্তি-দীপ্ত কণ্ঠে তিনি নাটকের মূল কথাটি ব্যক্ত করতে পারতেন :

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

চমৎকার রোমান্টিক কল্পনার বিস্তারে, পূর্ণ যৌবনের উজ্জ্বল প্রতিভায় ও প্যাশনের উত্তাপে চিত্রাঙ্গদা অপরূপ। ভাব এখানে মুখ্য, লিরিক নির্বাধ। লেখকের আনন্দ চিত্রাঙ্গদার প্রতি পংক্তিতে বিচ্ছুরিত—পাঠক পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই আনন্দের আমন্ত্রণে যোগ দিতে পারেন। এ কেবল সৃষ্টির আনন্দই নয়—

প্রচলিত নাট্যকলার বস্তুবন্ধন থেকে মুক্তির উল্লাসও এতে অনুভব করা যায়।

সেই উল্লাসই তরঙ্গিত হয়েছে বিদায় অভিশাপে, দেখা দিয়েছে মালিনীতে। মহৎ প্রেম যে মহৎ ক্ষমাতেই নিজেকে প্রকাশ করে, সেইটিই দেখানো হয়েছে কচের চরিত্রে। বিসর্জনের ভাবদ্বন্দ্ব নতুন ভাবে রূপায়িত হয়েছে মালিনীতে, ক্ষেমঙ্কর আত্মিকভাবে রঘুপতির সঙ্গে সম্বন্ধ, সুপ্রিয়ের মধ্যে জয়সিংহের ছায়াভাস, মালিনী পরোক্ষ অপর্ণা। কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো, প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে ঐক ভাবাশ্রয়ী কবিসত্তার দ্বন্দ্ব বিসর্জনের মতো এখানে প্রকট হয়নি; ফলে রঘুপতির মতো হীন চক্রান্তকারীর ভূমিকায় নেমে ক্ষেমঙ্করকে কলঙ্কিত হতে হয়নি—মালিনী যখন বলে, 'মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে'—তখন নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ ক্ষেমঙ্করের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই উৎসারিত হয়।

রাজা ও রানী এবং বিসর্জনের অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা সাময়িকভাবে স্বমহিম ক্ষেত্রে স্থিত হয়েছে এই কাব্য নাট্যগুলিতেই। একে একে দেখা দিয়েছে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস এবং কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। মহাভারত বা ইতিহাস—কাহিনীগুলি যেখান থেকেই আহৃত হোক, একক ভাবের বিন্যাসই এদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং আখ্যানগত বহিরঙ্গটি প্রকাশ-প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। মধ্যে মধ্যে সুন্দর নাটকীয়তাও এসেছে, যেমন গান্ধারীর আবেদনে দুর্যোধন ও ভানুমতীর চরিত্রে, সতীর শেষ দিকে বিনায়কের ভেতর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়গুলিতেও তাঁর এই কাব্য-নাট্যগুলি বিশিষ্ট। টম্‌সন এদের প্রশংসায় মুখর, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ অনুবাদ করবার আনন্দে ইংরেজ কবি জন মেস্‌ফিল্ড্‌ অনুপ্রাণিত। কিন্তু বিভিন্নভাবে সত্যের মহিমা উপস্থাপিত করবার সঙ্গে সঙ্গে যৎসামান্য নাট্যিক অনুষঙ্গকে অতিক্রম করে এদের মধ্যে কাব্যের প্রতিষ্ঠাই প্রধান:

"হেরো, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্‌ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে
চেতনা প্রত্যূষে। পুরাতন সত্য সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি—"

অথবা—

"লুটাও লুটাও শির, প্রণম রমণী,
সেই মহাকালে; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্‌ তার পথতলে।
ছিন্নসিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে

অঞ্জলি রচিয়া থাক্‌ জানিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন—"

পাহাড়ের তুষার শিখর থেকে সোনালী ঈগল ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকাশে—সেখানে কোথাও কোনো বাধা তার থাকে না। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সমতল ভূমি থেকে ক্রমেই চূড়ার দিকে উধ্বারোহণ করেছেন ; পেছনে পড়ে থেকেছে দৈনন্দিনতার জনপদ, পার হয়ে এসেছেন জটিল অরণ্যের মনোগহন, তারও ওপরের স্তরে কাব্যের পুষ্পিত উপনিবেশ। তারপর বিবিক্ত তুষারশীর্ষ থেকে আকাশ-যাত্রার অসীমতায়।
রবীন্দ্রনাট্যের তৃতীয় পর্বে এই নভোমুক্তির ক্রমবিকাশ।

তিন

চৈতালি, নৈবেদ্যের পথ বেয়ে খেয়া। খেয়ার পরে গীতাঞ্জলি।
রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনে এর মধ্যে অনেকখানি বিবর্তন ঘটে গেছে। রূপ থেকে চলেছেন অরূপের দিকে, সীমা থেকে অসীমে, মৃৎভূমি থেকে অধ্যাত্ম চেতনায়। খেয়া তাঁকে নিয়ে চলেছে অসীমের তটে, গীতাঞ্জলিতে জীবনবৃত্ত থেকে সমগ্র বিশ্বে সঞ্চারিত হয়েছেন তিনি :

"আকাশ তলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ানো দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই, আছি বসে—
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোয় শতদল।"

এই বিশ্বানুভূতি থেকেই রবীন্দ্রনাথের নব-পর্যায়ী নাটকের সূত্রপাত ঘটালো শারদোৎসব (ঋণশোধ)। রোমান্টিক চেতনা এইবারে মিস্টিক অনুভূতির মধ্যে উত্তীর্ণ হল। কাব্যগুলির ভেতরে যে আবেগ তিনি সঞ্চার করেছিলেন- সেগুলি ছিল ব্যক্তিসাপেক্ষ। কিন্তু শারদোৎসবে সেই ব্যক্তির বন্ধনটুকুও আর রইল না। সমস্ত পৃথিবী শরতের নির্মল নীল আকাশের নিচে, ঝরা শেফালী এবং কাশের গুচ্ছে, বুনো হাঁসের চঞ্চল পাখায় পাখায় আনন্দের ঋণ শোধ করছে। এই বিশ্বগত বক্তব্যটিই ধরা দিল শারদোৎসবে। চরিত্র এতে আছে, কিন্তু তারা কতগুলি সর্বজনীন ভাবের বাহকমাত্র, কায়িক নয় ; উপানন্দ, লক্ষেশ্বর, রাজা, সন্ন্যাসী-সম্রাট, ঠাকুর্দা, ছেলের দল—এরা সবাই প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে-কোনো মুহূর্তেই আবার তার মধ্যে তারা মিলিয়ে যেতে পারে।
দেশ-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা এইবার থেকে লুপ্ত হল। ব্যক্তিসত্তার সীমিত পরিচয় আর রইল না—চরিত্রগুলি হয় বিশ্ব-প্রকৃতি নয় বিশ্ব-মানবতার এক একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। সারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এখন থেকে

ঘটনাগুলি অভিনীত হতে লাগল। বিশেষ পরিণতি পেলো নির্বিশেষের ভেতরে।

ঘটনাধর্মী এবং বাস্তবনির্ভর নাটক রচনার শেষ চেষ্টা দেখা গেল প্রায়শ্চিত্তে। 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নব-রূপায়ণ এই নাটকটি। রাজর্ষি থেকে বিসর্জনে যেমন ভাববস্তুটিকে আহরণ করে আনা হয়েছে, এখানেও তেমনি তুলে ধরা হয়েছে হিংস্র শক্তিমত্তার সঙ্গে প্রেমের সংঘাতের তত্ত্বটি কিন্তু বিসর্জনের মতো এই নাটকও বিকেন্দ্রিত। ধনঞ্জয় বৈরাগী কাহিনীর বস্তুমুখিতাকে ভাবের দিকে বইয়ে দিয়েছে, নাটক ছড়িয়ে গেছে এক আনন্দময় মুক্তির মধ্যে :

"আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর
ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।"

প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে চুক্তির পালা এইখানেই মিটিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এল সাংকেতিক নাটকের যুগ। অচলায়তন, ডাকঘর, রাজা, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ। নাটকের চরিত্র, সংলাপ, সঙ্গীত, ঘটনা সংকেতের মধ্যে প্রসারিত হল, ব্যাখ্যা মুক্তি পেলো ব্যঞ্জনায়।

মেতারলিঙ্ক্, সীঙ্গ, হাউপ্‌ট্‌ম্যান (তাঁর রিয়ালিস্ট কিংবা ন্যাচারালিস্ট্ নাটক নয়—শেষ দিকের মিস্টিক্ বইগুলি) কিংবা ঈয়েট্‌সের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ হয়তো আঙ্গিকগত ভাবে কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যগত পার্থক্য অনুসারে সাংকেতিকতার সূত্রও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। তাই আইরিশ কিংবা জার্মান লেখকের মিস্টিক উপলব্ধি ভারতীয় পাঠকের কাছে যেমন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে না, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের "রাজা" (অরূপ রতন) কিংবা ডাকঘরও ইওরোপের কাছে তাদের সত্যিকারের তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারেনি। টম্‌সনের বই থেকে আরম্ভ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সমালোচনার বিভ্রান্তির মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্র মানসের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু মন জীবন ও জগতের প্রতি মানবিক দায়িত্বকে কোনোদিন উপেক্ষা করেনি। তুষারশীর্ষ থেকে ডানা মেলে দেওয়া সোনালী ঈগল সুদূর আকাশের আহ্বানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু অরণ্য-নদী-জনপদের সঙ্গে যে তার রক্তনাড়ীর সংযোগ, সেই কথাটিও সে কোনোদিন ভোলেনি। প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম পক্ষপাত। দিন-বদলের পালায় নতুন মানুষের যে দামামা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—মৃত্যুর পূর্বেও সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আশীর্বাদ জানাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।

তাই উত্তর পর্বের এই সংকেতধর্মী নাটকগুলিও দু-ভাগে বিভক্ত। বিশ্ব নটরাজের রঙ্গশালায় ফাল্গুনী ডাক পাঠিয়েছে, মৃত্যু-মুক্তির আহ্বানে অসীমের পথে বেরিয়ে পড়েছে অমল, চোখের আলোর বহির্জগৎ থেকে অরূপের সন্ধানে নিরালোক অন্তরের মধ্যে ফিরে এসেছে সুদর্শনা। আর অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ ও রথের রশি সোজাসুজি জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যার মধ্যে অবতরণ করেছে।

অচলায়তন আর তাসের দেশের বক্তব্য সাধারণ ভাবে এক নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার জড়ত্ব থেকে মুক্তি। রথের রশি গণশক্তির বন্দনা। রক্তকরবীতে ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মুক্তধারায় জাতিবৈর এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অচলায়তন, তাসের দেশ, রথের রশি আর মুক্তধারার পটভূমিতে ভারতবর্ষ

সংকেতিত। রক্তকরবীতে মোটামুটি ইওরোপ এবং প্রধানভাবে আমেরিকার ছায়াপাত।
তবুও এই নাটকগুলিতে ঘটনা-সংঘাত পরোক্ষ, ভাব-সংঘাতই এদের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্রে, সংলাপে কিংবা ঘটনায় এরা কখনো কখনো রূপকের দ্ব্যর্থতার কাছাকাছি আসে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। হয় ঠাকুর্দা আসেন নইলে আবির্ভাব হয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর, নাটকীয় বক্তব্য অর্থের সীমা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনার ভেতরে বিস্তৃত হয়।

রক্তকরবীর কথাই ধরা যাক। আপাত দৃষ্টিতে এটাকে খোলাখুলি রূপক বলে মনে হয়—ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের মতো অনেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। রক্তকরবীর শ্রমিক চরিত্রগুলি, তার সর্দারের দল এবং গোসাঁই—এদের রূপকার্থে চিনে নিতে দেরি হয় না। কিন্তু রাজা? সে নির্বিশেষ—সারা পৃথিবীর ধনতান্ত্রিকতার প্রচণ্ড শক্তিময়তার প্রতীক, রঞ্জন তারই প্রাণসত্তা—যাকে নিজের হাতে সে হত্যা করেছে, নারীরূপিণী নন্দিনী এসেছে রাজার নিজের গড়া জাল থেকে আনন্দ আর কল্যাণের মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে।

তাই শেষ পর্যন্ত নাটকের ফলশ্রুতিতে সমাজবাদী শ্রমিক বিদ্রোহের একটা আপাত রূপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেইটিই এর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে না। এমন কি, যন্ত্র সভ্যতা থেকে কৃষি-সভ্যতার মধ্যে ফিরে যাওয়ার ক্রীশ্চান 'মিলেনিয়াম'ও এর অভিপ্রায় নয়। আগামী দিনের নির্দিষ্ট কোনো সমাজ-ব্যবস্থার নির্দেশও রক্তকরবীতে নেই। তা হলে কী আছে?

"মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল,—
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো।"

পৌষের পাকা ফসলে ভরা ক্ষেত এক নির্বিশেষ সামগ্রীর কর্ষণার ভূমি—যেখানে সমস্ত মানুষের ক্ষুধার খাদ্য আনন্দের হিরণ্যে হরিতে অবারিত দিগন্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে তথ্যগত কোনো নিষ্পত্তি পাওয়া যায় না—নিজের ধ্বজদণ্ড ভেঙে দিয়ে রাজারূপ মানবশক্তি যে নব-জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে তা রূপকের বাস্তব সন্নিহিতি অতিক্রম করে ভাবের ছায়াপথে প্রসারিত।

বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়ার এই প্রয়াস—দেশ-কালের খণ্ডতাকে অখণ্ডের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা মুক্তধারাতে আগে ভালো করে লক্ষ্য করা যাবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা আগেই বলেছি। এর বস্তুভারে এবং ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জীর দায়ে পীড়িত রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে আরো ভাবধর্মী করে তুলেছেন পরিত্রাণে। কিন্তু সেইখানেই তা শেষ হয়নি। একান্ত ভাবনির্ভর হয়ে এই নাটকখানিই নবজন্ম নিয়েছে মুক্তধারায়।

মুক্তধারা অত্যন্ত উঁচুদরের নাটক। রক্তকরবীর অতি-ভাষণ এবং রূপক ও সাংকেতিকের মিশ্রণগত বিশৃঙ্খলা থেকে নাটকটি প্রায় মুক্ত। প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক বৃত্ত ভেঙে গিয়ে তাঁর ক্ষমতালিপ্সা তত্ত্বরূপ নিয়েছে রণজিৎ নামের ভেতর; উদয়াদিত্য অভিজিৎ হয়ে বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন—কোনো জাতি-ধর্ম-দেশের গণ্ডি দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়নি, তিনি মুক্তধারার সন্তান। অম্বা শোষণযন্ত্রের বলি কোটি কোটি সুমনের জননী, বিভূতি অর্থে অসাধ্যসাধন শক্তি। উত্তরকূট উত্তরকালের কূটবুদ্ধি সাম্রাজ্যবাদ; শিবতরাই চির মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাভূমি প্রাচী-পৃথিবী, ধনঞ্জয় বৈরাগী তারই আত্মিক শক্তি। পশ্চিমী শোষণবাদের নির্মম নিষ্ঠুরতার বাঁধ ভেঙে দিয়ে সমগ্র মানবতার জন্য যে মুক্তধারাকে মুক্তি দেবে, সে সর্ব দেশ-কাল জাতির সংস্কারমুক্ত এক Universal Man—অভিজিৎ। 'ঐ মহামানব আসে'—সারা পৃথিবীই তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। যে প্রায়শ্চিত্ত নাটক ছিল সূচনাতে মূলত পরিবারকেন্দ্রিক, তা ক্রমশ বৃহত্তর ক্ষেত্রে

বিস্তীর্ণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নিখিল মানবতার রূপায়ণে সিদ্ধিলাভ করেছে। এই নাটকের সমাপ্তিও কোনো তথ্যের মধ্যে গিয়ে বক্তব্য শেষ করছে না, ভৈরবপন্থীদের সঙ্গীতের ধ্রুবপদে এক অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনায় বিচ্ছুরিত হয়েছে।

সুতরাং বস্তুরেখা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কাব্য-নাট্যের লিরিক্ উল্লাসে, তারপর রোমান্টিসিজ্‌মের অনির্দেশ আনন্দ-ময়তা থেকে মিস্টিক-অনুভূতির ধ্যান প্রত্যয়ে; জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে অপার দিগন্তে আর দিগন্ত ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অনন্তে—রবীন্দ্র নাট্যধারার বিবর্তনের মূল সূত্রটি তাই। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সেই সূত্রটিই মাত্র নির্দেশ করা গেল। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নাটক 'বাঁশরী' সমকালীন সমাজের সঙ্গে বহিরঙ্গগত সম্পর্ক রেখেও ভাবপ্রবণতার মধ্যেই পরিণত।

চার

অতএব রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাথের কেন ভালো লাগেনি, সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যিনি একক বাঁশির শিল্পী, ঐকতানের আসরে তাঁর তৃপ্তি নেই। আর সেই বাঁশির সুরকে যিনি আকাশের তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান—তাঁর পক্ষে এই পরিণতিই স্বাভাবিক।

তাই শেষ পর্যন্ত রাজা ও রানীকে তপতী হতে হয়েছে। না হয়ে উপায় ছিল না। আর সুমিত্রার আত্মাহুতিতে মাত্র বিক্রমের অন্ধ হিংস্র কামনাকেই আহুতি দেওয়া হয়নি, পৃথিবীব্যাপী সমস্ত ব্যর্থ-বাসনা ও উদ্দাম জৈবতার প্রতি উচ্চারিত হয়েছে, সামগ্রিক শান্তির মন্ত্রবাণী :

> "অস্থা দেবা উদিতা সূর্যস্য।
> নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ॥
> পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
> শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি ॥ সুশোভন সরকার

প্রগতি কথাটা অনির্দিষ্ট, তার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিপুল পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই বোধহয় প্রগতির সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ প্রতিশব্দ। কিন্তু ঘটনাচক্রে সারা জগতে আজ এর একটা বিশিষ্ট আধুনিক রূপ ফুটে বেরিয়েছে। আজকের দিনে অগ্রগতির যথার্থ বাস্তব রূপ হচ্ছে সাম্যবাদের আকর্ষণ, সাম্যতন্ত্রের প্রস্তুতি। শ্রেণীবর্জিত নূতন সমাজ গঠন আমাদের দেশেও বহু নরনারীর কাম্য হয়ে উঠেছে, তাই পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরনো ধারণাগুলি অনেকাংশে ম্লান হয়ে আসতে বাধ্য। এটা ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের কথা, এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞার মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের দেশে প্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নির্ণয় করতে হলে তাই আজ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। ভুল বোঝার সম্ভাবনা যাতে কমে আসে সেইজন্য প্রথমেই এই ভাবে অগ্রগতির সংজ্ঞা নির্দেশ করা লেখকের প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, দেখতে হবে দেশে গত অর্ধশতাব্দীর পরিবর্তন-ধারা এবং আগামীকালের উপর তাঁর প্রভাব কতখানি, এবং আমার বিশ্বাস সেই দেখাতে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া অনিবার্য। শুধু রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণ এখানে উদ্দেশ্য নয়, কারণ এ-কথা বোঝা সহজ যে বিরাট প্রতিভাও যুগধর্মের বিরোধী হতে পারে।

আমার সাম্যভাবাপন্ন বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ দেখতে পাই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রামাণিক আচার্যদের লেখায় সাহিত্য বা শিল্পের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতিই তাঁদের প্রধান আলোচ্য বস্তু ছিল। আজ তাই একদিকে শুনি রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিতের কবি ছিলেন, জনসাধারণ এমন কি প্রলেটেরিয়াটের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় যোগ ছিল। অন্যদিকে এ-কথাও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াধর্মী আভিজাত্যের প্রতীক, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বললেও বিশেষ অন্যায় হয় না।

উপরোক্ত উভয় মতের মধ্যেই কিছু সত্য রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং সমস্যা এই যে আংশিক সত্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ায়। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে এই পদ্ধতিই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের স্বরূপ। সাম্প্রতিক সাম্যভাবের প্রাণবস্তু যে মার্কসবাদ, বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। এমন কি রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বিস্ময় অবধি তাঁকে সেদিকে টানতে পারেনি। কিন্তু এই সর্বস্বীকৃত সত্যটি আমাদের প্রশ্নের উত্তর নয়। সামাজিক চেতনার যে-স্তর থেকে মার্কসপন্থার উদ্ভব, তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হলেও কোনো চিন্তা বা কর্মধারা যে পরিবর্তন অথবা প্রগতির সহায় হতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে বিরল নয়। মার্কস নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটা একটা খুব বড়ো কথা। অতীতে প্রগতির রূপনির্দেশের সময় এই সূত্রটি বিশেষ কার্যকরী হতে বাধ্য; আর মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেকখানি সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তের চাইতে অতীত কাহিনীরই পর্যায়ে পড়ে। সমসাময়িক ইতিহাসেও অবশ্য তাঁর স্থান রয়েছে, কিন্তু এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ সমগ্র দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তা কোন্ স্তরে পৌঁচেছে তা স্মরণ রাখতে হবে। লেনিনের

ভাষায়, ডায়েলেকটিকসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বহুমুখী বিচার। এর অভাবে অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একদেশদর্শী হয়ে পড়বে। আলোচ্য প্রশ্নের এক কথায় কাটা ছাঁটা উত্তর তাই অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। আমি নিজে মনে করি যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রগতিবিরোধী ধারণার অসদ্ভাব নেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে তাঁকে অগ্রগতির সহায়করূপেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিছুদিন আগে যখন ভারতীয় সাম্যবাদী দল তাঁর উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল, তখন তার পিছনে সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভ্রান্ত যুক্তি ছিল বলে মনে হয় না। যে বিশ্লেষণের উপর আমার এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তার কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই মনে পড়ে যে, প্রগতিবাদী মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে। তার মধ্যে progressive মনোভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকে বিশেষ কয়েকটি রচনার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বহুকাল আগেকার 'এবার ফিরাও মোরে' ও অতি-আধুনিক 'আরোগ্যে'র দশ নম্বর কবিতার উল্লেখ চলে। প্রথম কবিতাটির গোড়ায় মূঢ় ম্লান জনগণের মুখে ভাষা দেবার সংকল্প আছে, কিন্তু তার পরিণতিতে যে বিশ্বাসের ছবি দেখতে পাই তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে অজানা বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতাকে বলিদান দেওয়া। তেমনি "আরোগ্যে"র কবিতাটির সারমর্ম এক অতি পুরাতন সত্য—শত শত সাম্রাজ্য ওঠে, আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু যারা কাজ করে সেই জনসাধারণ চিরকালের। মনে রাখতে হবে যে, এই জাতীয় সমস্ত লেখা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ব খর্ব হয় না, এমন কি এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনার মধ্যে গণ্য নাও হতে পারে। সকল মহাকবির মতন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা কল্পনা মূর্তি পেয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ কোনো একটি mood-এর দিকে অতি-মনোযোগ সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদের কথাও আসে। এখানেও শিল্পীর ঈপ্সিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই মাত্র, প্রগতি বা যুগান্তরের কোনো কথা এখানে ওঠে না।* নিছক সামাজিক অত্যাচার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্য-রচনায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এই প্রবন্ধে প্রগতির সাম্প্রতিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞাটুকুই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো লেখার নিবিড় যোগ দাবি করা চলে না।

সুখ্যাত কবি হয়েও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনো নিজেকে সাহিত্য রচনায় আবদ্ধ রাখেননি। স্বদেশী যুগে, এবং তার আগে বা পরেও দেশের নানা আন্দোলন থেকে তিনি আপনাকে আর্টের খাতিরে বিচ্ছিন্ন রাখবার সাধনায় মগ্ন হতে পারেননি। তাঁর মতন মহাকবির পক্ষে কর্মী হিসাবে নিজের মনের পূর্ণতা সন্ধান নিশ্চয়ই বিস্ময়জনক। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাঁর তখনকার লেখা রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির দৃপ্ত তেজ ও সরল ভঙ্গি বরাবরই পাঠকের মন মুগ্ধ করবে। কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা বিশেষ ছাপ রেখে যায়নি, কাজেই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সার্থকতা লাভের দাবি এক্ষেত্রে বোধহয় অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মতামতের অনেকখানি প্রগতিবাদীদের তৃপ্তি দিতে পারে না, এ-কথা স্বীকার করাও নিশ্চয় দোষের নয়।

* শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্তী "পরিচয়ে" লিখেছেন যে, তিনি রবীন্দ্র-রচনায় শ্রমিকের স্বীকৃতি দেখতে পাননি। "স্বীকৃতি" কথাটি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে শ্রমিকের দাবি স্বীকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" পুস্তিকায় কিন্তু শ্রীযুক্ত অমল হোম বসুধা-বাবুর লেখার তীব্র প্রতিবাদ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্য সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রে পরিপূর্ণ। পরবর্তী লাইনেই বসুধাবাবু লিখেছেন—"দেখলুম শুধু উদার অনুকম্পা।" এই অনুভূতি ও স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্যটুকু অমলবাবু বুঝতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক চিন্তা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকেনি; সারা জগতের সমস্যা তাঁকে পীড়া দেওয়ায় এক বিশিষ্ট বিশ্বদর্শন তাঁর নানা লেখায় মূর্তি গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমের ভাষায় উদার হিউম্যানিস্ট হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত। কিন্তু আজকের দিনের প্রগতিবাদে হিউম্যানিজম মূল্যবান হলেও যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্ত্য ন্যাশনালিজমকে দেশাত্মবোধ থেকে পৃথক গণ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র নিন্দা করেছিলেন, সেই উগ্র জাতীয়তা-বাদ ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হওয়া তাঁর বাঞ্ছনীয় মনে হয়নি। কিন্তু nationalism কে বিকৃতি বা ব্যাধি আখ্যা দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না, কেননা যুগ বা অবস্থা বিশেষে এই জাতীয়তাবোধ লোকের কাছে স্বাভাবিক বলেই গণ্য হয়, আমাদের দেশেও গত অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। Nationalism-এর পরিণতি Imperialism এ, সেই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তার মূল খুঁজেছেন লোভের মধ্যে। কিন্তু মানুষের এক সনাতনী প্রবৃত্তি হঠাৎ এ যুগে এত প্রবল হয়ে উঠল কেন এ প্রশ্নকে তিনি আমল দেননি। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিস্থলে তিনি আর্থিক ও সামাজিক অভিব্যক্তিকে গ্রাহ্য না করে রিপুর তাড়নার উপর জোর দিয়েছিলেন—প্রতিকারের আলোচনায় তাই তাঁকে চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কোনো কর্মপ্রণালী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা যন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঠিকই লিখেছিলেন যে, কল্পনান্তের বিক্ষোভ পর্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়নি। জীবনের উপান্তে এসেও তাই "কালান্তর", "সভ্যতার সংকট" প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর স্বভাবজাত মানবধর্মে বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশ্বাস প্রগতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক পৃথক। পূর্বদিগন্তে পরিত্রাণকর্তা মহামানবের সম্ভাবনাকে অবশ্য কবির আন্তরিক আবেগ হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে রুশদেশে নূতন সমাজের জন্মকে যখন তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখনো তিনি কেন এই পরিবর্তন সম্ভব হল, এর মূল প্রেরণা কোথায়, সে সমস্যাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বিশ্বাসকেও প্রগতির অনুকূল বলা চলে না। এখানে শুধু materialism বিরোধী আদর্শবাদই বড়ো কথা নয়, personality রবীন্দ্র দর্শনের মূল বস্তু। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সাধনায় শুধু কবির জীবনাদর্শ ছিল না, religion of man-রূপে এই সাধনাকে তিনি ধর্মের উৎসভাবে দেখেছিলেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সভ্যতার মর্মকথা, আধুনিক যান্ত্রিকতা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অথচ সেই যন্ত্রবিলাসিতার আড়ালে রয়েছে পুঞ্জীভূত অবসাদ আর গ্লানি—'রক্তকরবী' রূপকের বিষয়টি সম্ভবত এই। কবি 'personality'-র অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বন্দনা করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের সাধনা এখন অল্পলোকের পক্ষেই সম্ভব, কাজেই তাতে সমাজের সমস্যা মিটতে পারে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সমষ্টির পক্ষে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ আনতে হলে প্রথমে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে; সেক্ষেত্রে কাজেই আবার সেই মূল ভাবনা সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি মতামতের সঙ্গে প্রগতিবাদীদের পার্থক্য উপরে একটু ব্যাপকভাবেই আলোচিত হল। কিন্তু তবুও আমাদের অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য বলেই গণ্য হবে। বিশিষ্ট কতকগুলি মতের চাইতে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়ো ছিলেন; মহাকবি এবং মহৎ শিল্পী তাঁর প্রকৃত পরিচয় বলেই তাঁর স্বকীয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বাংলার জীবনে তাই মনে হয় তিনি মুক্তির সহায়ক রূপেই স্মরণীয় থাকবেন। তাঁর কয়েকটি বিশ্বাসের সম্বন্ধে মনে যে সংশয় ও তর্কের উৎপত্তি হয়, শেষ পর্যন্ত

তার প্রয়োগ চলে সেই ভক্তদের বিরুদ্ধেই যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই মতামত আঁকড়ে ধরে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মতসমষ্টির কতগুলি অপরের মধ্যে কতখানি সঞ্চারিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রবল সন্দেহ অযৌক্তিক নয়। পক্ষান্তরে অন্য অনেক দিকে তাঁর প্রভাব অবিসংবাদিত সত্য। সেই প্রভাবই ভবিষ্যতে অধিকতর কার্যকরী হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে তার শুধু আংশিক পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথমেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পসাধনার কথা মনে আসে। ভাষা আঙ্গিক ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্বন্ধে আজ মতভেদ অসম্ভব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান উৎস তিনি—পৃথিবীতে অনুরূপ অন্য কোনোও সাহিত্যে একজনের সৃষ্টি এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তাঁর সৃজন-প্রতিভা সর্বতোমুখী। প্রাক্-রাবীন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য তাই আজ আর বাঙালীকে তৃপ্তি দেয় না, ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। আগামী কালে বাঙালীর আশা-ভরসা প্রকাশ পাবে যে-ভাষাতে, সে ভাষাই তো তাঁর হাতের গড়া। আঙ্গিকের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাফল্য অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর লেখায় বাংলা ছন্দের রাজ্যে বিপ্লব-সাধনের উল্লেখ অপরিহার্য। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন যে তিনি যোগ্য কথার সঙ্গে যোগ্য সুরের মিলন ঘটিয়ে একটি বিশেষ আনন্দরসের সৃষ্টি করেছেন। নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দানও অবিস্মরণীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রকলাও ভারতশিল্পের একদিককার দৈন্য ঘোচাতে সহায় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করলে আজকের দিনের বাংলা সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না, তার প্রাণ পর্যন্ত বাদ পড়ে।

অবশ্য এ সব তো সর্বস্বীকৃত, কিন্তু বাংলা কালচারের সঙ্গে প্রগতির সংস্রব কতটুকু? অনেকের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের সংস্কৃতি পুরাতনকে একেবারে বাদ দিয়ে গড়ে উঠবে। এ বিশ্বাস ডায়ালেকটিকাল অগ্রগতির রূপের সঙ্গে খাপ খায় না। ডায়ালেকটিক্সে ক্রমবিকাশ সরল রেখা ধরে অগ্রসরণ হিসাবে কল্পিত হয় না বটে, কিন্তু ক্রমোন্নতির পথে পূর্বগামী লাইনের সম্পূর্ণ লুপ্তিও এখানে স্বীকৃত হয়নি। পুরাতন সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটবে, তাকে নূতনভাবে দেখবার চোখ খুলে যাবে, অনেক প্রাচীন আবর্জনা লোপ পেতে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির নূতন সম্ভাবনা পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু শ্রেণীবিহীন সমাজের সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া কালচারের সমস্ত কীর্তির উচ্ছেদ হবে, এ বিশ্বাসের ডায়ালেকটিকাল সমর্থন কোথায়? সোভিয়েট রাশিয়ার অভিজ্ঞতাও উক্ত বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত। সেখানে একদিকে প্রাকবুর্জোয়া লোকসংস্কৃতির, অন্যদিকে শেকসপীয়র থেকে রুশ সাহিত্যস্রষ্টাদের সকলেরই, অর্থাৎ কালচারের প্রধান প্রতিনিধিদের, যোগ্য সমাদরের অভাব হয়নি। *

বুর্জোয়া সংস্কৃতির আলোচনায় দুটি বড়ো কথা আছে। প্রথমত, যুগান্তরের মুখে এর মধ্যে একটা স্বভাবজাত ভয় ফুটে বের হয় ভবিষ্যতের সম্বন্ধে। ফলে স্থবিরত্ব এর উৎস রুদ্ধ করে ফেলে, সমস্ত সংস্কৃতি হয়ে পড়ে পঙ্গু বিপন্ন। বুর্জোয়া প্রতিবেশ রবীন্দ্র প্রতিভাকে খর্ব করেছিল কিনা এ আলোচনা আমার পক্ষে

* 'আশার কথা' নিবন্ধিকায় শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে টলস্টয়ের ধর্মপ্রবণ রচনাগুলির প্রচার সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হল কি করে। প্রাচীন লেখকদের নিয়তি, সমাজধর্ম ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস আগেকার পাঠকদের মন নিশ্চয়ই অভিভূত করত; স্বতন্ত্র পরিবেশে বাস করি বলে আমাদের আর সে-সব ধারণা সে-ভাবে স্পর্শ করে না, অথচ প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্যরসে আমরা বঞ্চিত নই। রুশদেশে বিশাল পরিবর্তনের পর টলস্টয়ের বিশিষ্ট কয়েকটি মতামতে বিশ্বাসী না হয়েও পাঠকদের পক্ষে তাঁর সাহিত্য-সম্ভোগ কেন অসম্ভব হবে তা বোঝা শক্ত। তবে লীলাময়বাবুর বোধহয় পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তনের ফলে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

অনধিকার চর্চা। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন নানা সংস্কার তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি নির্ভীক ছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র ৩য় সংখ্যায় সেই বিখ্যাত 'ভয় কিসের' তাঁর অন্তরের কথা এবং সে বাণী তাঁর দেশবাসীর কানে বাজা উচিত। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া সংস্কৃতি স্বভাবতই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ম্যাক্সিম গর্কির শ্রদ্ধাবাসরে আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন যে, আজকের দিনে সংস্কৃতি ছোট উদ্যানের মতন, সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। শ্রেণীবিহীন সমাজ গড়ে উঠলে সে প্রাচীর অবশ্য ভেঙে যাবে। আমাদের দেশে তখন রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্যাদা নিশ্চয় বাড়বে বই কমবে না, কারণ ভাষা, আঙ্গিক ও সৌন্দর্যবোধের রাজ্যে তাঁর কীর্তি অনবদ্য। ভবিষ্যতের বাংলা কালচার তাঁকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে পারে।

ভবিষ্যৎ সমাজের পুরাতন সংস্কৃতি পুরনো বলেই পরিত্যক্ত হবে না, তাকে নূতন করে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় সমৃদ্ধির বাড়বারই সম্ভাবনা। অথচ বলা চলে না যে সকল রচনাই কালোত্তীর্ণ হয়। তাহলে এসথেটিক্স বা নন্দনতত্ত্বই কি শেষ পর্যন্ত ঠিক করবে কোনটা টিকবে আর কতখানি লোপ পাবে? কতকটা তাই বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এসথেটিক্স ও সাহিত্যের মূল্যবিচার কোনো স্থির যান্ত্রিক অচলা বিদ্যা নয়। তারও বিবর্তন আছে, এবং যুগে যুগে নূতন standard-এর উদ্ভাবন হয়; অর্থাৎ দেখবার ভঙ্গিটাই নির্ভর করে অনেকখানি সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর। সুতরাং বুর্জোয়া সংস্কৃতির ঠিক কতখানি ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হবে, এ-কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। কিন্তু ভাষা, আঙ্গিক এবং সৌন্দর্যবোধে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব এত বেশি যে যতদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায় তাতে মনে হয় না যে তাঁকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলার পরিশীলন-সম্পদ গড়ে উঠতে পারবে।

Others abide our question. Thou art free.

অগ্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলাতে আবদ্ধ নয়। কথাটা আশ্চর্য শোনালেও মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মধ্যেও সে গতির সমর্থন পাওয়া যাবে। আধুনিক ইতিহাসে ধর্মব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সেই সংঘবদ্ধ ধর্মাচার (organised religion) নিশ্চয়ই প্রগতির বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনায় ধর্মবিশ্বাস অনেকখানি কবিত্বময় আবেগে রূপান্তরিত হওয়ায় সে বিরোধ বড়ো হয়ে ওঠেনি। সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে তাই মনে হয় যে ধর্মের প্রচলিত ঐতিহাসিক রূপের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকখানি অগ্রগমনের পরিচায়ক। যদিও দার্শনিক idealism, আত্মার অস্তিত্ব ও ভগবানের ব্যক্তিত্বে একটা মজ্জাগত বিশ্বাস নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রগতিবাদীর চোখে এ সত্ত্বেও তাঁর অগ্রসরণ মহত্ত্বের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্মের যে সংগঠিত মূর্তি সামাজিক রক্ষণশীলতার অঙ্গ, তাতে তিনি বরাবর পীড়া অনুভব করেছিলেন। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, সম্প্রদায় তাঁকে টানতে পারেনি, সুনির্দিষ্ট মতবাদকে অর্থাৎ creedকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না এমন কি আচারবিধির প্রতিও তাঁর বিশেষ আস্থা দেখা যায়নি; অথচ ধর্ম-মাত্রেই এর কোনোও না কোনোটিকে আশ্রয় করে। ইতিহাসে পুরাতন ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য বারবার বিদ্রোহ দেখা গেছে, কিন্তু স্বভাবতই সে বিদ্রোহ নূতন কোনো ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সে পর্যায়ে পড়ে না-তার প্রকৃতি প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ধর্মের পুনর্গঠনের অভিযান নয়। রামমোহন রায় হয়তো পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করতে চাননি, তবুও ব্রাহ্মসমাজ তাঁর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আচার-বিধির গণ্ডি ছাড়িয়ে

যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোনোও নূতন ধর্মের উৎসরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে mysticism-এর একটা ধারা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু mystic-এর চাইতে humanist-ই কি তাঁর সত্যতর পরিচয় নয়? ইতিহাসে দেখি humanism পুরনো ধর্মের অবসান সূচনা করেও সাধারণত ধর্মের পুনরুত্থানের প্রেরণা যোগায় না। সংগঠিত ধর্মের ক্ষয়প্রাপ্তি, তার withering away অগ্রগতির কাম্য বলে, পরিবর্তনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ-দিক দিয়েও একটা নিগূঢ় যোগ আছে মনে হয়। অনেকে বলবেন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ব্যক্তিগত, কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়; আসলে শিল্পীর আন্তরিক আবেগ ও সৌন্দর্য উপলব্ধিই তার প্রাণ ছিল। সমাজ-সংশ্লিষ্ট ধর্মবোধ আর চরম সত্যে আশ্রয়ের চাইতে রূপকার ও কবি-মানসের অনুভূতিই এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। উপনিষদ তাঁকে বরাবর তৃপ্তি দিয়েছে, কিন্তু উপনিষদের অসাধারণ সৌন্দর্য তো সর্বজনবিদিত। তার দার্শনিক বিশ্বাস ও মূল তত্ত্বকথার চাইতে এদিকটাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করত। সকলে কখনই এখানে একমত হবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মূল প্রকৃতি ভেবে দেখার কথা। ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মসংক্রান্ত সব রচনায় তিনি বারবার যে মূল সুর ধ্বনিত করেছেন, আমি মনে করি যে organised religion, এমন কি সাধারণ personal religion থেকে তা স্বতন্ত্র। সেইজন্য সম্প্রতি কেউ কেউ যে তাঁর মধ্যে secular ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ বোধগম্য। এই বন্ধনমুক্তি ও ধর্মভাবের রূপান্তরকে অগ্রগতির সহৃদয়করূপে মানা উচিত।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এমন অনেক কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন যার স্মৃতি সহজে ম্লান হবে না। সে-সব দিকেও তাঁর শক্তি জাতীয় জীবনে বিশাল পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রথম থেকে ভিক্ষাবৃত্তির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন; যে আত্মশক্তির উদ্বোধন তাঁর অবিচল লক্ষ্য ছিল, পলিটিক্সে তার মূল্য অসীম। সেকালের পলিটিক্যাল প্রচেষ্টার প্রধান দুর্বলতা তিনি ধরতে পেরেছিলেন—জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের যথার্থ সংযোগের অভাব তাঁকে ক্রমাগত পীড়া দিত। বয়কটের উন্মাদনার মধ্যেও তাই তিনি 'সদুপায়' প্রবন্ধে লিখেছেন যে স্বদেশী কর্মীরা সাধারণ লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না করেও আত্মীয়তার দাবি আনছে। চাষীদের অর্থকষ্ট যে দেশের এক গুরুতর সমস্যা এ কথা তিনি কখনও ভোলেননি; গ্রাম সংস্কারের উদ্যম তাই তাঁকে টেনেছিল প্রথম থেকেই। বাংলাদেশে মেলার মধ্য দিয়া সহজে কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, 'স্বদেশী সমাজ'-এ কর্মীদের প্রতি তাঁর সেই উপদেশে বুঝতে পারি যে প্র্যাকটিকাল ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু যে শিক্ষার প্রকৃত বাহক হতে পারে না, পঞ্চাশ বছর আগে তিনি এ-কথা সজোরে প্রচার করে গেছেন। একদিকে হিন্দুর সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ববাদকে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিমের গুণমুগ্ধ হয়েও তিনি তার রাষ্ট্রসর্বস্ব চিত্তবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেছিলেন। সেই ঝোঁকই অবশ্য পরবর্তী ফ্যাশিজমের অন্যতম উপাদান।

রবীন্দ্রনাথে প্রগতির সমর্থক অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেই প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁর রচনায় বারবার গতির বন্দনারূপে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে পরিবর্তনের প্রবহমান স্রোতে তাঁর অন্তর সর্বদাই একটা সাড়া দিত। ভবিষ্যৎ সমাজের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁর মন ছিল গতিশীল, আর পথের সীমা-নির্দেশ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। মনের অসাধারণ সৌকুমার্য আর শিক্ষায় প্রাচীন সংস্কারের বোঝা নিয়েও, রাশিয়ার প্রচণ্ড ভাঙাগড়ার আবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে মুগ্ধ হবার মতন মনের বলিষ্ঠতা ও ঔদার্য তিনি দেখিয়েছিলেন। ভয়শূন্য চিত্তের

আদর্শ সহজে ভুলবার নয়; বলা যেতে পারে যে শুধু লেখায় নয়, কাজেও তিনি সে-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। সেদিকে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর চাইতে তাঁকে অনেক অগ্রসর মনে হয়। বার্ধক্যের ছায়ায় এসে পশ্চাদ্‌গমন সাধারণ নিয়মের সামিল—রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখি তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অগ্রগতির টান শেষের দিকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল বলেই মনে হয়। যে-সত্যতাকে তিনি মন থেকে বিশ্বাস করেছিলেন, জীবনের প্রান্তে এসে 'সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল' এই স্বীকারোক্তি অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো বেশি না, কিন্তু তার মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও জনসংযোগের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, অন্তত তাই নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উদয় হয়েছিল। জগৎ-জোড়া দুঃখীর মিলন সম্বন্ধে কোরীয় যুবকের আস্থার যে-কথা তিনি একদিন শুনেছিলেন, তার ঝংকারও তিনি ভুলতে পারলেন না।

মিউনিসিপাল গেজেটে ভ্যানগার্ডের লেখা প্রবন্ধে পড়লাম এক বামপন্থী স্পানিশ যোদ্ধা প্রশ্ন করেছেন, টেগোর কি সেই জাতীয় লোক যাঁরা সাক্ষাৎভাবে নূতন সমাজ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে না পারলেও আগামীকালকে বুঝবার ও অভিনন্দন করবার মতন মনের জোর ও স্বাধীনতা রাখেন? নাৎসী অভ্যুত্থানের পর রঁলা যেমন লিখেছিলেন—'Working man, here are our hands. We are yours. Humanity is in danger'—জানি না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কোনোও কথা বলা সম্ভব ছিল কিনা। কিন্তু অশেষ সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও চির জীবন যিনি নূতন নূতন পথে এগিয়ে চলবার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথেও সহায়ক হিসাবে ভাববার যথেষ্ট হেতু আছে।

[প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮]

রবীন্দ্রনাথের গান ॥ ধ্রুব গুপ্ত

জীবনের কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন মহৎ শিল্পের দায়িত্বের অন্তর্গত, সে প্রশ্ন আবহমান কাল ধরে অমীমাংসিত এ-কথা হয়তো সত্য, কিন্তু কোনো বিশেষ শিল্পের মহত্ত্বের দাবি যে অনেকাংশেই তার অনন্যতায় নির্ভরশীল এ-কথা হয়তো মহত্ত্বের অন্যান্য লক্ষণগুলি সম্পর্কে উদাসীন থেকেও বলা যায়। তাই, কেবলমাত্র কৌলীন্য অর্জনের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রানুরাগীরা যখন রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রচলিত রাগ রাগিণীর প্রয়োগের নিদর্শন আবিষ্কারেই সন্তুষ্ট, তখন এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, আমাদের মন সাধারণত সৃষ্টিশীলতার চেয়ে ঐতিহ্যানুসারিতার প্রতিই অধিক শ্রদ্ধাশীল। শিল্পসৃষ্টিতে পূর্ব-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান অবশ্যই সমালোচকের কর্তব্যের অন্তর্গত, কিন্তু উপাদান বিশ্লেষণের সঙ্গে গুণ বিচারের পার্থক্যও সেই সঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য। আমাদের গানের জগতে যারা গুরুজন-স্থানীয়, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি তাদের অবজ্ঞা যদিও অপ্রীতিকর, কিন্তু তা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। খেয়াল প্রভাবিত সঙ্গীত সাধনায় অভ্যস্ত ওস্তাদেরা রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাশ্রয়ী গানে সুর বিস্তারের স্বল্পতায় স্বভাবতই অসন্তুষ্ট, তান কর্তবের অভাবে বাধাগ্রস্ত। 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি'তে ব্যবহৃত বাগেশ্রী রাগিণীতে আরোহণেই পঞ্চমের প্রয়োগের ব্যাকরণগত অশুদ্ধি তাদের কাছে পীড়াদায়ক। কিন্তু তাদেরই দরবারে পদোন্নতির কামনায় রবীন্দ্র সঙ্গীতকে দরবারী সঙ্গীত প্রমাণের প্রয়াস শুধু ব্যর্থ-ই নয়, অপ্রয়োজনীয়ও। আবার হিন্দুস্থানী গানের গায়কের রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি অবহেলা আমাদের ক্ষুব্ধ করে বলে আত্মপ্রসন্ন হয়ে তাদের অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা, তাদের অনুগ্রহ লাভের হীন প্রচেষ্টার মতোই অবাঞ্ছিত। যদিও শিল্প জগতে জাতিভেদ প্রথা সুকঠোর নয়, কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য নিছক অস্তিত্বের খাতিরেই রক্ষণীয়। 'রক্তকরবী' কাব্য আমাদের যতই মুগ্ধ করুক, তার সার্থকতা শেষ পর্যন্ত তার নাটকীয় বৈভবের 'পরেই নির্ভরশীল। অতএব গানের দরবারে কাব্যলক্ষ্মীর অনধিকার প্রবেশ ঘটানোর যে অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ওস্তাদেরা আনেন তাকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করার চেয়ে, বিচার করে অসঙ্গত প্রতিপন্ন করাই বোধহয় শ্রেয়, কেননা সে কাজে সাফল্যই প্রমাণ করবে যে রবীন্দ্র সঙ্গীত একটি অনন্য শিল্পসৃষ্টি—ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা শুধু নামহীন, গোত্রহীন সংখ্যাগত সংযোজন নয়।

এ-কথা বোধহয় অবিসংবাদিত সত্য যে, বিভিন্ন শিল্পের আবেদন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পথানুসারী। চিত্রকলার সৌন্দর্য অন্তরে অনুপ্রবেশ করে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, সঙ্গীতের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হতে হয়। দুই প্রকার শিল্প-আস্বাদনের এই যে দ্বিবিধ নির্ভরতা, এই যে একক্ষেত্রে শব্দের আশ্রয় গ্রহণ এবং অন্যক্ষেত্রে রূপের দ্বারস্থ হওয়া, এর ফলে দুই শিল্পের প্রকৃতিগত পার্থক্য-সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। আর কেবলমাত্র শব্দাশ্রয়ী যে শিল্প তার প্রকৃতি স্বভাবতই বিমূর্ত শিল্পের অভিমুখী। শব্দের পারম্পর্য রচনা এই শিল্পে কোনো জাগতিক অস্তিত্বের (external reality) নিয়ম অনুসরণ করে না, তাই সঙ্গীতের শিল্পত্ব কোনো বস্তুগত অর্থের (meaning) ওপর নির্ভরশীল নয়। Caudwell যখন বলেন "In music the sounds do not refer to objects" কিংবা গানের গঠনকে বলেন 'স্বয়ংসম্পূর্ণ', তখন তাতে এই

বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সঙ্গীতের শব্দতরঙ্গ শ্রোতার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার জন্ম ঐ শব্দের পারস্পরিক বিন্যাসেই, বস্তু-জগৎ-নির্ভর সাহিত্যের কাছে তার কোনো ঋণ নেই। এই 'সাহিত্য-নিরপেক্ষ' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল 'বিশুদ্ধ সঙ্গীতে'র নিদর্শন Beethoven-এর Sonata তে, হিন্দুস্থানী গীতিকলার আলাপে ও তানকর্তবে, যন্ত্রসঙ্গীতে এবং তারানায় (অবশ্য যন্ত্রসঙ্গীতের নির্লজ্জ অনুকরণের অপরাধে তারানা অনেকের কাছে অনাদৃত)। Sonata-র সমুদ্র গর্জন গ্যেটের কাব্যকলার সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না, অথচ তা প্রকৃতির নকলনবিশীও করে না; আর ভৈরবীর কোমল পর্দায় সূর্যোদয়ের যে আভাস তার অনুভব শ্রোতার সুরের রসগ্রহণের ক্ষমতাসাপেক্ষ, এবং সে ক্ষমতার আয়ত্তীকরণ কালিদাসের কাব্য-পাঠ-নির্ভর নয়। যদিও এক একটি স্বরের 'অন্তর্নিষ্ঠ ক্ষমতা' নেই কোনো বিশেষ ভাবের ব্যঞ্জনা করবার, কিন্তু কয়েকটি নির্বাচিত স্বরের সুসমন্বয়ে বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এবং সেই নির্বাচন-পদ্ধতি আত্মনির্ভর। কোমল রেখাবের কিংবা কড়ি মধ্যমের নিজস্ব কোনো ইঙ্গিত নেই, কিন্তু শুদ্ধ গান্ধার পঞ্চম ও শুদ্ধ মধ্যম সহযোগে যে পকড় সৃষ্টি হয় তার মধ্যে পূরবী রাগিণীর অন্তর্নিহিত চরিত্র ঘনসংবদ্ধ হয়ে থাকে। আর প্রতীচ্যে, প্লেটোর কথোপকথনে Ionian এবং Lydian স্বরসঙ্গতিকে 'effeminate', 'lax' বলে চিহ্নিত করা এবং Dorian ও Phrygian স্বরসঙ্গতিকে 'বীরত্বব্যঞ্জক' বা 'Sober' আখ্যাদান, এদিকে প্রাচ্যে রাগ-রাগিণীর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, কাল-বিভাগ, চরিত্র-বিভাগ, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে এমন ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে শব্দের অন্তর্নিহিত চরিত্র সম্পর্কে শিল্পী এবং শ্রোতারা বহুকাল থেকেই সুপরিকল্পিত ধারণা পোষণ করতেন। অবশ্য শব্দের এই স্বকীয় অর্থময়তার কিংবা রাগ-রাগিণীর অন্তর্নিহিত চরিত্র অনুযায়ী কাল-বিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-সন্ধান হয়তো নিষ্ফল, "অর্থাৎ ভৈরোঁর কোমল রে ও কোমল ধা শুনলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে" এমন অমোঘ নিয়মের অস্তিত্ব হয়তো কষ্টকল্পনার রাজ্যেই সম্ভব, কিন্তু যে দীর্ঘকালীন সংস্কারের বশে বিভিন্ন শব্দগোষ্ঠীর চয়নে রচিত রাগিণীর 'পরে বিশেষ বিশেষ মূল্য আরোপিত হয়েছে, তার উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লাভে আপাতত বঞ্চিত হলেও, সে সংস্কারের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, এবং এ-কথা স্মর্তব্য যে সেই শব্দচয়ন এক সুশৃঙ্খল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত—স্তবক রচনার উদ্দেশ্যে পুষ্পচয়নের সঙ্গে তার তুলনা নিতান্তই অসঙ্গত।

পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গীত-সম্রাট Beethoven চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং কাব্যের তুলনামূলক বিচারে মন্তব্য করেন, "It is the province of painting to describe. Poetry, too, can esteem itself happy in that respect, in comparison with music. On the other hand, mine spreads further into other regions, and it is not so easy to attain my empire." আধুনিক চিত্রকলা ও কাব্যের কৃতি শুধু বস্তুবর্ণনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়,—অথবা সঙ্গীতকারের সাম্রাজ্য কবি বা চিত্রকরের জগৎ অপেক্ষা দুরধিগম্য কিনা, এ-সব প্রশ্ন তুলে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু স্বাধীন শিল্প হিসাবে সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এই যে সাহিত্য-নিরপেক্ষ আত্মমহিমান্বিত বিমূর্ত শিল্প, যার চির-উজ্জ্বল নিদর্শন হিন্দুস্থানী গানের আলাপে, যন্ত্র সঙ্গীতে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব দ্বিধাগ্রস্ত এবং সে দ্বিধার উৎপত্তির কারণ প্রধানত তাঁর শিল্পমানসেই নিহিত, অবশ্য ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক আবহাওয়া এবং বাংলা দেশের শিল্প ঐতিহ্যের দানও সে খাতে নগণ্য নয়। একদিকে দেখি রাগ-রাগিণীর নিজস্ব শিল্পরূপ সম্পর্কে তাঁর প্রখর অনুভূতি এবং অতুলনীয় ভাষায় সেই অনুভূতির প্রকাশ

("ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা" "মুলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস"), অন্যদিকে খেয়ালীয়ার কণ্ঠে "ছায়ানটের অক্লান্ত প্রগল্‌ভতার মুখে 'থামো' বলবার" আন্তরিক ইচ্ছা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপ-তানবহুল 'খেয়ালের' প্রতি তাঁর বিরূপতা অপ্রচ্ছন্ন, যেমন অগোপন তাঁর পক্ষপাতিত্ব ধ্রুপদের প্রতি, যে গান সুর-বিস্তারের সংযমের জন্য বিখ্যাত এবং যে গান সম্পূর্ণ সাহিত্য-অনির্ভর নয়। এই ধ্রুপদ প্রীতির পটভূমিকায় আছে রাধিকাগোস্বামীর সাহচর্য, যদুভট্টের শিক্ষাদান; ঠাকুরবাড়িতে ব্রাহ্মধর্মের প্রচলনে ব্রহ্মসঙ্গীতের (যা প্রধানত ধ্রুপদাঙ্গ ছিল) বিকাশও রবীন্দ্রনাথের রুচিকে ধ্রুপদের অভিমুখী করেছিল। তা ছাড়া বহুকাল ধরেই বাংলা দেশের (বিশেষ করে তার সংস্কৃতি-কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে) গানের মহলে বাহাদুর খাঁ, নওলকিশোর, আনন্দকিশোর (স্বয়ং ধ্রুপদ-রচয়িতা), মৌলাবক্স প্রভৃতি ধ্রুপদীয়ারাই প্রভাবশালী ছিলেন এবং "বাংলা দেশে ধ্রুপদের ও টপ্পার যতটা প্রচলন হয়েছিল, খেয়াল-ঠুংরীর ততটা হয়নি।" বলা বাহুল্য এই যে একদেশদর্শিতা, এই যে খেয়ালের প্রতি অপ্রসন্নতা এবং ধ্রুপদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব একে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের খাতিরে হয়তো গ্রাহ্য করা চলে, কেননা প্রত্যেকের কাছ থেকে সকল শিল্পাঙ্গের প্রতি বাধ্যতামূলক সমাগ্রহশীলতা প্রত্যাশা নিষ্ফল এবং অনুচিত, কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা না গেলেও যতদূর সম্ভব তাকে যুক্তিনিষ্ঠা দ্বারা নিয়ন্ত্রণই কাম্য। তাই "সুসম্পূর্ণ কলারূপ" সৃষ্টিকে সর্বত্রই আকৃতিগত সংক্ষিপ্ততার 'পরে নির্ভরশীল মনে করা সম্ভব নয়। খেয়ালের বিস্তারের বহুলতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা ততখানিই অযৌক্তিক, যতটা অসমর্থনযোগ্য বৃহৎ-উপন্যাসের প্রতি তাঁর কটুকাটব্য। টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল হয়েও "War and Peace" সম্পর্কে আশ্চর্যজনক নীরবতা, জর্জ এলিয়টের উপন্যাসকে সাহিত্য-কাঁঠালের সঙ্গে তুলনার বিদ্রূপ সেই মনোভাব থেকেই উদ্ভূত, যা খেয়ালের বিপুলতায় শ্রদ্ধাশীল নয়, এবং খেয়ালের বিশালাকৃতি ও অলংকার-বাহুল্য যখন তাঁর অন্তরে 'কাদম্বরীর' বাগাড়ম্বর কিংবা Dinoceras এর বপুর স্মৃতি জাগায় তখন এমন ধারণা ভিত্তিহীন নয় যে শিল্পের বিরাট আয়তন আর স্থূলতা রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় ছিল সমার্থক। এদিকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে অপরিহার্য এ-কথাও তাঁর ধারণায় স্বীকৃতি পায় যখন তিনি বলেন "রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ।" অথচ এই উক্তির প্রায় বিপরীত সুর বেজে ওঠে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে: "রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলে তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উল্টে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খৎ দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য।" উল্লিখিত দৃষ্টান্তে এমন ধারণা হয়তো অযৌক্তিক নয় যে, রাগিণীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েও, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগিণীর সুদীর্ঘ আত্মনির্ভর বিস্তারের প্রতি তিনি ছিলেন অপ্রসন্নচিত্ত।

কিন্তু হিন্দুস্থানী গানের প্রতি তাঁর এই বিরূপতার ফলশ্রুতি তাঁর পক্ষে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কেননা তাঁর সৃষ্টির উৎসমুখে ঐ বিরূপতা সক্রিয়। যদিও তাঁর প্রথম যুগের গানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রায় অবিচলিত অনুসৃতি লক্ষণীয় এবং প্রথানুগ গীতরসিকেরা একমাত্র ঐ যুগের রচনাকেই কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে সম্মত, কিন্তু অনুসরণের স্তর থেকে সৃষ্টির পর্যায়ে উত্তরণে আলাপতানাশ্রয়ী খেয়াল গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসন্তুষ্টির দান অপরিমেয়। অন্যথায় আমাদের "আঁধার সকলি দেখি"তে বিশুদ্ধ কানাড়ার প্রয়োগেই চরিতার্থ হতে হত, "বড়ো বিস্ময় লাগে"র কোমল ও শুদ্ধধৈবত-নিষাদের বিচিত্র ব্যবহারে

মল্লার সুরাই কানাড়ার মিশ্রণে উদ্ভূত সম্পূর্ণ অভিনব সুরের সাক্ষাৎ পেতাম না।

আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন শিল্পের স্বীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা অবশ্যকর্তব্য এ-কথা যেমন সত্য, প্রচলিত নিয়ম অতিক্রম করে বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক সংমিশ্রণে তৃতীয় শিল্পের জন্ম যে অসম্ভব নয়, তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। নৃত্য, সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলা প্রভৃতির সাযুজ্যে যে শিল্পের সৃষ্টি, সেই নাটক আলংকারিকের অভিধানে 'তিলোত্তমা শিল্প' নামে আখ্যাত, এবং ইদানীং কালের চলচ্চিত্র-শিল্পও composite art হিসাবে সেই আখ্যার অধিকারী। অতএব শব্দাশ্রয়ী গীতশিল্পের সঙ্গে অর্থাশ্রয়ী কাব্যের বোঝাপড়ায় যদি নতুন কোনো শিল্পের জন্ম হয়, তবে তার অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করা তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা শিল্পক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার প্রতি স্বভাবতই সন্দিগ্ধ। যদিও কাব্যকলার প্রধান অবলম্বন অর্থবহ ভাষা, কিন্তু যে কোনো উৎকৃষ্ট কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাষার অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। বিভিন্ন স্বরের পারম্পর্যে সৃষ্ট সুরের যে বস্তু-অতিক্রান্ত ইঙ্গিত তার সঙ্গে কাব্যের ধ্বনিময় ব্যঞ্জনার আত্মীয়তা আছে এমন ধারণা অসঙ্গত নয়। আর সেই কারণেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্যকারদের পক্ষে কাব্যকে সঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত করা অসম্ভব হয়নি, এবং শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতাদের পক্ষে সঙ্গীতে কাব্যের ধর্ম আরোপ সার্থক হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মালার্মে-র 'ধ্বনিসর্বস্ব অর্থ-বিহীন' কাব্যে গানের অতীন্দ্রিয়তা দুরনুভবনীয় নয়—এমন কি জয়েস বা কাফকা-র উপন্যাসে চিন্তাপ্রবাহ-বর্ণনায় সাঙ্গীতিক গুণের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন পাশ্চাত্যের বিদগ্ধকুল। ইংরেজ কবি পোপ বলেছেন "Music resembles poetry, in each are nameless graces which no methods can teach, and which a master-hand alone can reach." গান ও কাব্যের "অনামী মাধুর্য" সৃষ্টি নিয়মিত শিক্ষাসাপেক্ষ কি না সে তর্কের ক্ষেত্র ভিন্নতর, কিন্তু এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, গুণী শিল্পীর হাতে কথা ও সুরের প্রায় রাসায়নিক সংমিশ্রণে তৃতীয় কোনো অভিনব শিল্পের জন্ম অসম্ভব নয়। মৌলিক উপাদানের পারস্পরিক আত্মোৎসর্গে সৃষ্ট এই বর্ণসংকর নবজাতকই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে "সঙ্গীত" নামের অধিকারী, কিন্তু স্পষ্টতার খাতিরে 'বিশুদ্ধ সঙ্গীতে'র প্রতিতুলনায় 'কাব্যসঙ্গীত' অভিধা অবিধেয় নয়।*

হিন্দুস্থানী গানের বিশুদ্ধ সুরসাধনার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই বাংলা দেশে কাব্যসঙ্গীতের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। চর্যাপদে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দে, বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়, রামপ্রসাদী ভক্তিগীতিতে, রামনিধি গুপ্তের টপ্পায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে সেই ঐতিহ্যের স্বাক্ষর এবং যদিও কাব্যসঙ্গীতের শরীর প্রায় সর্বত্রই হিন্দুস্থানী সুরের ঋণগ্রহণে পরিপুষ্ট, কিন্তু তা মনে-প্রাণে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ। উপাদান সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাছে ঋণী, কিন্তু তাঁর রচনার সামগ্রিক বিচারে কাব্যসঙ্গীতের ঐতিহ্যেরই সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। বিশেষ করে বাংলা দেশে এই কাব্যসঙ্গীতের পরিপুষ্টির জন্য বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক মানসই দায়ী। বাংলা দেশের সেই "প্রধানত সাহিত্যিক চিত্তবৃত্তির" অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সুদৃঢ় এবং সেই চিত্তবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাঁর আগ্রহ অদম্য। ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত এক অসামান্য সুন্দর পত্রে যেখানে তিনি সাহিত্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সঙ্গীতের উৎকর্ষ এবং সাহিত্য-নির্ভর কাব্যসঙ্গীতের

* রবীন্দ্র সঙ্গীতের তত্ত্বাবধায়কগণ 'কাব্যসঙ্গীত' বলতে রবীন্দ্রনাথের সেই গানগুলিকেই নির্দিষ্ট করেন, যেগুলি পূর্বে কবিতা হিসাবে পরিচিত পরে সুরারোপিত, অর্থাৎ 'কৃষ্ণকলি', 'তুমি কি কেবলি ছবি' ইত্যাদি। এ-জাতীয় শ্রেণীবিভাগের হাস্যকর অযৌক্তিকতা বোধ হয় তর্কাতীত।

বিকাশের বর্ণনায় রত, সেখানে তাঁর সেই আগ্রহের পরিচয় লিপিবদ্ধ। হিন্দী গানের কালোকম্বলাকাঙ্ক্ষী যোগীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনার ভার পরজ রাগিণীর 'পরে ন্যস্ত করা এবং অন্যদিকে নিধুবাবুর টপ্পায় প্রেমিকার মুখের সঙ্গে শশী এবং প্রেমিকের হৃদয়াবেগের সঙ্গে সমুদ্রের উপমা প্রয়োগ ভৈরবী রাগিণীকে সহজেই নিষ্কৃতিদানের উল্লেখ করে বাংলা ও হিন্দী গানের প্রকৃতিগত পার্থক্য-নির্দেশপূর্বক তিনি উপদেশ দেন, "বাঙালীর ঐ স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে।' বাঙালীর ঐ স্বভাবই রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত, অবশ্য তাঁর সঙ্গীত রচনায় সে স্বভাব প্রতিভার স্পর্শে শতগুণে মার্জিত এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুকরণ থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তিলাভ কেবলমাত্র কথা ও সুরের বিবাহবন্ধনের মধ্যে পর্যবসিত মনে করলে তাঁর সৃষ্টিশীলতার যথার্থ বিচার হয় না। তা ছাড়া যারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিল্প-মূল্যে অবিশ্বাসী, তাদের অভিযোগ কেবলমাত্র সুরের অনির্বচনীয়তায় অনধিকারী বাঙ্ময়তার মিশ্রণের অবৈধতা-নির্দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সনাতন সুরের কাঠামোকে অগ্রাহ্য করা, অলংকরণের অকিঞ্চিৎকরতা ইত্যাদিও তাদের বিচারে অশ্রদ্ধেয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষসমর্থন তাই কথা ও সুরের হরগৌরী-মিলন দর্শনে আনন্দবিহ্বলতার মধ্যেই সার্থক নয়।

কেবলমাত্র শব্দের তরঙ্গকে অবলম্বন করে অশরীরী শিল্পসৃষ্টির যে চরম উৎকর্ষ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুবিশাল ইতিহাসে নিহিত, তাকে কণ্ঠে রূপদান করে চিরকালের গায়কেরা হয়তো নিজেদের ধন্য মনে করবেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সঙ্গীতের গায়নপদ্ধতিতে জীবনের প্রথম পর্বেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন (গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে বেহাগ-আলাপরত বালক রবীন্দ্রনাথের মূর্তির সঙ্গে সকলেই পরিচিত) এবং গায়ক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ফৈয়াজ-করিমের সাফল্যের প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও, দেশে বিদেশে সুধীসমাজে তা সস্নেহ এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিল সে তথ্যের জন্য "জীবনস্মৃতি" পাঠই যথেষ্ট। কিন্তু যার সৃষ্টি "বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে" তার সাঙ্গীতিক কৃতি চিরকাল "বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সঙ্গীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিধ্বনিত" করার মধ্যেই পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পক্ষ থেকে যদি দাবি করা হয় যে কালনিরপেক্ষ বিমূর্ত শিল্পে চিরকালের চিত্তশঙ্খ ধ্বনিত হতে পারে, তবে তার উত্তরে বক্তব্য—সে চিত্ত গায়কের, গীতস্রষ্টার নয়। সফোক্লিস বা শেক্স্পীয়ার এর নাটক-অভিনয়ে চিরকালের স্টানিস্লাভস্কি বা সারা বার্নহার্ড-রা নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে পারেন, কিন্তু একজন Ibsen বা একজন Brecht-এর কাছ থেকে তাদেরই অনুবাদে পরিতৃপ্তি দাবি করা প্রতিভার অসম্মান। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতা তাই শোরী মিঞার টপ্পার বঙ্গানুবাদেই সন্তুষ্ট থাকেনি (অবশ্য 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' কিংবা 'বন্ধু রহো রহো সাথে'তে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা অনুপস্থিত নয়)।

মহাকাব্য সংরচনে অভীপ্সিত কল্পনা যে কারণে হাজার গীতে চূর্ণ হয়েছিল, সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের সুরের বিশ্বজগৎ অগণ্য তারার মতো স্বল্পাকৃতি গানের সীমার মধ্যে নিজেকে বিভিন্ন করল। তবে কাব্যের মাধ্যাকর্ষণে। ফলেই গগনচারী সুরকে সংযত সীমার মধ্যে স্ফটিকীকৃত হতে হয়েছে সে-কথা সত্য হলেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষুদ্রায়তনের কারণ নির্দেশনায় সে উক্তিই যথেষ্ট নয়। তাঁর সামগ্রিক শিল্পরুচির সবচেয়ে বড়ো নিয়ামক তাঁর সংযম-বোধ—তা সে আকারেই হোক বা প্রকারেই হোক। এই সুমিতি সাধনার ফলেই একদিকে যেমন সুবিস্তৃত খেয়াল শ্রবণে অথবা সুবৃহৎ উপন্যাস পাঠে তাঁর অন্যায় অনীহা, তেমনি

অপরপক্ষে ধ্রুপদের চারতুকের মধ্যেই আপন সৃষ্টিকে সুসীম করবার প্রবৃত্তি। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের গায়কেরা তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত গানকে অবহেলা করেন সেই সংস্কারগত বোধের তাগিদে, যার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সারগ্রাহী হয়েও, তার colossal interpretation-এর প্রতি প্রকৃতপক্ষে বীতশ্রদ্ধ। ধ্রুপদের চারতুক-অতিক্রান্ত, অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন গানের সংখ্যা রবীন্দ্র রচনায় একেবারে নগণ্য নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক গানেই বিভিন্ন স্তবকে সুর পুনরাবৃত্ত। ('বিশ্ববীণা রবে', 'হে মোর চিত্ত', জানি গো দিন যাবে')। এমন কি ধ্রুপদের চাতুরক বিশিষ্ট গানগুলিতেও বহুস্থলেই আভোগের সুর অন্তরার অনুসারী। এর ফলে এমন ধারণা আদৌ অসঙ্গত নয় যে গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সুরের রচনায় সাতিশয় মিতব্যয়ী, এবং সেই মিতব্যয়িতা কেবল কাব্যের দাবিতেই নয়, সুরকারের আন্তরিক শিল্পবোধই তার নিয়ন্তা। উনিশ-শতকীয় যন্ত্রবিপ্লব ও নগরকেন্দ্রিক জীবনের তজ্জনিত সময়াভাব এ জাতীয় আয়তন সংকোচনের পশ্চাতে কতটা সক্রিয় সে প্রশ্নের সরলরৈখিক সমাধান অভিপ্রেতও নয়, সম্ভবও নয় (যাত্রাগানের অবলুপ্তি এবং ছোটগল্পের উদ্ভবের এতাদৃশ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য)। অবশ্য সৃজনকার্যে না হলেও উপভোগের ক্ষেত্রে যে বৃহদায়তন শিল্পের আদর যন্ত্রসভ্যতার সম্প্রসারণ সত্ত্বেও হ্রাস পায়নি, তার প্রমাণ ষষ্ঠ দশকেও কলকাতায় হিন্দুস্থানী দীর্ঘায়তন সঙ্গীতের আসরের সাফল্য, তার মূলে জনগণেশের হুজুগপ্রিয়তা অনেকাংশেই দায়ী হলেও, এ কথা বলা চলে। তাই মনে হয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের আকৃতিগত সংক্ষিপ্ততার দায়িত্ব যুগপ্রভাবের স্কন্ধে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবার ভিত্তি নেই, কেননা চণ্ডীদাসের আমলে রেলগাড়ির প্রচলন হয়নি। সঙ্গীত সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মিতব্যয়িতা মূলত রবীন্দ্রমানসেই নিহিত, এবং যেহেতু শিল্পীমানসের সঙ্গে (বিশেষ করে গীতিকার, চিত্রশিল্পী এবং কবির মানসের) সমসাময়িক সামাজিক পটভূমিকার সম্পর্ক জটিল, সেহেতু অতি প্রচলিত মুকুরে প্রতিফলনের উপমা সযত্নে পরিত্যাজ্য।

অবশ্য মিতব্যয়িতার ফলশ্রুতি যে সর্বত্রই সন্তোষজনক এমন দাবি অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা রচনায় দেখা যায় কথা ও সুরের ঘরকন্নায় কথার প্রবল পরাক্রমের কাছে সুর দুর্বল, এবং উৎকৃষ্ট কবিতা হলেও নিঃসন্দেহে সে সব রচনা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, কেননা সঙ্গীতে সুরের নিকট কথার অধীনতা সহনীয় হলেও (অতুলপ্রসাদ স্মর্তব্য) কথার দুঃশাসনে সুরের লাঞ্ছনা অসমর্থনীয়। তাই 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' সুরের তুলি দিয়ে আমাদের চিত্তপটে কোনো রঙিন ছবি আঁকতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সুর-সৃষ্টিতে তাঁর 'ধ্রুপদী অবদমন' তাঁর নিজস্বতাকে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রবল প্রভাবের বন্যায় ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। আয়তন সংকোচনের কৈফিয়তে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন, "গানসৃষ্টিতে আজ যেগুলিকে ছোটো দেখাচ্ছে, অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে, তারা পূর্বদিগন্তে খণ্ড ছিন্ন মেঘের দল, আষাঢ়ের আসন্ন রাজ্যাভিষেকে তারা নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করতে এসেছে, দিগন্তের পরপারে রথচক্র নির্ঘোষ শোনা যায়।" তার প্রত্যাশিত রথচক্রনির্ঘোষ কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে মরণাপন্নের নাকি কান্নায় পরিণত হল, সে আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু স্রষ্টার স্বাভাবিক বিনম্র বচনকে উপেক্ষা করে এ-কথা বলা চলে যে, এক একটি ক্ষুদ্র রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে খণ্ড মেঘের তুলনা অনেক দিক থেকেই অর্থপূর্ণ হলেও, সামগ্রিক বিচারে তাঁর সৃষ্টি আপনি মহৎ, কোনো মহত্তর সৃষ্টির বার্তাবহের কাজের মধ্যেই তার সার্থকতা সীমাবদ্ধ নয়।

এক শ্রেণীর রসিক মহলে এই অভিমত প্রচলিত যে, রবীন্দ্র সঙ্গীত হল আয়াসসাধ্য এবং সাধারণের

অনায়ত্ত 'উচ্চাঙ্গ' সঙ্গীতের সুলভ তরলীকৃত সহজপাচ্য সংস্করণ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 'অচলায়তনে'র বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্রোহ'কে তার গীতরচনার আপাতসারল্য আর সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করবার ফলেই এমন ধারণার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের অনন্যতার প্রতিষ্ঠাকল্পে দ্বিতীয় সোপান তাই তাঁর সুরসৃষ্টির মৌলিকতা বিচার। এ-কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে "পূর্বকালীন সৃষ্টিকে ভোগ করবার উদ্দেশ্যে অনুবৃত্তির প্রয়োজন থাকতে পারে", কিন্তু সে অনুবৃত্তিতেই স্রষ্টার মনকে আবদ্ধ রাখবার প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তাই আত্মার তাগিদেই যদুভট্টের শিষ্যত্ব-অতিক্রান্ত। যে আন্তরিক প্রেরণা বৌ-ঠাকুরানীর হাটের বঙ্কিমী অনুকরণকে পরিণত করেছিল চতুরঙ্গের অনন্যতায়, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র বিহারীলালীয় শিক্ষানবিশীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সংসার প্রান্তের জানালায় আসীন ঐশ্বরিক মহিমায়, যে সুতীব্র আত্মবোধ নিজস্ব চেতনার রঙে পান্নাচুনিকে সবুজে-লোহিতে রঞ্জিত করবার দাবি করেছিল, যে প্রবল আত্মবিশ্বাস চিত্রকলায় ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার সাহস সঞ্চার করেছিল, তারই এক ভিন্নমুখী প্রকাশ কীর্তন, হাম্বীর, মল্লার, বাউল, কথকতার মিশ্রণে লব্ধ 'কৃষ্ণকলি'র সুরে।

অবশ্য বিভিন্ন রাগের মিশ্রণের নিদর্শন ভারতীয় সঙ্গীতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিরল নয়—'গুর্জরী-তোড়ী', 'সিন্ধু-ভৈরবী' ইত্যাদি নামকরণেই তার প্রমাণ এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে এককালে সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ ছিল—উল্লিখিত নামকরণ তারই পরিচয় বহন করছে। কিন্তু বিংশশতকীয় শ্রেষ্ঠ খেয়ালীয়াদের কণ্ঠে মালকোষে পঞ্চম ব্যবহারের আর্ষপ্রয়োগ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের এ অভিযোগ অনস্বীকার্য যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল নয় এবং সেক্ষেত্রে অধুনাতন গায়কেরা যে শিল্পচর্চায় রত তার প্রকৃতি নিছক interpretive (এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির জন্যই বোধহয় রবিশঙ্করের মনোযোগ দক্ষিণমুখী এবং বিলায়েৎ খাঁ বাউলের মধ্যে নতুনত্বের অন্বেষায় রত), কেননা মালকোষে পঞ্চম ব্যবহার মালকোষেরই শ্রীবৃদ্ধির খাতিরে, নতুন কোনো সুর রচনার উদ্দেশ্যে নয়, এবং রাগের বাদী স্বরগুলির ঔজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বিবাদী স্বরের চতুর ব্যবহার সনাতন শাস্ত্র অনুমোদিত। কিন্তু 'আমার একটি কথা' গানের অন্তরায় 'ভরে রইল বুকের তলা'র শেষ অক্ষরে অকস্মাৎ 'পধন' স্বরবিন্যাসে কেবল ভৈরবী-বহির্ভূত শুদ্ধ ধৈবতের জন্যই স্মরণীয় নয়, এর ফলে যে mood তৈরি হয় তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের chromatic effect-এর সাধর্ম্য অনুমান নেহাত অসঙ্গত নয়। 'তুজনে দেখা হল'-তে বেহাগ ও খাম্বাজের আশ্চর্য সুন্দর সংমিশ্রণ 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'তে, ললিত, যোগিয়া রামকেলীর ত্রয়ী আত্মনিবেদনে সম্পূর্ণ অভিনব সুরের সৃষ্টি, 'অনন্ত সাগর মাঝে'তে বাগেশ্রীর নবজন্ম, কিংবা 'বাজে করুণ সুরে'তে উত্তর ভারতের 'বসন্ত'ও 'পরজে'র সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় সুরের মৈত্রীর মধ্যে আবার সঞ্চারীতে কোমল ধাষভ ও কোমল গান্ধারের এবং কড়ি ও শুদ্ধ মধ্যমের আশ্চর্য ব্যবহারে মুলতানের ছায়াপাতে এক বিচিত্র সুন্দর সুরের জন্ম—এ জাতীয় দৃষ্টান্ত উল্লেখে বিফলতা সুদূরপরাহত। সুরসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর হল যখন কীর্তন ও লোকসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সুরের অনায়াসকৃত মিশ্রণে এক অপূর্ব সুরের সৃষ্টি হল যা একান্তই রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু এ-কথা বিস্মৃত হওয়া অবিবেচনারই ফল যে হিন্দুস্থানী সুরের ব্যবহার সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনা যেমন তা থেকে পৃথক, দেশী সুরের প্রয়োগ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বাউল বা ভাটিয়ালী জাতীয় গান 'লোকসঙ্গীত' শ্রেণী-বহির্ভূত। স্বভাবজ sophistication-এর ফলে রবীন্দ্রনাথের গানে লোকসঙ্গীতের গ্রাম্যতা দূর হয়েছে, কীর্তন তার ভাবালুতার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে, তাই 'আমার না বলা বাণীর'

কিংবা 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না' গাইবার বেলা কণ্ঠস্বরকে মাত্রাতিরিক্তভাবে sentiment-এর রসে ভিজিয়ে গদগদ করে তোলা, আর 'মারের সাগর পাড়ি দেব গো' কিংবা 'দুঃখ যদি না পাবে তো' গাইতে গিয়ে গ্রাম্যসঙ্গীতের হহঙ্কারী গমক (মাহ্রের সাহ্গর ইত্যাদি) সমান অশ্রাব্য। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের কাছে রসদ সংগ্রহের ব্যাপারে যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিংবা তৎপুত্র দিলীপ রায়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং যদিও পরিণত বয়সের রচনায় প্রতীচী সুরের প্রয়োগ প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু বাল্মিকী প্রতিভায় Nancy Lee-র melody ব্যবহার 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'-তে Italian Melody-র সঙ্গে ঝিঁঝিঁট বা খাম্বাজের মেজাজ মিশ্রণ, 'তোমার হল শুরু' কিংবা 'আগুনের পরশমণিতে' চার্চীয় সঙ্গীতের গাম্ভীর্যারোপ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, এবং পিয়ানোবাদক জ্যোতিদাদার প্রভাব স্বীকার করেও, এ-কথা মানতে হবে যে অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করে তাকে স্বকীয় রূপদানের ক্ষমতা উল্লিখিত গান কয়টিতেও পরিস্ফুট।

সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্গীত-শিক্ষালাভে রবীন্দ্রনাথ যে বঞ্চিত হননি, তার প্রমাণ তাঁর বাল্যজীবনের ইতিহাসে লভ্য, কিন্তু এ-কথা সত্য যে তাঁর সঙ্গীতরচনা তাঁর কাব্যরচনার মতো সাবধানী শিল্পীর সুগভীর মনঃসংযোগসঞ্জাত নয়, বরং তা তাঁর চিত্রাঙ্কনের মতো আত্মসাধিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। নিজের সাঙ্গীতিক কীর্তির সঙ্গে "বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় ফুটে ওঠা মেঠো ফুলের" সাধর্ম্য নির্দেশ করে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 'বড় বড় বাগানওয়ালা'দের কীর্তির সঙ্গে তুলনা করতে নিষেধ করা হয়তো শিল্পীর বিনয়ের পরিচায়ক, কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বতঃস্ফূর্তির খাতিরেই বোধহয় উল্লিখিত উপমা নিতান্ত অপ্রযোজ্য নয়। এক একটি কবিতার রচনায় শব্দচয়নে কবির সতর্কতার কথা সুবিদিত। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য সংশোধন তারই সুশোভন চিহ্ন হয়ে রয়েছে; কিন্তু সুরসৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নিতান্তই খেয়ালী, এমন কি তাদের রক্ষাকল্পেও ছিলেন অত্যন্ত অসতর্ক, এবং 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য ব্যতীত তাঁর রচনার ভবিষ্যৎ সংকটাপন্নই হত, আর বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যে কোনো বিশেষ গানের সুরকে কেন্দ্র করে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার-বিতর্ক উষ্ণতর রূপ ধারণ করতো। সঙ্গীত রচনায় তাঁর এই তথাকথিত 'অশিক্ষিত পটুত্ব' তাঁকে ওস্তাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র করে তুলেছে ঠিক যেমন করে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের দেশলাই-এর বাক্সের নির্ভুল চিত্রণে অপারদর্শিতা আমাদের academic চিত্রশিল্পীদের কাছে তাঁকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছিল। কিন্তু ধরণীর অশ্রুভরা বেদনা যখন নীড়ের পাখায় ভর করে মেঘলোকে উধাও হতে প্রয়াসী, তখন কাফী রাগের অশুদ্ধির পক্ষে বৈয়াকরণিকের তর্জনী কিংবা বিশেষজ্ঞের অবজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়নি।

অবশ্য যদিও রবীন্দ্রনাথের তুলিতে রং ও রেখা অবলীলাক্রমে সৃজনীশীল হয়েছে এবং কণ্ঠেও কথা ও সুর তেমনি অনায়াসে উন্মুখর হয়েছে, তবুও রবীন্দ্র চিত্রকলার সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের তুলনা অধিকতর অগ্রসর করা অনুচিত, কেননা প্রচলিত অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রবীন্দ্র সঙ্গীত কখনই রবীন্দ্র চিত্রকলার সমান কৃতিত্বের অধিকারী নয়। চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পূর্ণ স্বরাট, কিন্তু সুর রচনায় রবীন্দ্রনাথের অনন্যতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সমগ্রভাবে তাঁর 'বিদ্রোহ' 'opposition within the constitution'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে Wagner আর Schoenberg-এর বিদ্রোহ যে প্রাথমিক প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মূল কথা "demise of classical conception of order", অথচ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভারতীয় ধ্রুবপদী সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা প্রায় আত্মহত্যার সামিল হত। পূর্ব-ঐতিহ্যকে স্পর্ধাভরে উপহাস করে Schoenberg-এর নব্যতন্ত্র ঘোষণা করেছিল "To talk of any note as being 'foreign' to the

harmony is nonsensical." রবীন্দ্রনাথ ভৈরবীতে শুদ্ধপর্দা প্রয়োগ করলেও, এবং তার ফলে তাঁর গানের স্বরলিপির শীর্ষদেশে রাগের নামকরণ অবলম্বনে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হলেও, তাঁর পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি যে কোনো স্বরকে যদৃচ্ছ যে কোনো সুরে চালান করা। অবশ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের কৃতিত্বকে নির্মমভাবে উৎখাত করা সম্ভবপর নয়, বুঝি বা অভিপ্রেতও নয়। চিরায়ত সঙ্গীতশিল্পের শব্দ পরম্পরার প্রকাশগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সংস্কার এত দৃঢ়মূল যে তার পরিবর্তনের পক্ষে বুঝি বা কোনো পারমাণবিক বিপ্লবও যথেষ্ট নয়। আর যদিও Schoenberg-এর ভূকম্পমান সঙ্গীত (siesmographic music) বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল "the rejection of all convention and denial of art-music would return to the condition of noise"—এমনি এক অবস্থায়, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক Dubassy সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন 'compromise with totality and convention'-এর মধ্য দিয়ে, এবং উনিশ শতকের শেষার্ধের chromatic স্বৈরাচারের অন্তে বিশ শতকে Stravinsky-কে ফিরতে হল সঙ্গীত সম্পর্কীয় এই চিরসত্য-প্রত্যয়ে "The composer's task is to *integrate certain specified noise*." আমাদের তথাকথিত 'আধুনিক' সঙ্গীতকারদের প্রাগৈতিহাসিক কোলাহলের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের মার্কিনী আদর্শানুপ্রাণিত বাসনার অন্তে কোনো Stravinsky-র দেখা মিলবে কিনা জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মান্ধাতা-আমলীয় হবার অপরাধে melody-কে বর্জন করবার প্রবৃত্তি দান করেনি, সেজন্য আমরা তাঁর শিল্পবোধের প্রতি সশ্রদ্ধচিত্ত এবং ঐতিহ্যের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে স্বল্পপরিসর হলেও তালের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যাতিক্রমণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যে লগ্নে কবি অন্ত্যজ ছড়ার ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষায় রত, তানপ্রধানের চরণকে চোদ্দমাত্রার নিগড় থেকে মুক্ত করার আনন্দে অভিভূত, সেইক্ষণেই গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঝাঁপতালের দুই-তিন মাত্রাবিন্যাসের স্থান পরিবর্তনে ঝম্পকের (এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে) রচনা করেছেন, সাত মাত্রার তেওড়াতে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে রূপকড়া'[১] (তিন। দুই। তিন—কেন সারাদিন ধীরে ধীরে) সৃষ্টি করেছেন, দাদরার চেহারা পাল্টে 'ষষ্ঠী' (দুই। চার—নিদ্রাহারা রাতের এ গান), নয় ও একাদশ মাত্রার তাল নিয়ে পরীক্ষা করেছেন নবতালে (নিবিড় ঘন আঁধারে) এবং একাদশীতে (কাঁপিছে দেহলতা থরথর) রচিত অল্পসংখ্যক গানে। আর প্রচলিত পদ্যবন্ধকে অগ্রাহ্য করে গদ্য ছন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আকার-মাত্রিক তালকে পুরোপুরি বাতিল করে গানে কথকতার ঢং ও আলাপের মেজাজ প্রবর্তনে যে অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিচয় 'কৃষ্ণকলি' 'অন্ধজনে দেহ আলো' 'তবু মনে রেখো' অথবা শাপমোচন নৃত্যনাট্যের[২] 'অসুন্দরের পরম বেদনায়' ইত্যাদি গানে লিপিবদ্ধ; এবং 'লিপিকা'র গদ্যকাব্যে সুরারোপের ইচ্ছা-অপূরণে যে অসামান্য ক্ষতি হয়েছে তা আজ অপরিমেয়। উল্লিখিত গানগুলির প্রকাশিত স্বরলিপিতে ('অন্ধজনে দেহ আলো'র প্রাথমিক স্বরলিপিতে কোনো তালের উল্লেখ নেই) নেহাত প্রথা-আচরণের খাতিরেই হয়তো তালে-বাঁধা রূপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অনন্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিল্পীদের সেখানে স্বরলিপির শাসন অমান্য করাই বোধহয়

১ 'রূপকড়া'র কে কাহারবার রকমফের মনে করবার চেয়ে 'তেওড়া'র প্রবর্ধন মনে করাই শ্রেয়, কেননা শেষোক্ত তালের ছন্দের সঙ্গেই এর মিল বেশি।

২ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ' কিংবা 'শ্যামা'কে Ballet আখ্যাদান অসঙ্গত, কেমনা Ballet-তেও কথার প্রবেশ নিষেধ। Ballet, Opera, নাটক এবং কাব্যের সম্মিলনে সৃষ্ট এ হল আরেক "বর্ণসংকর অবিশুদ্ধ" শিল্প, যা একান্তই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

বাঞ্ছনীয় (অবশ্য সুরের ক্ষতি না করে)।

যে সঙ্গীতে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের প্রকাশই মুখ্য, তার রূপদানে গায়কের স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা জানি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত গায়কেরা সেই ঘরানার গায়কীতে আপনাকে প্রবল প্রয়াসে অভ্যস্ত করে নেন। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের কোনো একটি নির্দিষ্ট গায়কীর অস্তিত্ব আপাতত অবিসংবাদিত নয়, যদিও tremolo বর্জন, গানের অন্তর্নিহিত কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে লয় নির্ণয় ইত্যাদি যে কোনো রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়কের নিকট প্রত্যাশিত। স্বরলিপির প্রকাশ সত্ত্বেও বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে অনেক গানেরই রূপ হুবহু এক থাকে না। 'মরি লো মরি' 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' কারও কণ্ঠে কীর্তনের রূপ পায়, অন্য শিল্পীর কণ্ঠে সে গানের আলাপধর্মী টপ্পার চেহারা পাওয়া যায়। সেইজন্য রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপির সামান্য বিচ্যুতিতে স্বৈরাচারের ভয়ে কেউবা আতঙ্কিত, আবার বাঁধাধরা শাসনে কেউবা গায়কের 'স্বাধীনতা লোপের' জন্য অসন্তুষ্ট। এ-কথা মানতেই হবে যে সৃষ্টিশীল শিল্পীর তুলনায় উপস্থাপনকারী শিল্পীর স্বাধীনতা চিরকালই সীমাবদ্ধ, তাই স্বরলিপির অনুসরণে স্বাধীনতা হানির প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। অভিনেতার স্বাধীনতা নাট্যকারের স্বাধীনতার সমকক্ষতার দাবি কোনোকালেই করতে পারে না, তার কাজ নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে শৈল্পিক আত্মসনীকরণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বক্তব্য—অভিনেতার কাজও "নিতান্ত হরবোলার কাণ্ড নয়"। সেখানেও অভিনেতার ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা লভ্য। গায়কের কাজও অনুরূপভাবেই পাখিপড়ার মতো নিছক স্বরলিপির অনুবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে তার মধ্যে আরোপ করা নিষিদ্ধ নয়, এবং এর ফলে বিভিন্ন গায়কের রূপদানে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি তা সৃষ্টির শিল্পমূল্যের পরিপন্থী নয়--কোনো গুরুমশাইগিরির দোহাই দিয়ে সে পার্থক্যকে খর্ব করা উচিত নয়।

অবশ্য উচ্চারণের অভব্যতা, কিংবা ভাবাতিশয্য যে কোনো প্রকর্ষচিত্ত শ্রোতার কাছে অসহনীয়। এবং কাব্যসঙ্গীতের কাব্যাংশের প্রতি মনোযোগের আধিক্যে ভঙ্গির আতিশয্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রূপায়ণ যে কতটা অশ্রদ্ধেয় হতে পারে তার পরিচয় লাভে আমরা বঞ্চিত নই। কাব্য সঙ্গীতের গায়ন-পদ্ধতি বিশুদ্ধ সঙ্গীতের গায়কীকে কখনই অনুকরণ করবে না, কেননা তার ফলে তার আত্মঅবমাননা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কাব্যগুণের অধিকারী হয়েও তার ভাষা প্রধানত সঙ্গীতেরই ভাষা। তাই লিরিকের গীতিধর্মিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের খাতিরে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"র ডবল দাদ্‌রায় সুরেলা আবৃত্তি যেমন অশ্রাব্য, তেমনি গানের কথার ব্যঞ্জনধ্বনির প্রচণ্ড উচ্চারণে কাব্য সঙ্গীতের নাটুকে চেহারাও অসহ্য। আর আমাদের এই পলিমাটিতে গড়া দেশে পেলবতার প্রভাব-মুক্তি সাধনাসাপেক্ষ, এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিরুদ্ধে অতি প্রচলিত effeminacy-র অভিযোগের জন্য দায়ী তারাই যারা আধো আধো উচ্চারণে অর্ধস্ফুট স্বরক্ষেপণে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে অতি পেলবতায় প্রায় তরলীকৃত করাকেই শ্রেয় মনে করেন। ঋজুতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে মাধুর্যের সংমিশ্রণেই যে গানের প্রকৃত সৌন্দর্যের সৃষ্টি—সে সত্য এদের ধারণায় অস্বীকৃত, তাই রবীন্দ্র সঙ্গীত আজ কেবলমাত্র কুঞ্জবনের ভ্রমর গুঞ্জনের মধ্যেই আবদ্ধ। এই সংকটকালে তাই রবীন্দ্রনাথেরই সতর্ক-বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য :

"লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা।
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।"

পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ ॥ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। এ-যুগকে সুবর্ণ যুগ বলেও অভিহিত করতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায় তাতে সর্বসমৃদ্ধিশালী উনবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়। অর্বাক-চৈতন্য যুগে বাংলাদেশে এমন আলোড়ন আর সৃষ্টি হয়নি।

এ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। তারপর ক্রমান্বয়ে হিন্দু কলেজ, ডিরোজিও, ব্রাহ্মধর্ম, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার, ইয়ং বেঙ্গল, নানাবিধ সংস্কার সাধন—এবং রামমোহন থেকে আরম্ভ করে 'প্রতিভার মিছিল।' অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্তিমগ্ন কূপমণ্ডুক বাংলাদেশ হঠাৎ যেন জেগে উঠে তার চারদিকে অত্যুজ্জ্বল সূর্যকিরণ দেখতে পেল! তার ধ্যান-ধারণা, তার চিন্তা, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি, তার সমাজ, তার ধর্মবোধ—এক কথায় তার সমগ্র আত্মা সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল।

বাংলার এই চিত্তলোকের জাগরণ প্রতিফলিত হতে লাগল তার প্রগতিশীল চিন্তায়, শিক্ষাধারায়, ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারে। এবং বিশেষ করে তার সাহিত্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ধর্ম তথা দেবকেন্দ্রিক ছিল। মানুষের কথা সাহিত্যে যা ছিল তা নিতান্ত আনুষঙ্গিকরূপে। একজন ভাঁড়ুদত্ত অথবা মুরারি শীল, বা একজন হীরা মালিনীকে হয়তো আমরা খুঁজে পাই, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ মানব-বন্দনা বা মানব-জীবন-রহস্যলোকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বড়ো একটা পাই না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই বাংলার সাহিত্য-চিন্তা নানা খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। এ-সব কিছুই নবযুগের দৃষ্টি এবং মনোভঙ্গির ফল। এই শতাব্দীর শেষার্ধকালে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাংলা সাহিত্যিকরূপে মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক হলেও একটি বিস্ময়কর এবং সুদূরপ্রসারী ঘটনা। ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলার কাব্য-প্রবাহ যে গতানুগতিক ধারা বেয়ে চলেছিল, তার বাঁক ঘুরল অভাবনীয় সম্ভাব্যতার দিকে, এবং তা ঘটল—নাট্যকার মধুসূদনের কবি মধুসূদনে রূপান্তরায়ণে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত এই সময়ে হল। তার পূর্বে রঙ্গলালে এর আভাসমাত্র ছিল।

ইওরোপীয় রেনেশাঁস গ্রীক চিন্তাজগৎকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল এবং ব্যক্তিমুক্তি ও মানবতা-বোধের উদ্বোধন করে সমগ্র ইওরোপের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলেছিল। আমাদের বাংলাদেশেও উনবিংশ শতাব্দী এক হিসেবে রেনেশাঁসের যুগ। এখানে অবশ্য কোনো পুরনো চিন্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়নি, কিন্তু ইওরোপীয় রেনেশাঁসের ফল যে-ব্যক্তিমুক্তি এবং মানবতা-বোধ তা আমরা পেয়েছিলাম। এবং এটা এসেছিল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ এবং প্রভাবে। এর ফলে দেশের বদ্ধ-আত্মা মুক্ত হয়ে জেগে উঠল। আমরা পূর্বে বলেছি—এই নবজাগরণ সাহিত্যে বিশেষ করে প্রতিফলিত হতে লাগল। মধুসূদন ও বঙ্কিম এই নতুন যুগের পুরোধা। তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষিত করলেন।

সাহিত্যে এই আধুনিকতা নতুন ধ্যান-ধারণায়, নতুন ভাষায়, মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল গ্রন্থির বিমোচন

এবং বিশ্লেষণে। প্রাচীন সাহিত্যিক ছিলেন বস্তু অথবা তন্ময়তাপন্থী, আধুনিক সাহিত্যিক হলেন আত্ম অথবা মন্ময়তাপন্থী। সাহিত্যের জগৎ এবং দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটল।

পাশ্চাত্ত্য দেশের নানা কবি ও সাহিত্যিক আধুনিক যুগধারায় পুরনো কাহিনীর নবরূপায়ণ করেছেন। আমাদের দেশেও আধুনিক সাহিত্যিক যখন পুরনো কাহিনীকে সাহিত্যের উপজীব্য করলেন—তখন সে কাহিনীর রূপ ও রস একেবারে বদলে গেল। সাহিত্যিকের মনের রঙে এবং রসে পৌরাণিক কাহিনী রঞ্জিত এবং অভিষিক্ত হল।

বাংলাসাহিত্যে এ-ধারার প্রথম প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন।

মেঘনাদ-বধ কাব্যের আধার রামায়ণ। স্বাধীনচিত্ত মধুসূদন রামায়ণের মূল কাহিনীকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করলেন। তাঁর মনে গ্রীক মানবতাবাদের যে-অসীম প্রভাব ছিল, তারই ফলে রাবণ এবং ইন্দ্রজিৎ তাঁর কাব্যে মহনীয় হয়ে উঠল। এরা বাল্মীকি রামায়ণের মায়াবী নরখাদক রাক্ষস আর রইল না, সুসংস্কৃত মানব-রূপেই পরিচিত হল। মেঘনাদ কাব্যে অবশ্য আদর্শের দ্বন্দ্বে নিচ-আদর্শের পরাভব এবং নৈতিক শক্তির জয় হয়েছে; কিন্তু রাবণ ইন্দ্রজিতের চরিত্রায়ণে কবি কাব্য-পাঠকের যে 'সহৃদয়তা আকর্ষণ করেন, শিল্পদৃষ্টিতে তা অনবদ্য এবং কবির অপূর্ববস্তু-নির্মাণ প্রজ্ঞার প্রমাণ। মধুসূদনের মন ক্লাসিসিজম এবং রোমান্টিসিজমের সংমিশ্র ধাতুতে গড়া ছিল। মূল রামায়ণে সীতা-সরমা সংবাদ একটি অতি সংক্ষিপ্ত ঘটনা। মায়াবী রাবণ সীতাকে রামের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়েছিল। সীতা সরমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ওটা মিথ্যা। এইটুকু মাত্র কাহিনী রামায়ণে আছে। মধুসূদনের রোমান্টিক মন এই সূত্রটুকু মাত্র অবলম্বন করে—মেঘনাদ বধের অপূর্ব সুন্দর চতুর্থ সর্গটি রচনা করলো। বাঙালি বধুর কল্যাণী মূর্তির মতো এ দুটি চরিত্র কবির অপরিসীম দরদ এবং কল্পনার মিশ্রণে বাঙালি হৃদয়ে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকবে। বাঙালি পাঠকের কানে চিরদিন অনুরণিত হবে দুটি পঙ্‌ক্তি—

> ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
> কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে—
> বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।

প্রমীলার চরিত্র কল্পনা আরো বেশি রোমান্টিক। মূল রামায়ণে এ-চরিত্র আদৌ অনুপস্থিত। এ মাইকেলের নিজস্ব সৃষ্টি। ইওরোপীয় কাব্যপুরাণের বিভিন্ন নারীচরিত্র, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং কাশীদাসী মহাভারতের নারীরাজ্যের প্রমীলা—সব কিছুর সংমিশ্রণে মাইকেল এ অপূর্ব নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন যার মধ্যে বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনী কুসুমাদপির বিস্ময়কর সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করি। মেঘনাদ বধের ক্লাসিক আড়ম্বর এবং বিশালতার মধ্যে এ-তিনটি নারী-চরিত্র সৃষ্টি আধুনিক কবিমানসের দ্যোতক।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে-নবজাগরণ এসেছিল তার প্রধান-প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে ব্যক্তিমুক্তি এবং মানবতাবোধের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মধুসূদনের বীরাঙ্গনাকাব্যে তার সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করি। এই পত্রকাব্যের চরিত্রগুলো পৌরাণিক। কাহিনীগুলো কাল্পনিক। মধুসূদন ইতালীয় কবি ওভিদের অনুসরণে এই পত্রকাব্য রচনা করেন। ওভিদ যেমন পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নতুন এবং রোমান্টিক সাজে সাজিয়েছিলেন, মাইকেলও তেমনি তাঁর নায়িকাদের নতুন এবং রোমান্টিক মূর্তি দিয়েছেন। বৃহস্পতি পত্নী তারার বৃহস্পতি-শিষ্য সোমের প্রতি প্রেমনিবেদন যেমন রোমান্টিকধর্মী তেমনি আধুনিক

নারীর হৃদয়মুক্তির পরিচয়বাহী। ওভিদের ফিড্রার সঙ্গে তারার তুলনা হতে পারে, যদিও মাইকেল ভারতীয় সংস্কার একেবারে ত্যাগ করেননি তারার পাপবোধের উল্লেখের দ্বারা। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যে কেকয়ী এবং জনার চরিত্র যেমন কাব্যকলার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ তেমনি নতুন মনোভঙ্গির পরিচায়ক। এদের মধ্যে প্রেমনিবেদন নেই, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, এবং যে-অভিযোগ উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে—নারীস্বাতন্ত্র্যের নব মূল্যায়ণের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

বঙ্কিম কোনো পৌরাণিক কাহিনীকে আনয়ন করে তাঁর কোনো উপন্যাস রচনা করেননি; প্রাসঙ্গিকভাবে যুগধারাবর্ণনে তাঁর কথা এসে গেলেও আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্যে তাঁর স্থান নেই। সুতরাং আমরা এখন কবি হেমচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

হেমচন্দ্র ঐ সময়কার সর্বপ্রধান দেশাত্মবাদী কবি। 'ভারতসঙ্গীত' তার বড়ো প্রমাণ। বাহ্যদৃষ্টিতে একটি মরাঠী কাহিনী হলেও এ-সঙ্গীতের মাধ্যমে পরাধীনতার গ্লানি কবি মর্মভেদী ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব বৃত্রসংহার রচনায়। ইন্দ্র-বৃত্রের কাহিনী মূলত বৈদিক; পল্লবিত আকারে পৌরাণিক। 'বৃত্রসংহার' কাব্যের অন্তরালে কবির দেশাত্মবোধই সদা জাগ্রত। এ-কাব্য জাতিবৈরের কাব্য। মেঘনাদ-বধে ইন্দ্রজিৎ খুল্লতাত বিভীষণকে দেশদ্রোহী বলে নিন্দা করেছেন এবং পিতার পাপকর্ম সত্ত্বেও দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বৃত্রসংহারেও রুদ্রপীড় পিতা বৃত্রাসুরের—শচীহরণরূপ পাপকর্ম সমর্থন করেছেন—স্বকীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ-প্রেরণায় এবং দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে। রাক্ষসদের প্রতি মাইকেলের মতো, অসুরদের প্রতি হেমচন্দ্রের কোনো সহানুভূতি ছিল না। তিনি দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করেছেন, কারণ—তাঁর কাব্যের নিহিতার্থ—ইংরেজ সরকারের ধ্বংস। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং অনুকৃত। তাঁর অনুকরণের আত্মসাৎকরণ হয়নি। তাছাড়া সহৃদয় সহানুভূতির অভাবে তাঁর কাব্য রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। দধীচির অস্থিদান বৃত্রসংহার কাব্যে একটি বড়ো ঘটনা। ঘটনাটি পৌরাণিক; কিন্তু এর বর্ণনায় হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর হিতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম যে পরম।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।—

হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যাও তন্ত্রপুরাণকে অবলম্বন করে। তন্ত্র কিংবা পুরাণে দশমহাবিদ্যার যে-রূপ এবং বর্ণনা পাওয়া যায় হেমচন্দ্র তা যথাযথ অনুসরণ করেননি। তিনি এদের নতুন রূপ এবং ভাব দিয়েছেন। শক্তির বিভিন্ন রূপ, উগ্র এবং শান্ত। কিন্তু মূলত তা একই। অবিদ্যার দ্বারা আবৃত বলে আমরা সেটা বুঝি না। আমাদের শোক, মোহ এইজন্য। এই দার্শনিক তত্ত্ব হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার উপাদানে আমাদের দিয়েছেন।

নবীন সেনও পৌরাণিক কাহিনীকে নিজস্বভাবে নতুন রূপ দিয়েছেন। রৈবতক কুরুক্ষেত্রে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে ভারতের ঐক্য সাধনের যে-মন্ত্র নবীন সেনের দ্বারা উদ্গীত হল, মূল মহাভারতে তা নেই। মূল মহাভারতের মর্মবাণী—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। বেদব্যাস এবং শ্রীকৃষ্ণকে নবীন সেন নবভাবে ভাবিত করেছেন। মহাভারতের নবীকরণও উনবিংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধ জাগরণের সদ্য ফল।

হেম-নবীনের কাব্যে পুরনো কাহিনীর নবায়ণ হয়েছেন সত্য কিন্তু সর্বণা কাব্য সৃষ্টি হয়নি। উদ্দেশ্যমূলকতা তার একটি বড়ো কারণ।

মধুমানসে যে-জাদু ছিল এঁদের তা ছিল না। হেমচন্দ্র অতি-সাবধানী—নবীন সেন আবেগময় কবি, কিন্তু মহাকাব্যের কবি নন। মধুসূদনের সঙ্গে এঁদের এখানেই প্রভেদ।

মাইকেল পৌরাণিক কাহিনীর নবরূপায়ণের যে-ধারা প্রবর্তন করলেন তা সার্থকতা লাভ করল রবীন্দ্রনাথে। বর্তমান প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই নতুন সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সিদ্ধিলাভ।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্য। যে-অনুপ্রেরণা তিনি কিশোর বয়সে বিহারীলালের কাব্য থেকে পেয়েছিলেন তা পরিপুষ্ট এবং পরিমার্জিত হয়েছিল পারিবারিক পরিবেশ এবং শিক্ষা-দীক্ষায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলাদেশে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা এবং আধুনিকতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মানসিক পরিমণ্ডল এর দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যের উপর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। সেই জন্যই মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনীর নবরূপায়ণে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন; রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনকে স্বীকার করে তার নতুন রূপ দিয়েছেন।

আধুনিক কবি-মনের যে-বিশেষত্ব আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথে তার পরাকাষ্ঠা। জন্ম-রোমান্টিক রবি-কবির মন্ময়তার কথা আর নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর অনুভূতিপ্রবণ সূক্ষ্ম সুকুমার পরিশীলিত মন যেখানে গিয়েছে সেখানেই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে। সে-ইন্দ্রজাল কাব্যের অলৌকিক মায়ার জগৎ। তা যেমন রবিরশ্মির মতোই বর্ণাঢ্য তেমনি বিচিত্র। তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা আর অপূর্ব-বস্তু নির্মাণপ্রজ্ঞা নিত্যনবায়মানা।

উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধপুরাণ ও জাতক এবং কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মৌলিক উপাদানগুলো এমনভাবে আত্মসাৎকৃত হয়েছে যে তাদের পার্থক্য অনুভূতিগম্য হয় না; মনে হয় এগুলো একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের, অন্যের নয়।

রামায়ণের আখ্যান নিয়ে আমরা আলোচনা আরম্ভ করব। এর অন্তর্গত হবে গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, এবং কাহিনীর দুটি কবিতা—'ভাষা ও ছন্দ', 'পতিতা'।

সংস্কৃত রামায়ণে বাল্মীকির কাব্যপ্রতিভাস্ফুরণের ঘটনাটি এইরূপ।—নারদকে বাল্মীকি প্রশ্ন করলেন—ভূমণ্ডলে বর্তমানে এমন কে নরোত্তম আছেন যিনি বিপদে অধীর হন না, যিনি বীর, যিনি পর্বতের মতো ধৈর্য অটল, সমুদ্রের মতো গম্ভীর ইত্যাদি। নারদ উত্তর দিলেন—নরচন্দ্রমা রাম। বাল্মীকি তারপর তমসায় স্নান করতে গেলেন। যখন নদীতটের শ্যাম শোভা দেখছেন তখন তাঁরই সামনে ক্রৌঞ্চ হত্যা সংঘটিত হল। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি নিঃসৃত হল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে হল—কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া। স্নানান্তে আশ্রমে ফিরে এলেন কিন্তু সারাক্ষণ কি-রকম যেন ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। এমন সময় ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। বাল্মীকির মনে-মনে শ্লোকটি পুনরায় আবৃত্ত হতে লাগল। ব্রহ্মা বললেন—আমার ইচ্ছায়ই এ-শ্লোক তোমার মুখনিঃসৃত হয়েছে। তুমি রামায়ণ রচনা করো। বাল্মীকি এ-কার্যের দুরূহতা জ্ঞাপন করলে ব্রহ্মা বললেন—ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি—তুমি যা বলবে সবই সত্য হবে। অবিদিত সমস্ত কিছু তোমার বিদিত হবে।—আদি কবির জন্ম হল খুব স্বাভাবিক ভাবে—শোক ঘটনায় করুণা জাগরণে।

সংস্কৃত রামায়ণের বাল্মীকি মুনি, দস্যু নন। রত্নাকর দস্যুর কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে রামায়ণে গৃহীত হয়েছিল। বাল্মীকি-প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন এবং দস্যুরা কালীভক্ত এই কিংবদন্তীর জন্য বাল্মীকিকে কালীর স্তব রত দেখিয়েছেন। নরবলির জন্য একটি বালিকাকে অন্য দস্যুরা

ধরেছে এমন সময় বাল্মীকির মনে করুণা জেগে উঠল এবং তিনি বালিকাকে মুক্তি দিতে আদেশ করলেন। এই ঘটনা বাল্মীকির হৃদয়কে করুণার্দ্র করে রেখেছিল—ইতিমধ্যে ব্যাধের দ্বারা ক্রৌঞ্চহত্যা তাঁরই সামনে ঘটল। তখন তাঁর মুখ থেকে মা নিষাদ শ্লোক নিঃসৃত হল। এমনি সময়ে সরস্বতীর আবির্ভাব। বাল্মীকি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। সরস্বতী অন্তর্হিতা হলে লক্ষ্মী এলেন। বাল্মীকি লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার সরস্বতীর আবির্ভাব। তিনি বললেন বালিকার মূর্তিতে তিনিই এসেছিলেন। বর দিলেন—

আমি বীণাপাণি তোরে শিখাতে এসেছি গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ॥

বিহারীলালের সারদামঙ্গলে বাল্মীকি কাব্যপ্রতিভাস্ফুরণে যে-জ্যোতির্ময়ী ললাটিকা কন্যার কথা আছে রবীন্দ্রনাথ তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন বালিকা মূর্তিতে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী কল্পনায়। লক্ষ্মীর প্রত্যাখ্যানেও বিহারীলালের প্রভাব আছে।

'ভাষা ও ছন্দ'ও ঐ প্রতিভাস্ফুরণের কাহিনী নিয়ে। বাল্মীকির হৃদয়ে কাব্যছন্দ স্ফুরিত হয়েছে—কি রূপ তাকে দেবেন বিভ্রান্ত হয়ে ভাবছেন; এমন সময় ব্রহ্মার আদেশে নারদ এলেন। প্রশ্ন করলেন যে ছন্দ বাল্মীকি লাভ করেছেন তা দিয়ে কোন্ দেবতার অমর গান রচনা করবেন। বাল্মীকি প্রত্যুত্তরে বললেন—দেবতার কথা তিনি রচনা করবেন না।

মানবের
জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদুর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

'ভাষা ও ছন্দ' মূল রামায়ণের প্রায় অনুগ। কেবল ব্রহ্মা নিজে না এসে নারদকে পাঠিয়েছেন। বাল্মীকি-প্রতিভার কাহিনীকে কবি বাংলা রামায়ণ, কিংবদন্তী এবং বিহারীলালের অনুসরণে রূপ দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কবিযশঃ আকাঙ্ক্ষাও আভাসিত হয়ে উঠেছে দুটি ছত্রে—

আমি বীণাপাণি তোরে শিখাতে এসেছি গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ॥

'ভাষা ও ছন্দে' আধুনিক কাব্যশিল্পের মূল কথাটুকু আছে। কবি দেবতার কথা বলবেন না। এবং 'মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর, অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদুর, ভাবের স্বাধীন লোকে'·—এখানেই রোমান্টিক মন্ময় কবির মন ধরা পড়ে। ক্রান্তপ্রজ্ঞ কবির শিল্পদৃষ্টির কথাও অপূর্ব সুন্দর ভাষায় বলা হয়েছে—

কবি তব মনোভূমি রামের জনমভূমি,
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

'কাল মৃগয়া'র কাহিনীটুকু রামায়ণ···অযোধ্যা কাণ্ড থেকে গৃহীত। দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে ভ্রমবশত বাণবিদ্ধ করে মেরেছেন। অন্ধমুনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন—

পুত্র ব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি॥

মূলের সঙ্গে এইটুকুমাত্র যোগ। বাকি সব অংশ কবির স্বকল্পিত। গীতিনাট্যের প্রয়োজনেই বন-দেবীগণ কল্পিত হয়েছেন; তারা নাট্যরসকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছেন। সর্বশেষ দৃশ্যে অন্ধমুনির পুত্রের মৃতদেহ ঘিরে বন-দেবীগণের গান একটি অতি করুণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মূলে আছে অন্ধ মুনির পুত্র দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গেলেন এবং মাতাপিতাকে এই আশ্বাস দিলেন যে তাঁরাও শীঘ্রই তাঁর অনুগমন করবেন। রবীন্দ্রনাথ শেষদৃশ্যে যে-করুণ রস সঞ্চার করেছেন বাল্মীকির রামায়ণে তা অনুভূত হয় না। দুঃখের দাবদাহ সেখানে যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে।

কাহিনীর 'পতিতা' কবিতাও রামায়ণের সঙ্গে সংযুক্ত। ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে আনার জন্য রোমপাদের মন্ত্রীরা বারাঙ্গনাদের প্রেরণ করেন। তারা মধুর স্বরে গান গাইতে-গাইতে আশ্রমে প্রবেশ করল। ঋষ্যশৃঙ্গ পাদ্যার্ঘ্য নিয়ে তাদের সৎকার করলেন, তারাও নানাবিধ ফল মুনি-পুত্রকে দিল। প্রথম দিন তারা ফিরে এল। কিন্তু পরে একদিন ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের সঙ্গে চলে এলেন। রোমপাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে তার বিবাহ হল। মূল রামায়ণের কাহিনী এই।

রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রকে অবলম্বন করে বারনারীদের অন্যতমাকে নিয়ে 'পতিতা' কবিতা রচনা করলেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী তরুণ তাপসের তপঃ উজ্জ্বল মূর্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল। অন্যান্যদের মতো সে এই তরুণ তাপসকে ভোলাবার চেষ্টা করতে পারল না। কেন পারল না সে-কথাই সে রাজমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করছে।

পতিতার অন্তর্লোক কি করে শোধিত হয়ে গেল একটি অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মচারীর সহজ সরল দৃষ্টিপাতে, তাই এ-কবিতার মর্মার্থ। নিষ্পাপ দৃষ্টিতে নারী-সৌন্দর্য কত মহিমময় হয়ে ওঠে ঋষ্যশৃঙ্গের কথায় তা আছে—

> আনন্দময়ী মূরতি তোমার
> কোন দেবে তুমি আনিলে দিবা।
> অমৃত সরস তোমার পরশ
> তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

বিস্ময়মুগ্ধ পরিশোধিতচিত্ত পতিতার মুখে প্রত্যুত্তরে শুনতে পাই—

> দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
> সরল নয়ন করেনি ভুল।

সত্যই, দিব্যদৃষ্টিতে দেবতাকেই দেখা যায়। কত উচ্চগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ভাব-সুর বাঁধা হয়েছে এ-কবিতায়!

এখন আমরা মহাভারতের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আদি পর্বের কচ-দেবযানী আখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিদায় অভিশাপ' রচনা করেছেন।

বৃহস্পতির-পুত্র কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করবার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্য হলেন। তাঁর পরিচর্যারতা শুক্রকন্যা দেবযানী ক্রমশ তাঁর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হলেন। দৈত্যরা কচের বিদ্যালাভ ব্যর্থ করবার জন্য বারবার কচকে বধ করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই দেবযানীর কাতর অনুনয়ে শুক্রাচার্য ত পুনর্জীবিত করেছিলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যালাভে সিদ্ধকাম হয়ে কচ যখন বিদায় চাইলেন তখন দেবযানী তাকে বিবাহ করতে অনুরোধ জানালেন। দেবযানী তার গুরুপুত্রী, পূজনীয়া, ভগিনীসদৃশা ইত্যাদি আপত্তি উত্থাপন করে কচ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দেবযানী অভিশাপ দিলেন—তোমার অর্জিত বিদ্যা ফলবতী হবে না। কচও প্রত্যভিশাপ দিলেন—তুমি কামবশত আমাকে অভিশাপ দিলে, আমিও অভিশাপ দিচ্ছি কোনো ঋষিপুত্র তোমাকে

বিবাহ করবে না।– মহাভারতের কাহিনী এই। এখানে অভিশাপ ও প্রত্যভিশাপ আছে। দেবযানীও তেজস্বিনী নারী।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প-কৌশল এই কাহিনী নিয়ে ত্যাগ এবং মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করেছে। 'বিদায় অভিশাপে' প্রত্যাখ্যাত দেবযানী কচকে অভিশাপ দিলেন—

যে-বিদ্যার তরে
মোরে করো অবহেলা—সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ। তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে। করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

কিন্তু কচ কোনো অভিশাপ দিলেন না। ক্ষমাসুন্দর উদার হৃদয়ে দেবযানীকে বর দিলেন—

আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

মহাভারতে দেবযানী কচকে বারে-বারে জীবন দান করেছেন; কচ দেবযানীর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিবাহ সম্ভব নয় যেহেতু দেবযানী গুরুপুত্রী। তা ছাড়া দেবযানীর প্রতি কচ প্রেমাকৃষ্ট হননি। রবীন্দ্রনাথে যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেমের স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করি। কচ দেবযানীর প্রতি আকৃষ্ট,—কচ দেবযানীকে বলছেন—

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?

—কিন্তু তাঁর মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে বিবাহ পরিপন্থী, কারণ সঞ্জীবনী বিদ্যা তাকে স্বর্গলোকে নিয়ে যেতে হবে। না হলে কর্তব্যভ্রষ্ট হবেন। কচ এখানে অনেক বেশি বাস্তবতাময়।

মহাভারতে কচ দেবযানী দুজনেই যুক্তিতর্ক এবং বাক্যের দ্বারা নিজেদের সমর্থন করছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কলাকৌশল অন্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দেবযানী ইঙ্গিতে, কৌশলে তাঁর প্রেম নিবেদন করছেন, কচের প্রেমাকর্ষণ করবার চেষ্টা করছেন, আবার যখন তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে গেল তখন নিষ্ঠুরা হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী মহত্তর হয়ে ওঠেননি, মূলেরই মতো তিনি তেজস্বিনী এবং ব্যর্থ প্রেমে নীতিধর্মজ্ঞান-হীনা। মহাভারতে দেবযানীর পরবর্তী চরিত্রও প্রশংসনীয় নয়; তিনি দাম্ভিকা এবং কূট কৌশলা। রবীন্দ্র-নাথের দেবযানী অনেকটা আধুনিকা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ সর্বতোভাবে মহত্তর হয়ে উঠেছেন। তিনি কর্তব্যরত, জিতেন্দ্রিয় এবং উদারহৃদয়।

চিত্রাঙ্গদা ও আদি পর্বের আখ্যান। পাণ্ডব-ভ্রাতাদের মধ্যে দ্রৌপদী-সম্পর্কে যে নিয়ম ছিল, কর্তব্যানুরোধে অর্জুন তা ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। ফলে তাকে বনবাসে যেতে হয়। এই বনবাসকালে তিনি মণিপুরে গেলেন; সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যাকে দেখে তিনি পাণি-প্রার্থী হলেন। চিত্রবাহন বললেন—আমার পুত্র নেই। চিত্রাঙ্গদাকেই আমি পুত্র গণ্য করি। তার গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে—এই প্রতিজ্ঞা করলে তাকে বিবাহ করতে পার।

অর্জুন স্বীকৃত হলেন এবং চিত্রাঙ্গদার পুত্র জন্মগ্রহণ করবার পর তিনি পুনরায় ভ্রমণে বেরোলেন। মহাভারতের কাহিনী এই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাঙ্গদায় এ-কাহিনীর আমূল পরিবর্তন করেছেন। চিত্রাঙ্গদা কুরূপা। তিনি বালক বেশধারী ছিলেন কিন্তু অর্জুনকে দেখে তাঁর নারীত্ব জাগ্রত হল, তিনি অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নানা বসন-ভূষণে সজ্জিত হলেন এবং প্রেম নিবেদন করলেন। অর্জুন বললেন—

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে—

নিষ্ফল নারীত্বকে ধিক্কার দিয়ে আশাহত প্রত্যাখ্যাত চিত্রাঙ্গদা মদনের পূজা করলেন এবং তাঁর বরে অপূর্ব সুন্দরী হয়ে অর্জুনকে আকৃষ্ট করলেন। অর্জুনের ব্রতভঙ্গ হল।

চিত্রাঙ্গদা মনে-প্রাণে জানেন এ প্রেম নয়, এ রূপাকর্ষণ এবং তাঁর এ রূপও মিথ্যা ও অচিরস্থায়ী। তিনি জানেন অর্জুনের সমস্ত প্রেমনিবেদন ঐ মিথ্যা রূপের কাছে, তাঁর নারীত্বের কাছে নয়। এই বর তাঁর কাছে শাপ হয়ে এসেছে। তাই তাঁর অন্তরের আর্তনাদ শুনি—

ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

চিত্রাঙ্গদা তাঁর নিজের 'আমি'কে ফিরে পেতে চায়। সেই তো সত্য।

এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।

বীর্যবান কর্তব্যপরায়ণ অর্জুনের চিত্তেও অবসাদ এসেছে। তার মোহ ভাঙতে আরম্ভ করেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন চিত্রাঙ্গদাকে তিনি পাননি, তাঁর রূপকে তিনি পেয়েছেন, তাঁর প্রেমের উন্মাদনাকে পেয়েছেন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বললেন--

সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে-সত্য তাই লও।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে চান গৃহিণীরূপে, তাঁর পুত্রের জননীরূপে পেতে চান, কারণ সেখানেই প্রেমের যথার্থ সার্থকতা। অসংযত রোমান্টিক প্রেমে কল্যাণ নেই, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব শকুন্তলা সম্পর্কেও বলেছেন।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

এই নাট্য কাহিনীতে আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।

রবীন্দ্র রচনাবলীর চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কেন জানিনা হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস……। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দাহনই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়।" চিত্রাঙ্গদা দেবদত্ত রূপ ত্যাগ করে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। বীর্যবান অর্জুন রূপমোহগ্রস্ত হোন, চিত্রাঙ্গদা এ চান না। চিত্রাঙ্গদার রূপান্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে অঙ্কিত করেছেন। আধুনিক যুগচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত সংলাপাংশে। চিত্রাঙ্গদা আত্মপরিচয় দিচ্ছেন—

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি—নহি—
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে—
সে নহি—নহি—।
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে
সংকটে সম্পদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্য নাট্যের মূল মহাভারতের সভাপর্বে। কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবেরা প্রথমবার পরাজিত হবার পর ধৃতরাষ্ট্র তাদের সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার অনুমতি দিলেন। তারা চলে যাবার পর কর্ণ শকুনির প্ররোচনায় দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পুনরায় পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ার অনুমতি চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারী ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করে পুত্র স্নেহবশত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আপনি পুত্রগণের মত অনুমোদন করবেন না এবং দারুণ বংশনাশের কারণ হবেন না। পাণ্ডবেরা শান্ত হয়েছে। কেন তাদের পুনরায় ক্রুদ্ধ করে তোলা? আমার বাক্যে এই কুল-কলঙ্ক দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বললেন—এই বংশের সম্পূর্ণ ধ্বংস হোক, আমি বারণ করতে পারছি না। পুত্রেরা যা ইচ্ছা করে, তাই হোক।—মূলের কাহিনী এই।

রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকে পিছিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয়বার কপট দ্যূতে পরাজিত হয়ে পাণ্ডবেরা যখন বনগমনে প্রস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন তখন আরম্ভ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবুদ্ধি ও ন্যায়-অন্যায়বোধ সুবিদিত। গান্ধারীর চরিত্রকে 'গান্ধারীর আবেদনে' তিনি আদর্শরূপে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন এবং মূলানুসরণ করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গান্ধারীর আবেদন—ন্যায়-ধর্মের জন্য পুত্রের নির্বাসন দণ্ড।

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ
বিধাতার বাম হস্ত ; ধর্মরক্ষা কাজ—
তোমা 'পরে সমর্পিত।

রাজা স্নেহান্ধ। গান্ধারীর আবেদন শুনলেন না। দুর্যোধনকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন—যতক্ষণ কুরুবংশ একেবারে ধ্বংস না হয়, সর্বনাশের সময় না আসে,

ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
আলিঙ্গনে কোরো না শিথিল, ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্বস্বার্থ ধন।

রাজার নিকট গান্ধারীর আবেদন নিষ্ফল হল। ধর্মজ্ঞা গান্ধারী বিধাতার উদ্যত দণ্ড মাথা পেতে স্বীকার করলেন—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।

মূলের গান্ধারীর আবেদন স্থূল ভাষায় সংক্ষেপে উক্ত। রবীন্দ্রনাথে তা সূক্ষ্মতর, বিস্তৃত ও মর্মস্পর্শী। বিধাতার কাছে শেষ বিচার প্রার্থনা গান্ধারীকে আরো মহৎ করে তুলেছে। মূলে তা নেই।

রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর এই কয়টি কথা—

নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।—

গভীর ব্যঞ্জনাময়।

ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র-অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। মূলে, এই প্রসঙ্গে, তাঁর সম্পর্কে এইটুকুমাত্র পাই—

অন্তঃ কামং কুলস্যাস্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্॥
যথেচ্ছন্তি তথৈবাস্তু প্রত্যাগচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ।
পুনর্দ্যূতং প্রকুর্বন্তু মামকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ॥

রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধ এবং স্নেহান্ধ পিতাকে এমনভাবে অঙ্কিত করেছেন যে আমাদের সমবেদনা আকৃষ্ট হয়। এ-মানুষটি প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যহত। নিজের জীবনে যা সার্থক হল না পুত্রের জীবনে তা সার্থক হয়ে উঠুক, এ-কামনা কি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে ছিল না? তিনি জানেন তাঁর পুত্র পাপী, অধর্মচারী, সে জন্যই তাকে আশ্রয় দেওয়া পিতার কর্তব্য—

পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার
তাই তারে ত্যজিতে না পারি, আমি
তার একমাত্র ; ....

* * *

এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি

অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির।
অর্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্মতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর।

দুর্যোধনের চরিত্র মহাভারতীয় দুর্যোধন চরিত্রের সামগ্রিক পটভূমিকায় এবং আধুনিক কূট রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কল্পিত হয়েছে। মূলে এই প্রসঙ্গে দুর্যোধন সম্পর্কে এইটুকুমাত্র আছে যে পাণ্ডবরা প্রথমবার দ্যূতে পরাজিত হয়ে ফিরে যাবার পর কর্ণ এবং শকুনি তাঁকে প্ররোচিত করলেন এই বলে যে পাণ্ডবরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। বিশেষত দ্রৌপদীর অপমান তারা কিছুতেই সহ্য করবে না এবং কিছুদিনের মধ্যেই বল সংগ্রহ করে তারা প্রতিশোধ নেবে। দুর্যোধন পিতার কাছে এসে এ-সব বলে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার অনুমতি চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনকে সাম্রাজ্যলোলুপ কূটরাজনীতিবিদ আধুনিক যে-কোনো রাজা কিংবা রাজ্যশাসকদের প্রতীকরূপে অঙ্কিত করেছেন।

মূলের সূত্রটুকু ধরে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নতুন রূপ দিয়েছেন এই মহাভারতীয় ঘটনার। ভানুমতীর প্রতি গান্ধারীর উক্তি এবং ভানুমতীর প্রত্যুত্তর নতুন সংযোজন।

নরক বাসের আখ্যানভাগ মহাভারতের বনপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। সোমক রাজার একশত স্ত্রী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তার এক পুত্র হল। একদিন এক পিপীলিকা জন্তুকে দংশন করল। তার আর্তনাদ এবং ভার্যাগণের বিলাপ শুনে রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে পুত্রকে শান্ত করলেন। পরে রাজ-সভায় এসে পুরোহিত ও মন্ত্রিগণকে বললেন—আমার শত ভার্যা থাকা সত্ত্বেও মাত্র একটি পুত্র হয়েছে। আমাদের প্রাণ এই একটি পুত্রকে আশ্রয় করে আছে। আমার শতপুত্র হয়, এমন কোনো উপায় আছে কি? পুরোহিত বললেন—আমি এক যজ্ঞ করব। তাতে আপনার পুত্র জন্তুকে আহুতি দিতে হবে, তাহলে আপনি শতপুত্র লাভ করবেন। অবশ্য জন্তুও তার মাতৃগর্ভে আবার জন্মগ্রহণ করবে। রাজা সম্মত হলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হল। রাজ-ভার্যাগণ জন্তুর হাত ধরে বিলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু পুরোহিত তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে কাটলেন এবং তাকে আহুতি দিলেন। রাজার শত পুত্র হল। জন্তুও তার পূর্ব মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করল।

তারপর সেই পুরোহিত আগে এবং রাজা পরে পরলোকে গমন করলেন। রাজা যখন পুণ্যকর্মের জন্য স্বর্গে যাচ্ছেন তখন পুরোহিতকে নরক ভোগ করতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পুরোহিত বললেন, তিনি যে রাজার জন্য যজ্ঞ করেছিলেন তারই ফলে তার নরক ভোগ। তখন রাজা যমকে অনুরোধ করলেন পুরোহিতকে মুক্তি দিতে; তার বদলে রাজা নরক ভোগ করবেন। যম স্বীকৃত হলেন না। তখন সোমক বললেন—এই ঋত্বিক এবং আমি একই কর্ম করেছি। আমাদের পাপপুণ্যের ফল একই হোক। তখন যম সম্মত হলেন, এবং রাজা ও পুরোহিত এক সঙ্গে নরক ভোগ করে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে গমন করলেন। এই হল মূল আখ্যান।

রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনী প্রায় অনুসরণ করেছেন। তিনি ঘটনা-বিন্যাস করেছেন রাজা সোমকের স্বর্গগমন পথে যখন নরকের কাছে দেবরথ এসেছে। এই নরক-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা সুন্দর। তাছাড়া তিনি নরকচারী প্রেতগণকে স্বকীয় কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। মূলে তারা নেই।

রবীন্দ্রনাথ সুসমৃদ্ধ ভাষায় মূল কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকীয়ত্ব পরিপুষ্ট হয়েছে প্রেত-কল্পনার দ্বারা। এই প্রেতগণ একদিন পৃথিবীতে ছিল। পাপের ফলে তাদের বর্তমান দশা। পৃথিবীর কথা শুনতে তাদের বড়ো আগ্রহ, কারণ 'পাতকের ইতিহাস। এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস'। মৃত্যুর পরেও সংস্কার যায় না।

উপরে স্বর্গ। মর্ত হতে স্বর্গে যাবার পথপার্শ্বে নরক। প্রেতগণ বলছে—

নিত্য নন্দন আলোক
দূর হতে দেখা যায়; স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি; সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

চিরনরকবাসী প্রেতগণের সম্মুখে নৈরাশ্য ছাড়া কিছু নেই, তাই তাদের স্বর্গ এবং মর্তবাসীকে ঈর্ষা। কিন্তু সোমককে পেয়ে তারা সুখী হয়েছে। তাদের অন্তর গৌরবান্বিত। হয়তো বা একটু আশার আলো তারা দেখল। সোমককে তারা বলছে—

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফল ত্যাগী।
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।

প্রেতগণের এই উক্তি দ্বারা সোমকের মহত্ত্ব আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাজা ও ঋত্বিকের চরিত্রেও রবীন্দ্র-নাথ নতুন আলোকপাত করেছেন। ঋত্বিক রাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট; বিদ্বেষের তাপ অন্তরে পোষণ করে, সে রাজাকে যজ্ঞে ব্রতী করাল। তার পাপ অপরিসীম। প্রেতগণ পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করে। মূলে আছে, ঋত্বিক নিজে আহুতি দিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন ঋত্বিক রাজাকে দিয়ে পুত্রকে হোমানলে নিক্ষিপ্ত করাল। ঋত্বিকের পাপ আরো তীব্র হয়ে উঠল। রাজার অনুতাপও বাড়ল—তাঁর আর্তনাদ শুনি—

হায় পুত্র, হায় বৎস নবনী নির্মল,…
অগ্নিরে খেলনা সম পিতৃদান জানি
ধরিলি দু-হাত মেলি বিশ্বাসে নির্ভয়ে।

রাজার মনে পাপবোধ তীব্রতর হয়ে উঠল—তিনি বলছেন,—

হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তর তাপ। আমি যাবো স্বর্গ দ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ-পাপ আমার—

আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার
সে-অন্তিম অভিমান!

রাজার মনে এ-পাপবোধ তীব্রতর করে রবীন্দ্রনাথ রাজ-মহিমাকে মূল হতে অনেক বেশি উজ্জ্বল করেছেন। ধর্মরাজাকে বলেছেন অন্তরনরকানলে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান অভিমানী ঋত্বিক মহাপাপী, যেহেতু তার মনে কোনো অনুতাপ জাগেনি। রাজা তবু ঋত্বিককে ত্যাগ করলেন না। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল প্রচলিত কু-সংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানকে সর্বথা নিন্দা করেছেন। 'নরকবাসে'ও এ-নিন্দা আছে।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব থেকে কর্ণকুন্তী সংবাদের প্রসিদ্ধ কাহিনী গৃহীত। কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্রের বিপদ আশঙ্কা করেই গঙ্গাতীরে গেলেন। কর্ণকে কুন্তী বললেন—তুমি কৌন্তেয়, তুমি রাধা অধিরথের নন্দন নও। তুমি আমার কানীন পুত্র। তপনদেব তোমার পিতা। তুমি কবচকুণ্ডলধারী ও দুর্ধর্ষ হয়ে কুন্তিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। এই পরিচয় নিঃসংকোচে দিয়ে কুন্তী কর্ণকে দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আসতে অনুরোধ জানালেন। কর্ণকে প্রলুব্ধ করতে আরো বললেন—তুমি পঞ্চভ্রাতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে মহাযজ্ঞ-বেদীতে দেবগণ বেষ্টিত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাবে। এই সময় কর্ণ শুনতে পেলেন তাঁর পিতা ভাস্কর বলছেন—তোমার জননী পৃথা সত্য কথা বলেছেন, তাঁর কথা শোনো। কর্ণ প্রলুব্ধ হলেন না, পিতার কথায়ও বিচলিত হলেন না। বরং কুন্তীকে বললেন—আপনার অনুরোধ ধর্মসংগত নয়। আপনি আমায় ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন; আমার যশকীর্তিও ক্ষত্রিয়ত্ব আপনার জন্যই নষ্ট হয়েছে। আমার কোন্ শত্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? যখন দয়া করা উচিত ছিল তখন তা না করে এখন নিজের হিতকামনায়ই এসেছেন। তারপর কর্ণ অন্নদাতা দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করা অকৃতজ্ঞতা হবে, শত্রুরা তাঁর নিন্দা করবে ইত্যাদি নানা কথা বলে কুন্তীকে আশ্বাস দিলেন—যুদ্ধে আমিই মরি বা অর্জুন মরেন, আপনি পঞ্চপুত্রের জননীই থাকবেন। কুন্তী অর্জুন সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। বাকি চারপুত্র জীবিত থাকবে এই আশ্বাস পেয়ে কর্ণকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। এই হল মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ মূলকাহিনীকে মোটামুটি অনুসরণ করলেও তার রূপ এবং রস আমূল পরিবর্তন করে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত এক কাব্যনাট্যের সৃষ্টি করেছেন। মূলে কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর কথা আরম্ভ হয়েছে ঠিক মধ্যাহ্ন অতীত হবার পর। কর্ণ প্রাতঃকাল থেকে জপমগ্ন ছিলেন। কুন্তীকে তিনি পূর্ব থেকেই চিনতেন।

উদ্যোগ পর্বের ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ কর্ণপর্বে নিয়ে গেছেন। কর্ণ-কুন্তী সাক্ষাৎকার হচ্ছে গঙ্গাতীরে, রণ-ভূমিতে—কর্ণ যখন কুরুসেনাপতি। রবীন্দ্রনাথ ঘটনার কালও পরিবর্তন করেছেন। কর্ণ তখন সন্ধ্যা-সবিতার পূজা করছেন। তাছাড়া কুন্তী কর্ণের পরিচিত নন।

এ-পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। মহাভারতের কুন্তী যত সহজে এবং নিঃসংকোচে কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত বলতে পেরেছেন, রবীন্দ্রনাথের কুন্তী তা পারেন না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের মানুষ। এত বড়ো কলঙ্কের ব্যাপারকে কোনো আধুনিক মাতাই নিজের সন্তানের কাছে বলতে পারেন না। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ বিস্তর কলাকৌশল প্রয়োগ করেছেন—সন্ধ্যার তিমির নিবিড় হয়ে না আসা পর্যন্ত কুন্তী নিজ সন্তানের নিকট নিজের লজ্জার কাহিনী বলতে পারছেন না। ধীরে-ধীরে নিজেকে এবং কর্ণকে প্রস্তুত করে নিয়ে কুন্তী রহস্য ভেদ করলেন। মহাভারতের কুন্তীর মধ্যে এ-জটিলতা নেই; সহজ সরল স্পষ্ট ভাষায় তিনি

তাঁর বক্তব্য বলতে পারলেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল আধুনিক নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সূক্ষ্ম কোমল অনুভূতি এবং সুমার্জিত রুচিবোধ কুন্তীকে লজ্জানম্রা কুণ্ঠিতা নারীতে রূপান্তরিত করেছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কুন্তী অনুতপ্তা। পরিত্যক্ত ও চিরভাগ্যহত সন্তানের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদছে। তিনি কেবল নিজ পঞ্চপুত্রের জীবনরক্ষার্থ আসেননি, তাঁর অপরাধ বোধও তাকে পীড়িত করছে। মহাভারতে এ-বোধ নেই। কৃষ্ণের দৌত্য নিষ্ফল হবার পর বিদুর যখন কুন্তীকে বললেন—কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তখন কুন্তী পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বিষ্ট কর্ণকে প্রসন্ন করবার আশায় গঙ্গাতীরে কর্ণের কাছে গেলেন।

মহাভারতে কর্ণ আজন্ম ভাগ্যহত। এমন ট্র্যাজিক চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেও ভাগ্যদোষে এক মহাবীরের জীবন বিড়ম্বিত হল। রবীন্দ্রনাথ মূলের অনুসরণে কর্ণের সত্যসন্ধতা, অন্নদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, কুন্তীর উপর দোষারোপ এবং অভিমান সবই বর্ণন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কত মহৎ, কত ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর ব্যথা, তাঁর বিষাদময়তা আমাদের তার অন্তরাত্ম করে তোলে। কুন্তীকে কর্ণ বললেন—

তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে। নাহি বাজে কানে—
যুদ্ধ-ভেরি জয়শঙ্খ। মিথ্যা মনে হয়
রণ-হিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাবো, লয়ে চলো!

কুন্তী। ওই পরপারে—
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে—
পাণ্ডুর বালুকা তটে।

কর্ণ। হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন!······
······দেবী! কহো আরবার,
আমি পুত্র তব।

জীবনে যিনি সত্যকার মাকে পেলেন না, তাঁর অন্তরাত্মার এ-কী আকুল আর্তনাদ!
কুন্তীকে প্রত্যাখ্যান করলেন কর্ণ। তাঁর গৌরব—তাঁর পালক মাতা পিতাকে নিয়ে।

মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।

কর্ণ কত মহীয়ান হয়ে উঠলেন, যখন বললেন—

যে-পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

আর তারপরে তাঁর ত্যাগবীর্যদীপ্ত—অথচ বিষাদময় মর্মভেদী কথা—

জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান
আমি রবো নিষ্ফলের হতাশের দলে।

জন্মরাত্রে ফেলে গেছো—মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী,—
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন—পরাভব 'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, তাঁর অপূর্ব কাব্য-কৌশল এবং নাটকীয় বিন্যাস কর্ণ এবং কুন্তীকে কেবল রূপান্তরিত করেনি, আধুনিক যুগোচিত করেছে।

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতা নিয়ে আলোচনা করব। উপনিষদের আখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে ৪র্থ প্রপাঠকে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান আছে। সত্যকাম তার মাতা জবালাকে বললেন—মা আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে বাস করতে চাই। আমি কোন্ গোত্রীয়? জবালা বললেন—তুমি কোন্ গোত্রীয় আমি তা জানিনে। বহুজনের পরিচর্যানিরতা আমি যৌবনে তোমাকে পেয়েছিলাম। তুমি কোন্ গোত্রের তা আমি জানিনে, তবে আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম। তুমি সত্যকাম জাবাল বলে নিজের পরিচয় দিও।

(মূল সংস্কৃত—সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত-যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি)

বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে—এ অংশের শঙ্করানুমোদিত ব্যাখ্যা এই—'আমার যৌবনকালে স্বামীর গৃহে নিরন্তর কর্মব্যস্ত থাকায় গোত্র জিজ্ঞাসার অবসর পাই নাই এবং যৌবনেই তোমার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শোকাভিভূত আমি অপরের নিকটও গোত্র জিজ্ঞাসা করি নাই।'

রবীন্দ্রনাথ এই অংশের অন্যরূপ অর্থ ক'রে 'ব্রাহ্মণ' কবিতা রচনা করেছেন।

মূলের কাহিনী তারপর এইরূপ। সত্যকাম গৌতমের নিকট গিয়ে বললেন—আমি ব্রহ্মচর্য বাস করব। গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন্ গোত্রীয়। সত্যকাম বললেন—আমি কোন্ গোত্রীয় জানিনে, মাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন—বহ্বহং চরন্তী…ইত্যাদি। সুতরাং মহাশয়, আমি সত্যকাম জাবাল। গৌতম তখন বললেন—এরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। হে সোম্য, সমিধ-আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করব। কারণ তুমি সত্য হতে ভ্রষ্ট হও নাই।

শঙ্করানুমোদিত ব্যাখ্যাকে অনুসরণ না করে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে একটু জটিল করে তুলেছেন সত্য, কিন্তু তাতে কাহিনীর যে মূল দার্শনিক তত্ত্ব—সত্যই একমাত্র বস্তু এবং তাই মানুষকে ব্রাহ্মণ করে তোলে, তা উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া এই পরিবর্তনের জন্যই উপাখ্যান বর্ণনায় নাটকীয়ত্ব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আশ্রমের ভাবগম্ভীর পরিবেশটি ভাষা এবং বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধপুরাণ এবং জাতকের কাহিনীকে অবলম্বন করেও নাটক এবং কবিতা রচনা করেছেন।

আমরা এর কয়েকটির আলোচনা করব।

'মালিনী' নাটকের মূল কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের মহাবস্তুবদান অধ্যায় থেকে গৃহীত। মূল কাহিনীটি এইরূপ—এক প্রত্যেক বুদ্ধ বারাণসীতে ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। ভিক্ষা না পেয়ে যখন তিনি ফিরে আসছেন তখন এক বালিকা তাকে সেবা করল। তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপর বালিকাটি একটি স্তূপ রচনা করে মাল্য এবং গন্ধের দ্বারা তাকে সজ্জিত রাখত। বালিকা প্রার্থনা করত পরজন্মে যেন সে পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরজন্মে সে মাল্যচিহ্ন শোভিত হয়ে বারাণসীরাজ কৃকির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করল। তার নাম হল মালিনী।

একদিন মালিনী কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দকে ভোজ্য দ্বারা তৃপ্ত করল। এতে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা রাজাকে দিয়ে মালিনীর নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা করালেন। মালিনী এক সপ্তাহের সময় চাইলেন এবং এরই মধ্যে মালিনীর ভ্রাতাগণ রাজ্যের সেনাপতি এবং নাগরিকগণ সকলেই মালিনীকে তাঁদের আধ্যাত্মিক ত্রাতারূপে স্বীকার করে আর্যধর্ম গ্রহণ করল। তারা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযান করল। ব্রাহ্মণরা ভীত হয়ে রাজার শরণ নিলেন। মালিনীর নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সমস্ত ঘটনার মূল স্বরূপ কাশ্যপকে হত্যা করতে সৈন্য পাঠাল। সেই সৈন্যরা এবং অন্য অনেকে আর্যধর্মে দীক্ষিত হল। ব্রাহ্মণরা তখন নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাশ্যপের আশ্রমের দিকে যাত্রা করল। কাশ্যপ পৃথ্বীদেবীকে আবাহন করলেন। পৃথ্বীদেবী একটি তালগাছ উন্মূলিত করে ব্রাহ্মণদের পিষে মারলেন।

মালিনী নাটকে মালিনী কাশীরাজকন্যা। সে কাশ্যপের কাছ থেকে নতুন ধর্মগ্রহণ করেছে। ব্রাহ্মণগণ এতে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে দিয়ে তার নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা করিয়েছে। তাতে রাজ্যের বহু লোক মালিনীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মূল থেকে এইটুকু মাত্র নিয়েছেন।

এ নাটকের ভাব-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলীর মালিনীর সূচনায় বলেছেন, "আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্রনির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিচলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।...সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্ম-জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে এই ভাবকেই রূপ দিয়েছেন। এ নাটক-রচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করেছেন, "এমন সময়ে স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটু বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তার কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে। ...অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হ'ল।"

স্বপ্ন থেকে পাওয়া এই দুই বন্ধু—সুপ্রিয় এবং ক্ষেমঙ্কররূপে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। মূলে ব্রাহ্মণদের বিরোধের

কথা আছে। এই দুই বন্ধুই নাটকে ব্রাহ্মণদের নেতা। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় অকৃত্রিম বন্ধু, কিন্তু দুজনের প্রকৃতি বিভিন্ন। ক্ষেমঙ্কর প্রাণবান, প্রবল; সুপ্রিয় কোমল, অনুভূতিপ্রবণ। ক্ষেমঙ্কর যখন সৈন্যসংগ্রহে গেল তখন সুপ্রিয় ধীরে ধীরে মালিনীর প্রতি এবং তার নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। মালিনীর প্রতি প্রেমের ফলে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সুপ্রিয় রাজার কাছে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল। ক্ষেমঙ্কর দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হল এবং মৃত্যুর পূর্বে বন্ধুকে দেখতে ইচ্ছা করল। সুপ্রিয় কাছে এলে দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথার বিনিময় হল তাও দুজনের প্রকৃতিরই অনুরূপ। বন্ধুত্বের অকৃত্রিমতায় ক্ষেমঙ্করের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করুক। এই জন্যেই ক্ষেমঙ্কর হাতের শিকল দিয়ে সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত করে তাকে হত্যা করল। রাজা ক্ষেমঙ্করের হত্যাদণ্ডের আদেশ দিলেন, কিন্তু মালিনীর একান্ত অনুরোধে ক্ষেমঙ্কর মুক্ত হল। ক্ষেমঙ্করের মুক্তিদানে মালিনীর এই অভিপ্রায় হয়তো ছিল ক্ষেমঙ্কর অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে বন্ধুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুক। নাটকের আখ্যান এই।

মূলের কাশ্যপ-হত্যার চেষ্টা এবং পৃথ্বীর তালগাছ উন্মূলিত করে ব্রহ্মাণধ্বংসরূপ অলৌকিক ঘটনা নাটকে নেই।

এ নাটকের তিনটি চরিত্র। ক্ষেমঙ্কর, সুপ্রিয় এবং মালিনী প্রধান। মালিনীকে কেন্দ্র করেই নাটকের গতি এবং ট্র্যাজিক পরিণতি। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও আদর্শের বিরোধে যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে সুপ্রিয়-হত্যায় তার শোচনীয় ও মর্মন্তুদ পরিণতি। মূলে যে ভাবটি একেবারে অনুপস্থিত রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের সেই মূলনীতি—প্রেম-মৈত্রী-অহিংসার তত্ত্ব—ক্ষেমঙ্করের মুক্তি দ্বারা প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

এ নাট্যরূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অসামান্য এবং এর নাট্যরূপ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—"মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।"

'রাজা' নাটকের মূল কুশ জাতক। কাহিনীটি এইরূপ: মল্লরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ। তিনি প্রজ্ঞাবান কিন্তু কুরূপ। মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতী অপূর্ব সুন্দরী। কুশের সঙ্গে তার বিবাহ হল। কুশের মাতা স্বামী স্ত্রীকে দিনের বেলায় দেখা করতে দিতেন না যদি প্রভাবতী স্বামীর কুরূপ দেখে তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু আটকে রাখা গেল না। দেখা হল। প্রভাবতী স্বামীর কুরূপ দেখে তাকে ত্যাগ করে পিত্রালয়ে চলে গেল। কুশ শ্বশুরগৃহে নীচবৃত্তি করতে গেলেন এবং সেখানে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত থেকে শ্বশুরকে উদ্ধার করে পত্নী-প্রেম লাভ করলেন।

মূল কাহিনীর প্রভাবতী রাজা নাটকে সুদর্শনা। রাজা নাটকেও রানী রাজাকে দিনের বেলা দেখতে পান না। প্রভাবতী স্বামীর কুরূপ দেখে চলে যায়; রাজা নাটকেও রানী সুদর্শনা অগ্নিকাণ্ডের সময় মুহূর্তের জন্য রাজার ভীষণ কুরূপ দেখে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। বহু রাজা তার পাণিপ্রার্থী হলেন।...সর্বশেষে রাজার সঙ্গে তার মিলন ঘটল। মূল কাহিনীর সঙ্গে এই যোগ আছে।

ক্ষুদ্র কুশজাতকের ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজা নাটকের রূপ দিয়েছেন। কিন্তু মূল থেকে তা একেবারে আলাদা হয়ে গেছে—কেবল রূপায়ণে নয়, তত্ত্বেও। প্রভাবতী স্বামীর বাইরের রূপটাই দেখেছিল, তার অন্তরের রূপ দেখল যেদিন তার স্বামী তার পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত থেকে শ্বশুরকে উদ্ধার করেছিল। স্বামীর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা বোধ জাগল তার থেকেই স্বামীর প্রতি প্রেমের সঞ্চার হল। তার চোখে স্বামী সুন্দর হয়ে উঠল।

রাজা নাটকে রানী সুদর্শনা দিনের আলোতে রাজাকে দেখতে চান। তার আকাজ্ক্ষা রাজার রূপের জন্য। এই প্রলোভনেই তিনি ছদ্মবেশধারী সুবর্ণকে রাজা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সত্যই যেদিন রাজার বাইরের রূপ দেখলেন, সেদিন ভয়ে-ঘৃণায় তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে তার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল। দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়ে রানী সত্যদৃষ্টি লাভ করলেন। এই সত্যদৃষ্টি প্রেমের দৃষ্টি। রাজার সঙ্গে তার মিলন ঘটল। প্রেম-দৃষ্টি ছাড়া অন্তর্লোকের, অন্ধকারের রূপ জানা যায় না। সুদর্শনার এই দৃষ্টি ছিল না বলেই তিনি রাজাকে আলোতে দেখতে চেয়েছিলেন। এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় পূর্বে আভাসিত। রাজা নাটকে বাইরের জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রয়াণ। এ প্রয়াণ আধ্যাত্মিক এবং প্রয়াণপথের একমাত্র সম্বল প্রেম।

নাটকের সর্বশেষে রাজার সঙ্গে রানীর মিলন ঘটল রাত্রিশেষে—সূর্য তখন উঠেছে। এ সূর্য-ওঠা সংকেতময়। রানীর অন্তরে যে অবিদ্যা ছিল প্রায়শ্চিত্ত ও দুঃখের তপস্যার দ্বারা তা দূর হয়ে গেছে। সূর্যালোক সেখানে প্রবেশ করেছে। এ সূর্যালোক প্রেম। দুঃখের ভিতর দিয়েই আমরা ভগবানকে পাই যখন প্রেমালোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। রানীর কাছে রাজা আজ তাই অনুপম।

রাজা নাটকের তত্ত্বই আরো বিশ্লেষিত হয়েছে শাপমোচন কবিতা এবং শাপমোচন নৃত্যনাট্যে। নাটকের নায়ক-নায়িকা সেখানে বদলে গেছেন।

তালভঙ্গের অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করতে গন্ধর্ব সৌরসেন কুশ্রী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন গান্ধার রাজগৃহে। তার নাম হল অরুণেশ্বর। তার স্ত্রী মধুশ্রী স্বামীর প্রায়শ্চিত্তের অর্ধভাগিনী হতে কমলিকা নামে মদ্ররাজকন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। অরুণেশ্বরের সঙ্গে কমলিকার বিবাহ হল, কিন্তু 'নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূ সমাগম'; বধূ তাতে সুখী নয়। অরুণেশ্বর বললেন—চৈত্র সংক্রান্তির দিনে নাগকেশরের বনে সখাদের সঙ্গে তাঁর নৃত্যের দিন। রানী যেন তাকে সেখানে দেখেন।

রানী বললেন—নাচ তো দেখলাম, কিন্তু দলের মধ্যে একজন কুশ্রী কেন? রানী রসবিকৃতি সইতে পারেন না। তিনি সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রাজাকে দেখতে চাইলেন। দেখা হল। কুশ্রী রাজাকে দেখে কমলিকা রাজ-গৃহ ত্যাগ করে দূরে চলে গেলেন বনের মধ্যে যেখানে মৃগয়ার জন্য নির্জন গৃহ আছে।

তারপর বিরহের তপস্যা। 'বীণায় বাজে পরজের বিহ্বল মিড়'। কমলিকা আপন মনে বলে—ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না, আর দেরি নেই, দেরি নেই। "বীণা থামল। মহিষী থমকে দাঁড়ালো। রাজা বললে—ভয় করো না প্রিয়ে, ভয় করো না।" "কিছু ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই। মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করে রাজার মুখের কাছে ধরলেন।" এ প্রদীপ সঙ্কেতময়। এ সঙ্কেত অন্তর্লোকের উদ্ভাসনে। "পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল, 'প্রভু আমার। প্রিয় আমার। এ কী সুন্দর রূপ তোমার!' কমলিকার অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে বিরহের তপস্যায়। সে বুঝতে পেরেছে—সুন্দর-অসুন্দর নিয়েই পরিপূর্ণ জগৎ। যখন হৃদয়ে করুণা জেগে ওঠে, প্রেম জেগে ওঠে, তখনই অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে, সত্যকে দেখা যায়।

শাপমোচনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে বৌদ্ধ-আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে 'শাপমোচন' কথিকাটি রচনা করা হল।"

ক্ষুদ্র 'কুশ জাতক' কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বনাট্য রাজা রচনা করেছিলেন এবং তার রূপান্তরায়ণ করলেন শাপমোচনে। শাপমোচনে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয় দেখানো হয়েছে। সর্ববিশ্বেনিত্যবিলসিত

চিরসুন্দরের ছন্দে কোনো পতন নেই; সে পতন ঘটায় মানুষ তার অজ্ঞানতার দ্বারা। সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে বিরোধ তখনই দূর হয়ে যায় যখন সুন্দর-অসুন্দরকে একই ছন্দোবদ্ধ বলে মনে বোধ জাগে। —যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।*

'কথা ও কাহিনী'র পরিশোধ কবিতা নৃত্যনাট্য শ্যামার পূর্বরূপ। মূল কাহিনী মহাবস্তুবদান থেকে গৃহীত। কাহিনীটি এইরূপ।

তক্ষশিলাবাসী বণিক বজ্রসেন বারাণসীতে মেলায় অশ্ব বিক্রয় করতে এসেছিল। পথে তার সর্বস্ব অপহৃত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সে এক মন্দিরে চোর বলে ধৃত হয় এবং তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। নগরের শ্রেষ্ঠা বারাঙ্গনা শ্যামা তাকে তখন দেখে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে শ্যামারই ইচ্ছায় এবং তার পরিচারিকার কৌশলে শ্যামার রূপমুগ্ধ এক শ্রেষ্ঠিপুত্র বজ্রসেনের পরিবর্তে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং বজ্রসেন মুক্তি লাভ করে। বজ্রসেন তার মুক্তির জন্য শ্যামার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু নির্দোষ শ্রেষ্ঠিপুত্রের মৃত্যুর কারণ জানার পর থেকে তার মনে শান্তি ছিল না। সে একদিন শ্যামাকে গলা টিপে জলে ডুবিয়ে রেখে এলো। কিন্তু শ্যামা মরেনি। তার মা কাছে ছিল, তার চেষ্টায় সে বেঁচে উঠল এবং এক ভিক্ষুণীর সাহায্যে বজ্রসেনের কাছে প্রেম নিবেদন করল।

মূল কাহিনীতে শ্রেষ্ঠিপুত্রের প্রাণদণ্ড তার অজ্ঞাতসারে ঘটেছিল। কিন্তু 'পরিশোধ' কবিতায় এবং নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'য় শ্রেষ্ঠিপুত্র উত্তীয় শ্যামার অনুনয়ে এবং ব্যর্থ প্রেমের পরিণতিরূপেই স্বেচ্ছায় প্রাণদণ্ড গ্রহণ করেছে। মূলের সঙ্গের কবিতা এবং নৃত্যনাট্যের এইটুকু প্রভেদ।

নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীর মর্মমূলে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। কবিতায় তা এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

মূলে শ্যামার প্রতি বজ্রসেনের প্রেম নেই, কৃতজ্ঞতা আছে। কিন্তু যখন শ্রেষ্ঠিপুত্রের মৃত্যুর কারণ জানল তখন শ্যামার প্রতি তার ঘৃণা জন্মাল। নৃত্যনাট্যে বজ্রসেন শ্যামার প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু উত্তীয়ের মৃত্যু প্রেমে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। বজ্রসেনের মানসিক দ্বন্দ্ব নৃত্যনাট্যে সুস্পষ্ট। শ্যামাকে সে ঘৃণাবশত আঘাত করেছে, ত্যাগ করেছে, কিন্তু বজ্রসেন জানে শ্যামার প্রেম কত প্রাণবন্ত। প্রেমের জন্য সে কী না করতে পারে! এ প্রেমকে গ্রহণ করতে এবং শ্যামাকে ক্ষমা করতে না পারার জন্য বজ্রসেনের অনুশোচনার অন্ত নেই। বজ্রসেন চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব নৃত্যনাট্যকে আকর্ষণীয় করেছে। শ্যামা পাপী, উত্তীয়ের মৃত্যুর কারণ সে। কিন্তু তার জীবনদর্শন প্রেম ছাড়া কিছু জানে না, প্রেমের কাছে ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম কিছুই নেই। শ্যামার এই সর্বপ্লাবী প্রেম পাঠককে তার প্রতি তদাত্ম করে তোলে বৈকি। শ্যামা নাটকের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সৃষ্টি।

'চণ্ডালিকা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী-বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুল-কর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এ নাটিকার গল্পটি গৃহীত।"

"গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থ বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলে সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইল। মা তার জাদু বিদ্যা জানত। ···আনন্দ

* কুশজাতক কাহিনী: রবীন্দ্রজীবনী (শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়); রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ (২য় খণ্ড): (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী)।

এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর ওপর আসন গ্রহণ করলেন। প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণ বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।"

এই গল্পের সূত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' রচনা করলেন। অস্পৃশ্যা চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির হাত থেকে বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য জল গ্রহণ করেছেন, এতে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগল মানুষে-মানুষে এত ভেদ কেন? কেন এই পরস্পর ঘৃণা, এই বিরোধ? এ জিজ্ঞাসা চিন্তাশীল উদারহৃদয় মানবের চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

ভারতবর্ষের এ তো সনাতন সমস্যা। যুগে যুগে ভারতের মহামানবগণ এই নিদারুণ পাপ দূর করতে চেষ্টা করেছেন। চণ্ডালিকার ঘটনা যুগোচিত।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় মূল কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ অন্যরূপ দিয়ে তত্ত্ব এবং নাটকীয়ত্বে অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছেন। মন্ত্র পড়ে চণ্ডালিকা প্রকৃতির মা যখন দর্পণে আনন্দের মূর্তি দেখতে তাকে বলল, প্রকৃতি দেখতে পেল কী যন্ত্রণাই আনন্দ পাচ্ছেন, তাঁর সেইদিনকার উজ্জ্বল মূর্তি ম্লান হয়ে গেছে। এ আনন্দকে তো সে পেতে চায় না। এ কী সর্বনাশ করল তার মা, এ-কথা বলতে লাগল প্রকৃতি, যদিও তারই প্ররোচনায় তার মা এ-কাজে হাত দিয়েছিল।

ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র
এখনি এখনি এখনি।
ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই
... ...
কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল
শুভ্র সুনির্মল
সুদূর স্বর্গের আলো।
... ...
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস্ নে বীরের—
জয় হোক তাঁর—

আনন্দ প্রবেশ করলেন। প্রকৃতি আর্তকণ্ঠে বলল—

প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে
এনেছি নিচে,

ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।

প্রকৃতির মোহ ভেঙে গেছে— রূপাকর্ষণ আর নেই। আনন্দের সত্যরূপকে সে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছে। আনন্দ আশীর্বাদ করলেন—কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী। মূল কাহিনীকে অতিক্রম করে কবিমানস কত ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করছে তা এই রূপান্তরায়ণে লক্ষ্য করা যায়।

অবদান শতকের গল্প নিয়ে 'পূজারিণী' কবিতা। তার সার্থক রূপায়ণ 'নটীর পূজা' নাট্যে। নটীর পূজার নাট্যিক আবেদন হয়তো কম, কিন্তু ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের মহিমায় তাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন কবি। ধর্মকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করার সাধনা নটীর পূজায় বড়ো কথা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো কোনো কবিতায় পুরনো কাহিনীর রূপক অবলম্বন করে নতুন কাব্য ভাবনায় সজ্জিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, অহল্যার প্রতি, উর্বশী, দুই পাখি, মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কল্পনায় ধ্বংস দেবতা মহেশ্বরের নিকট জগতের প্রার্থনা :

আমারে নতুন দেহ দাও।
গাও দেব, মরণ সংগীত
পাব মোরা নূতন জীবন।

নিত্য-নূতনে-অভিসারী রবীন্দ্রমানসের পরিচয়বাহী। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় বসুন্ধরার সঙ্গে আমাদের জীবনের যে একাত্মভাব—যা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে এবং সোনার তরীর কবিতায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত— তাই আভাসিত হয়েছে। স্বর্গ-অপ্সরা উর্বশীর রূপ বর্ণনা বৈদিক যুগ থেকে নানা কবি নানা ভাবে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেহহীন সৌন্দর্যের—যাকে abstract কিংবা intellectual beauty বলা চলে—সেই ভাবনা দ্বারা উর্বশী কবিতা রচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণা হয়তো এ ভাবনায় ক্রিয়াশীল ছিল। বেদ-উপনিষদের প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবিতা সুপর্ণা সযুজা ইত্যাদি দুই পাখিতে নব কলেবর ধারণ করেছে। মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে—এই দুই কবিতায় প্রেমের অব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তির তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

দিগ্‌দর্শন
রবীন্দ্র রচনাবলী
রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ (১ম, ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী।
রবীন্দ্র জীবনী—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি ॥ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনার প্রারম্ভেই আমার ছুটি গল্প মনে পড়ে। সেবার দার্জিলিঙে চিত্তরঞ্জন ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি ক্যালকাটা রোডে বেড়াতেন, সঙ্গে অনেকে থাকতেন, নানা রকমের গল্প, শলা-পরামর্শ চলত। একদিন আমিও ছিলাম। সেদিন কথা উঠল রবীন্দ্রনাথের একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা নিয়ে। সকলেই প্রশংসা করলেন, চিত্তরঞ্জনেরও ভালো লেগেছিল। খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর চিত্তরঞ্জন বললেন, "কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কবি।" রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলাম ম্যানেজার বাবু এসে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সাহেবের থাকবার কষ্ট হচ্ছে অন্যত্র, আমার ঘরে যদি স্থান হয় তবে খুব সুবিধা হয়। ভূপেনবাবু বহু-বৎসর বিদেশ বাসের পর সত্ত দেশে ফিরেছেন, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, যুগান্তরের ভূপেন দত্ত, বিবেকানন্দের ভাই, সানন্দে সম্মতি দিলাম। ভূপেনবাবুর সঙ্গে ভাব শীঘ্রই জমে গেল, রোজই একত্রে ঘুরতাম, খাবার পর গল্প চলত, আমি রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেতাম, তিনি ঘোড়-তোলা জুতো পরে হাঁড়ির মতন পাইপ মুখে পুরে, জার্মান-মিশ্রিত বাংলা ভাষায় বিশ্বের তত্ত্ব আলোচনা করতেন। মনে পড়ে, এক গভীর রাতে তাঁর বিছানা থেকে একটা শব্দ উত্থিত হল। নিজে বুঝলাম গান, এবং তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথেরই, "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া…রী।" গান থামাবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'রবিবাবু আর এই ধরনের স্বদেশী গান-টান লেখেন?' উত্তর দিলাম, 'ঝোঁক একটু বদলেছে সন্দেহ হয়। কিন্তু ওটা কি স্বদেশী গান?' একটু মৃদু হেসে বললেন, 'আগে আমিও ভাবতাম, না—কিন্তু, একদিন রাত্রে বের্লিনে হঠাৎ গানটার noumenonটি প্রকট হল।' খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে গানটাকে phenomenon-এ পরিণত করতে ধরে বসলাম। লম্বা ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার সব কথা মনে নেই, তবে তাৎপর্যটা এই: 'তরুণী ধরুন প্রথমে, তরুণী হল ship of state—'অমল ধবল পাল' হল গিয়ে আমাদের political consciousness, feudal যুগেরই পাল-তোলা জাহাজ; তবেই, 'মন্দ মধুর হাওয়া', কিনা moderate, liberal movement এই দাঁড়াল; 'দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু'…খুব খাঁটি কথা—কে বুঝবে বলুন যে কার্ল মার্ক্স না পড়েছে!' আমি বললাম, 'কবিতার জন্য কার্ল মার্ক্সের প্রয়োজন আছে কি?' 'কে বললে নেই! পলিটিক্যাল কবিতার জন্য কার্ল মার্ক্স না হলে চলে না। আপনারা একটা মস্ত ভুল করেন, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত একজন পলিটিক্যাল জীব, যিনি কবিতার মারফত আমাদেরই কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন। একটু যদি কার্ল মার্ক্স পড়তেন মনোযোগ দিয়ে তবে রক্ষা ছিল না!' 'তা-তো হল, কিন্তু 'হাওয়া…রী' বললেন কেন?' 'রী-টা হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের টান, নববিধানের রে।' সে রাত্রে ভেবেছিলাম কার কথা সত্য—চিত্তরঞ্জনের, না ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। এই সেদিন 'আরোগ্য' নামে কবিতার বইটি এল, চিত্তরঞ্জনই ঠিক বলেছিলেন, নচেৎ রোগ-শয্যাতেও এত ভালো কবিতা বেরোয়। আবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে জন্মতিথি উৎসবে তিনি যে বাণী দিয়েছেন তাও পড়লাম…তবে কি ভূপেনবাবুই ঠিক বুঝেছেন! আজ এই সংশয়ের সমাধান করতে চেষ্টা করব। ভেবে দেখলে পলিটিক্স ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমাধানের ওপর ভারতের সংস্কৃতি নির্ভর করেছে অনেকটা।

দ্বন্দ্ব কি ভাবে ওঠে বিশ্লেষণ করা যাক। কবিত্ব যদি জীবন-ছাড়া, সমাজ-ছাড়া একটা পৃথক শক্তি হয়, যদি জীবতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যানুসারে সেটা জীবনধারণের পর যতটুকু বাকি থাকে, অর্থাৎ উদ্বৃত্তাংশের খেলা হয়, তবে এই শক্তির প্রকাশের জন্য জীবনীশক্তির মূলধনে টান পড়ে—এবং তখনই ভাগাভাগির কথা ওঠে। তার ওপর যদি জীবনটাকে স্রোতের জল না ভেবে কলসির জল ভাবি তখন সঞ্চয়ই হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান লক্ষ্য, কৃপণের মতন তাকে বজায় রাখতে চেষ্টা করি। আমি জানি এই ধরনের মতামত অনেকেই পোষণ করেন। কারণ সোজা; পাটিগণিতটাই সোজা মানুষের পক্ষে, তার ওপর আমরা দায়ভাগের বাঙালী। আবার যদি রাজনীতি অর্থে দলাদলি, পার্টি চালানো হয়, যদি বিরুদ্ধাচরণটাই রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারে প্রথম ও শেষ কথা হয় তবে কাজটা যে কোনো কবির পক্ষে শক্ত। কিন্তু রাজনীতির এই অর্থটাও সোজা, কারণ আমরা বহুকাল ধরে পরাধীন, কারণ আমরা সমাজে শাসিতই হয়ে এসেছি, কারণ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা অন্তর্শক্তির স্ফুরণ নয়, শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ, কারণ আমাদের মনে ইংরাজি বুকনি, পলিটিক্যাল চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ছাপ পড়েছে, কারণ আমরা বাঙালীরা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে কোঁদলই করি। ব্যাপারটা এই, আমাদের মানসিক ও কর্মপদ্ধতির মূল যুক্তিটা হল—হয় এটা, না হয় একেবারেই এটা নয়, অর্থাৎ যান্ত্রিক, বনামমূলক। বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জন্মস্থানে এই বনাম-কীর্তন একটু অদ্ভুত লাগে। প্রকৃতপক্ষে এটা অদ্ভুত নয় কারণ মনে মনে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, আর আমরা, যাঁরা, তিনি কবি না পলিটিশিয়ান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করি, এখনও তাতে অভিভূত আছি। এইগুলো হল কালচার ও পলিটিক্সের মধ্যেকার বিরোধের হেতু। অপর পক্ষে, কবিও মানুষ, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীব, তার স্ফুরণের জন্য চলিষ্ণু সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের আবশ্যক—অন্যদিকে, স্বাধীন মানুষই শক্তি থাকলে কবি হতে পারে, কবিতা উপভোগ করতে পারে—এই প্রকার অর্গ্যানিক ধারণা সত্যই কঠিন, এবং ইংরেজ-দ্রোহিতার চিহ্ন এক প্রকারের। কিন্তু ধারণাটি সত্য, সাধারণভাবে অতএব রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিচারেও। আমার একান্ত বিশ্বাস যে রবীন্দ্র কল্পিত ও আচরিত কবির ধর্ম ঐ প্রকারের আদিম প্রতিজ্ঞারই ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের মোদ্দা কথা হল এই যে, পরাধীন দেশে ও আবদ্ধ সমাজে জনগণের অন্তর্নিহিত সৃষ্টির চরম বিকাশ, অর্থাৎ কাব্য-রচনা, এমন কি কাব্যোপভোগও একপ্রকার অসম্ভব। আপনারা যদি বলেন যে তিনি এমন কথা কোথাও খোলাখুলি লেখেননি, তবে আমি উত্তর দেব যে তিনি রাজনীতির পাঠ্যপুস্তক লেখেননি নিশ্চয়, কিন্তু তিনি ঠিক এই কথাই তাঁর প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যাপারটা বিশদ করে বলছি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি বিদেশী ধরতাই বুলিগুলো মন থেকে প্রথমেই তাড়িয়ে দিন। যত ভুলের মূল ঐখানে, 'বনাম'-যুক্তিরও একটা গলদ ঐ। ইংলণ্ডে ব্যক্তিত্ববাদ জন্মায় একটি আবহাওয়ায়—নিউটনী মেকানিক্সের, এবং দুটি প্রয়োজনের সংযোগে। বেন্থাম, যিনি ব্যক্তিত্ববাদের জন্মদাতা—তাঁর লেখা পড়ে দেখলেই মনে হয় যেন তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নিউটনের তিনটি নিয়মের প্রয়োগ করতেই ব্যগ্র। এধারে ইংরেজ রাজা পার্লামেণ্টের হাতে ক্ষমতা না যায় দেখতে গিয়ে নিজের একটা দল খাড়া করলেন—নাম তার কিংস পার্টি। পার্লামেণ্ট সেই দল ভাঙতে চেষ্টা করল, অবশ্য রক্তকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, অথচ আইন কানুনের বাধায় মুনাফায় টান পড়ছে। এরা ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টের সভ্য হয়ে চেয়ে বসল বাধাগুলো তুলে দেওয়া হোক। অতএব

দ্বন্দ্ব বাধল স্পষ্ট দুটি দলে, একধারে রাজার দল ও যারা ডিউটি বসিয়ে তহবিল ভরতে ও জমিদারী স্বার্থ বজায় রাখতে চায়, এবং অন্যধারে পার্লামেন্টের নতুন ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সভ্য যারা বললে অবাধ বাণিজ্যে ইংরেজ আরো ধনী হবে। এই হল ইংরেজ পলিটিক্সের 'বনামে'র প্রথম দফা। শুধু এইখানে ক্ষান্ত হল না ব্যাপারটা। বণিকেরা এই সঙ্গে উপনিবেশের ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের বাজার অধিকার করে যাচ্ছিল। সেই বাজারকে বশে আনবার স্বাধীনতাকে তখন ব্যক্তিত্ববাদ বলা হল না—তখন বড়ো বেশি কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু, ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, জাপান বাজারে নেমে পড়ল, তখন তাদের ব্যক্তিত্ববাদ ইংরেজের অনুকরণে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার স্বার্থের বিপক্ষে। মুনাফা বৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতাই হল উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্ববাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। এরই নাম ইংরেজ লিবারেলিজম।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ও তাঁর যুবাবয়সে যে আন্দোলন চলছিল সেটা হল নকল লিবারেলিজম। বই পড়ে যে মতবাদ জন্মায় কিংবা যে আন্দোলন চালানো সম্ভব তার দাম কম। অনেকে বলেন যে আমরা যে সময় অনেক কিছু পড়ে ফেলি—বার্ক, মিল, বেন্থাম, কোঁৎ, যাঁদের চিন্তাধারার প্রসার কেরানী তৈরি করবার জন্য নিয়মমাত্র শিক্ষার বহির্ভূত ছিল। এক কথায় এঁদের মতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছিল। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। জমি তৈরি থাকলেই গাছপালা সতেজ হয়, নচেৎ কাচের ঘরের ফুলের চারা দেখতে মজার, কিন্তু উপকারে লাগে না। বাস্তবিকই আমাদের ঐ সময়কার আন্দোলন একটু অবাস্তবই ছিল। কি করে বাস্তব হবে! ভারতবর্ষে কিংস্ পার্টি কোথায়! অবশ্য, এক হিসেবে লাটসাহেব থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সকলেই ঐ দলের সভ্য। কিন্তু পার্থক্য আছে। ভারতবর্ষে বিলেতী ধরনের state-ও নেই গবর্নমেণ্টও নেই, আছে administration—যেটা একদল প্রবলপরাক্রম আমলাদলের হাতে—তাঁরা যা হুকুম দেবেন তাই হল গবর্নমেণ্ট। রাজা বলতে তখন লোকে কি বুঝত আপনারা অনেকে ধারণা করতে পারবেন না। আমার একটু একটু মনে আছে। রানী ভিক্টোরিয়ার ছেলের পায়ের তলায় একজন বিশিষ্ট সদ্‌ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়েন, আরেকজন মস্ত নেতা এক রাজপুত্রের কাছে ভারতবর্ষের প্রতি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হাঁটু গেড়ে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা জানান। অতএব crown-এর বিপক্ষে কোনো আপত্তিই ওঠেনি ভারতবর্ষে, কোনো কারণেই। বরঞ্চ আমরা বলতাম যে, মহারানীর প্রোক্লেমেশন মানা হচ্ছে না বলেই যা কিছু গোলমাল। সেইজন্য আন্দোলনটা চলল, বুরোক্রাসিরই বিপক্ষে। আমরা চাইলাম তাঁদেরই দলভুক্ত হতে, যেমন প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিশিয়ান হতে গিয়েছিল। অন্যধারে ভারতীয় বণিকশ্রেণীর তখনও অভ্যুদয় হয়নি, যে অবাধ বাণিজ্য চেয়ে বসবে, কিংবা জাপান, জার্মানি, আমেরিকার মতনও স্বদেশী ব্যবসা বাঁচাবার অজুহাতে প্রোটেক্‌শন নিয়ে সোরগোলটা জমাবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য দেশে, যেখানে বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল, প্রোটেক্‌শনের মারফত লিবারেলিজম আত্মপ্রকাশ করে। তাই ইংরেজি লিবারেলিজম আর কন্‌টিনেণ্টাল লিবারেলিজম এতই পৃথক। কন্‌টিনেণ্টে উদার মতের পরিণতি রাষ্ট্রে আত্মবিসর্জন, কারণ, রাষ্ট্র ভিন্ন কে দেশী ব্যবসা বাঁচাবে? ভারতবর্ষের ব্যবসা স্বতন্ত্র, কারণ ইংরেজ ব্যবসা আর দেশী ব্যবসা অহিনকুল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের লিবারেলিজম যে ঝুটো হবে সে আর বিচিত্র কি! অতএব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের এ-দেশে কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই, অর্থ নেই। থাকত, যদি সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি আমরা বুঝতাম। ঐ যুগে বুঝতে পারার সুবিধাও ছিল না অবশ্য। কিন্তু যে-সব মহারথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব

করি তাঁরা কি সত্যই এমন বড়ো ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ও-টুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়! সে যাই হোক—পূর্বোক্ত কারণে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুটি মারাত্মক দুর্বলতা এসেছিল—ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন-নিবেদনের পালা; এবং সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়নও বলতে পারেন। রাজনীতির তো ঐ দশা। সমাজ-সংস্কারও যে পাকা ভিতের ওপর ছিল তাও বলতে পারি না। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায়, অন্ন সমস্যার নিরাকরণে এমন কোনো বিপ্লব বাধেনি যার জোরে সমাজের বনেদ ভেঙে যায়। নতুন জমিদার তৈরি হয়েছে, তাঁরা নিয়মমতো রাজস্ব দিয়ে যাচ্ছেন, প্রজারা যা হয় করে দিন গুজরান করছে—নতুন ফ্যাক্টরি এত বেশি সংখ্যায় খোলা হয়নি যে তাদের আকর্ষণে গ্রামের লোক হুড়মুড় করে শহুরে হয়। অর্থাৎ যা ছিল তাই চলছিল। কিন্তু সামান্য একটু গোল বাধল ঐ নতুন শহুরে ভদ্রলোকদের জন্য। তাঁরা সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন, আইডিয়ার তাড়নায়। ইতিমধ্যে ভিক্ষার ঝুলি খালিই রইল, জনকয়েক ঝুলি ঝেড়ে দেখলেন এককুটো চালও পড়েনি। বিরক্তিটা স্বাভাবিক—তাই বিরক্তির মুখ ঘুরল প্রাচীন ভারতের দিকে—যখন ইংরেজ আসেনি। সেটা হল স্বর্ণযুগ; আমরা হলাম আর্য; আমাদের দর্শন পরিশীলন শ্রেষ্ঠ…ইত্যাদি। শিক্ষিত সম্প্রদায় দু-ভাগে বিভক্ত হলেন—তাঁদের চেঁচামেচির নাম উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তা। বলাবাহুল্য এটাও অবাস্তব, রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল বেশি—কারণ, জনসাধারণকে বাদ দিয়ে, তাদের তাগিদকে ব্যবহার না করে, সমাজ-সংস্কার করতে যাওয়ার অর্থই হল জীবনকে প্রত্যাখ্যান।

এখন রবীন্দ্রনাথ ও-সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেই দুটি কথা বললেন—ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ো, এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও। অবশ্য যে-সে সমাজ নয়, স্বদেশী সমাজ, পল্লী সমাজ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাসিত সমাজ নয়, সকল সৃষ্টির বীজক্ষেত্র সমাজ। ভিক্ষাবৃত্তির ওপর তাঁর কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জ্বলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই ধরেনি, সরকার বাহাদুরেরও সর্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবেরা extremist বলতেন। "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম", ছোট ও বড়ো, নাইটহুড পরিত্যাগের চিঠি, এমন কি সেদিনকার শান্তিনিকেতনের বক্তৃতা পড়ে সাহেবদের মনে তাঁর প্রতি অনুরাগ না আসাটাই স্বাভাবিক। এ পোড়া দেশে ভিখিরীদেরই খাতির হয়। কিন্তু এইখানে দুটি জিনিস স্মরণ রাখা উচিত। ১৯০৫ সালের পর থেকে দেশে যে extremism শুরু হয়, তার এক মুখ ছিল ধ্বংসের দিকে, অন্য মুখ ছিল গোঁড়ামির দিকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ কোনোটাই তাঁর সমাজ-ধর্মের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেন আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে, "গোরা", "ঘরে বাইরে" থেকে "চার অধ্যায়" পর্যন্ত বিস্তর রচনায় তার প্রমাণ পাবেন। যেটার প্রমাণ সহজে মিলবে না সেটা তাঁর কর্মের। কিন্তু যাঁরা তাঁর কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে শান্তিনিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায়-সমিতি, পাঠশালা-হাসপাতাল খোলা, পুকুর কাটানো, গাছ বসানো, পল্লীসংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান—তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল এই—ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায়, জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যা ভান ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশকে জানতেন, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ ছিল না, যেমন শরৎচন্দ্রেরও ছিল না। কিন্তু তিনি কখনও হতাশও হননি। তা ছাড়া, কি জানি কেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে বরাবরই বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন যে, এই ভূ-খণ্ডে

নানা জাত এসে বসবাস করেছে, মিলেজুলে একটা সভ্যতাও খাড়া করেছে, তার ভালো খানিকটা মন্দ খানিকটা, ফলে সেই সঙ্গে সে সভ্যতার একটা বিশেষ রূপও ফুটেছে, যে রূপ গ্রামের সমবেত জীবনে, জীবনের ত্যাগে ও অধ্যাত্মবোধের প্রাধান্যে ধরা পড়ে। আজ সে-রূপ নেই অবশ্য, কিন্তু নতুন জীবন এলে সে রূপে জলুস খুলবে। রবীন্দ্রনাথ সে প্রক্রিয়ার মানসিক সাধনারও ইঙ্গিত দিয়েছেন—বিজ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি। চরখা চালানো ছাড়া প্রক্রিয়ার অধুনা প্রচারের অন্য সব অঙ্গেরই নির্দেশ আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও কর্মে। তাই আবার বলি, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলজফির কোটরে ঢোকে না। সেখানে রাষ্ট্র আছে, তাই স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক…অধিকার-সর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্মী। এই হিসেবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী—কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরনের—অতএব, তিনি ঢের বেশি রিয়ালিস্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিস্ট কথাটির অনুবাদই করে, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে সামাজিকতার প্রাধান্য থাকলে কি হয়! ভাগ্যচক্রের ঘোরে সে এসে পড়ল এমন একটা প্রাঙ্গণে যেখানে ন্যাশনালিজমের নামে রাষ্ট্রদৈত্যের পূজা অহরহ চলছে। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথের Nationalism নামে বইখানি আবার পড়তে অনুরোধ করছি। ফ্যাশিজমের জন্মতারিখের বহু পূর্বে লেখা। আজকাল যাকে totalitarianism বলা হয়, তারই পূর্বাভাষ, statism-এরই বিপক্ষে প্রতিবাদ ঐ বইখানিতে পাবেন। অবশ্য ইকনমিক ব্যাখ্যা নেই তাতে, কিন্তু তাতে প্রতিবাদের তীব্রতা কমেনি তিলমাত্র। বই-খানি বেশি জনপ্রিয় হয়নি, দেশোয়ালীরা ভাবলে তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন, এবং বিদেশীরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটে বাইরে ঠোঁক বেঁকিয়ে বললেন, স্বপ্ন-বিলাস। এখন তাঁরা বুঝছেন স্বপ্ন-বিলাস কি আর কিছু! সে যাই হোক—রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ-দেশে রাষ্ট্র-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, এটা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এই সেদিনও যে সাম্রাজ্যবাদের কুফল দেখালেন তারও সংযোগ ঐ statism-এর সম্বন্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ায় রয়েছে ঐ রাষ্ট্রবাদ—সেটি কোনো একটি বিশেষ জাতির একচেটে সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ তাঁর মতে একই বস্তু, অর্থাৎ লোভের এ-পিঠ ও-পিঠ। আত্মসম্মানবোধে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এই লোভের প্রকৃতি কি? উত্তরের ভাষা রুচিসাপেক্ষ। মানুষের দিক থেকে প্রকৃতিটা মানসিক, মানুষ বাদ দিলে প্রকৃতিটা ইকনমিক। মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে যার কারবার, সে বলবে লোভের জন্যই যত অত্যাচার। যে আবার ইতিহাসের রীতিনীতি খুঁজতে ও কাজে লাগাতে ব্যগ্র তার মতে অত্যাচার ধনোৎ-পাদন ও তার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত, অতএব মানুষের দোষ কই যখন মানুষের প্রবৃত্তি ঐ সব পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানেরই প্রতিবিম্ব। প্রথম দল অত্যাচারে নিঃশেষ করবার আত্মশক্তি, চিত্তশুদ্ধির ওপর জোর দেন, দ্বিতীয় দল বলেন নির্যাতিত শ্রেণীকে বিপ্লবী করে তোলো। এটা কর্তব্যের ভাগ, উদ্দেশ্য এক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনুষ্যধর্মেরই নামে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিনিপাত বলে অভিসম্পাত করেছেন। সেই হিসেবে তিনি স্বধর্মই পালন করেছেন। অতএব চিত্তরঞ্জনের মতে অনেকটা সত্য পাচ্ছি। অন্য-দিকে, জীবনের সমগ্রতা সাধনই কবির ধর্মতত্ত্ব। পরাধীন, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, ভিক্ষাজীবীর শ্রেণী যদি ভারতীয় সমাজ-বহির্ভূত না হয়, যদি তাদের প্রানবান করা না পর্যন্ত ধর্মসাধনা অপূর্ণ থাকে, যদি

তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আনা পলিটিক্‌সের প্রাণবস্তু হয়, তবে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ পলিটিশিয়ান—যেমন ভূপেন দত্ত দার্জিলিঙে আমাকে বলেছিলেন।

আমি একটি প্রশ্ন তুলে আমার বক্তৃতা শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ যে কবি সকলেই স্বীকার করেছেন, পলিটিক্‌স্‌ ও সমাজনীতিতে তাঁর দান মূল্যবান অনেকেই এই কানাঘুষো শুনেছেন—তাঁর দু-চারটে স্বদেশী গানও আপনাদের জানা আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বজ্রকণ্ঠে বলতে পারেন "আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা" তাঁকে অভিধানে কি বলে? আমার অভিধানে বলে মহামানব। নতুন জগতে তিনি যদি সাধারণ মানুষ বলেই অভিহিত হন, তবে তিনি Saint Simon-এর মতনই বলবেন, "খুশি হলুম, খুশি হলুম, এরই জন্যে বসেছিলাম।"

[প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ॥ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত শিল্পী। শিল্পীর চোখেই তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। মহৎ শিল্পীর জীবনবোধে জীবনের বিচিত্র রূপ নানা বর্ণে, গন্ধে, রূপে ও রসে, অথচ এক অখণ্ড সামগ্রিকতায় বিধৃত। রবীন্দ্রশিল্পেও এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ। মহৎ শিল্পী এক অর্থে তত্ত্বজ্ঞানী। তবে শিল্পীর তত্ত্বজ্ঞানে তর্ক অপ্রধান, সাক্ষাৎ প্রতীতি অর্থাৎ দর্শনই সেখানে মুখ্য। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ যখন কোনো বিষয় নিয়ে মনন করেছেন, তখন তত্ত্ব শুষ্ককাঠিন্যের আবরণমুক্ত হয়ে শিল্পীমানসের রসসিঞ্চনে অপূর্ববস্তু হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মনীষার একটি বিশিষ্ট দিক তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব। দেশের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন, সভাসমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ ও অন্যান্য তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষার বিস্তৃত কর্মসূচীও স্থির হয়। এ-সব ইতিহাসের কথা।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা দেশকালের দ্বারা সীমিত। শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক কিংবা দার্শনিক মৌল প্রত্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেননি। কাজেই যে অর্থে প্লেটো, কোমেনিয়াস্, পেস্টালোৎসি হার্বার্ট কিংবা ফ্রোবেল শিক্ষাতাত্ত্বিক সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাতাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়তো অসমীচীন। এবং এ-কথাও সত্য যে লক, রুশো, হেগেল, হিউম্, এমন কি জেমস্, ডিউয়ি ও হোয়াইটহেড্ যে পরিমাণে শিক্ষার মৌল তত্ত্বগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ সে পরিমাণ আলোচনা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব শুধুই পুঁথিগত নয়, শিল্পীর অভিজ্ঞতাপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ও শিল্পীমানসের ইতিহাস যে তাঁর শিক্ষাভাবনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। আবাল্য উপনিষদের রসে পুষ্ট কবি নিজে ছিলেন স্কুল-পলাতক ছেলে। এবং এ-কথাও স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ অনেক শিক্ষাভাবুকের মতো নিঃসন্তান ছিলেন না। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ হতচেতন জাতির চারণকবি এবং তাঁর শিক্ষাভাবনাও জাতিকে জাগ্রত করার জন্যেই পরিকল্পিত।

দুই

রবীন্দ্রনাথের সময় যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল এবং আজও যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, তার সূত্রপাত উনিশ শতকের প্রথমভাগে। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভারতীয়, বিশেষ করে ইওরোপীয় মিশনারিদের উৎসাহ ও চেষ্টায় এই শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত। অনেকের ধারণা, এই নূতন ব্যবস্থা পত্তন হবার আগে এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর ছিল। উনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষা' বিষয়ক পুস্তকে দেখা যায় যে এই নূতন ব্যবস্থার যখন সূত্রপাত হল তখনও এদেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। জনশিক্ষার আয়োজন পর্যাপ্ত না হলেও সেই সময় গ্রামে গ্রামে পাঠশালায় শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করত। উচ্চশিক্ষার চর্চা সেই যুগে মক্তব, মাদ্রাসায় হত। শিক্ষণীয় বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে এখনকার বিচারে তৎকালীন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে খোঁটা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। তবুও সে যুগের সামাজিক দাবি

ও প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা যে অপ্রতুল ছিল এ-কথা বলা চলে না। এবং প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গ্রামীণ। পল্লীসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ফলে দেশের চিত্ত-ভূমিকে সিক্ত করেই শিক্ষার ধারা সার্থক হত, বিদ্যাশিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তখনও অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট হয়ে ওঠেনি। কোম্পানির আমলের প্রথম যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আন্দোলন দেখা দেয়। সেই আন্দোলনের নেতাদের মত ছিল যে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচলন করতে হবে, তবেই দেশের পরমপুরুষার্থ। ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেশকে নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত করতে হলে দেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ইংরাজির অনুশীলন না করলে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত হবে না, দেশের জড়ত্বও ঘুচবে না। প্রশ্ন হবে, শিক্ষার আয়োজন কাদের জন্য? আপামর জনসাধারণের শিক্ষাই কি দেশগঠনের প্রধান কথা? অথবা শিক্ষার আয়োজন প্রথমে শুধু উচ্চবর্ণের সন্তানদের জন্য করতে হবে? সে আমলের নেতাদের ধারণা ছিল যে (এবং এই ধারণার রেশ আজও আছে) শিক্ষা দিতে হলে প্রথমে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষিত করতে হবে। এরা শিক্ষালাভ করলে ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে পড়বে। ফিল্টারে যেমন উপরের কলসি থেকে চুঁইয়ে জল ক্রমশ নিচের কলসিতে গিয়ে পড়ে তেমনি শিক্ষার আলো ক্রমশ উচ্চবর্ণ থেকে সমাজের তলায় ছড়িয়ে পড়বে (Filtration theory), এবং সমগ্র দেশ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এই সব মতবাদের ত্রুটি সম্পর্কে সেকালে অনেকেই অবহিত ছিলেন। তবুও সেদিন মেকলে-র নীতিরই জয় হল। ফলে জনশিক্ষার কর্তব্য ক্রমশই গেল নেপথ্যে। 'শিক্ষিত' শব্দটির নূতন সংজ্ঞা হল 'ইংরেজি-শিক্ষিত'। শিক্ষার ভোজে আপামর সাধারণ অনিমন্ত্রিত রয়ে গেল। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে কোনোক্রমে টিকে রইল।

১৮৩৫ থেকে কংগ্রেসের আবির্ভাব পর্যন্ত (১৮৮৫) ইংরাজি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের যুগ। ১৮৩৫-৫৪—এ সময়ে সরকারী দাক্ষিণ্য শুধু জিলা স্কুল ও কলেজের জন্য বর্ষিত হল। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হবে। ফলে উচ্চবর্ণের ইংরাজি শেখবার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। শিশুরা শৈশব অবস্থা থেকেই ইংরাজি বর্ণপরিচয় আরম্ভ করল। ইংরাজি শিখলে চাকুরি হয়, এই কারণে লোকে ইংরাজি শিখতে লাগল। জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার আগ্রহ ক্রমশ অন্তর্হিত হল। ইংরাজি শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা অর্থকরী বৃত্তিশিক্ষায় পরিণত হল। একদিকে যখন এই উচ্চশিক্ষার হিড়িক, অন্যদিকে তখন প্রাথমিক শিক্ষা ও জনশিক্ষার অন্তিম দশা। Filtration theory-র দৌলতে জাতি দ্বিধাবিভক্ত হল, একদিকে রইল ইংরাজি শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষ, অন্যদিকে অগণিত অশিক্ষিত সাধারণ।

উচ্চশিক্ষার এই হিড়িকের যুগে, নূতন শিক্ষাব্যবস্থায়, মধ্য ও উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষার ও পরীক্ষার বাহন হল ইংরাজি। এবং চাকুরি যেখানে মুখ্য সেখানে পরীক্ষা ও পরীক্ষা-পাসের প্রাধান্যও অবধারিত। অতএব, পরীক্ষা পাসের তাগিদে সেই আমল থেকেই মুখস্থ-বিদ্যা, নোটস্‌, বোধিনী, প্রভৃতিরও আবির্ভাব।

ব্রিটিশ শাসকেরা এ দেশের চিত্তভূমিকে সরস করবার জন্য নূতন শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেননি। ঐতিহাসিকেরা এ কথা বলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নেহাতই সীমাবদ্ধ। ইংরাজি শিখে ভারতবর্ষের মানুষ ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণযন্ত্রের সামান্য কর্মী হবে, মুখ্যত কেরানিগিরি, এবং গৌণত অন্যান্য বৃত্তিতে প্রবেশ করবে—এর বেশি আর কিছু শাসকদের চিন্তায় ছিল না। ফলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রথমাবধি নেহাতই পুঁথিগত।

এ-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো আয়োজন ছিল না, বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না। অথচ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী, বৃত্তিজীবী অর্থাৎ কর্মী। উৎপাদনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, হাতে-কলমে তাঁদের কাজ। পুঁথির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কম, ইংরাজির সঙ্গে সম্পর্ক তো তাঁদের নেই বললেই চলে। কাজেই এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অধিকাংশের শিক্ষা ব্যবহারিক ধরনের হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কর্মের সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো শিক্ষার শেষ কথা নয়। তবুও শিক্ষার উপকরণ মূল্য যদি কিছু থেকে থাকে তবে সে মূল্য একান্তই ব্যবহারিক। বিদেশী আমলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই ব্যবহারিক শিক্ষার বিশেষ কোনো স্থান ছিল না।

উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৩) অবশ্য বৃত্তিশিক্ষার উল্লেখ ছিল। কিন্তু সে বৃত্তি শুধুই উচ্চবর্ণের। আইন কিংবা চিকিৎসা কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং—এসবই ভদ্রলোকের বৃত্তি। এবং এসব ইংরাজি-নির্ভর বৃত্তিশিক্ষার লক্ষ্যই ছিল চাকুরি—জ্ঞানান্বেষণও নয়, দেশগঠনও নয়। এবং সে যুগে ঐতিহাসিক কারণে বোধ হয় এর অন্যথা হবার উপায়ও ছিল না। দেশের পুরনো শিল্পবাণিজ্য তখন মৃতপ্রায়। নূতন শিল্পবাণিজ্য বিদেশীর করতলগত। দেশের কৃষিব্যবস্থা ক্রমক্ষয়িষ্ণু। এ-হেন অবস্থায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের চাকুরিই ছিল একমাত্র ভরসা। অন্যান্য শ্রেণী তখনও ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বহুদূরে। অধ্যাপক অনাথনাথ বসু এ-যুগের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"যখন ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আমরা হয় সরকারী চাকুরি করিবার, না হয় বিলাতের বাজারে কাঁচামাল জোগাইবার ও এদেশে বিলাতী মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় বিলাতী হৌস ছিল তাহাতে কেরানিগিরি করিবার চেষ্টায় ফিরিলাম; বড় জোর এই সব হৌসে দালালি করিয়া 'ব্যবসায় করিতেছি' এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। উচ্চশিক্ষা লাভের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর বেশি কিছু হইল না।"

দেশের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনোভাব অনেক দিন হতেই সৃষ্টি হচ্ছিল। কার্জনী আমলে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবাহ কূলপ্লাবী হয়ে ওঠে, সেই আন্দোলনে শিক্ষাসংস্কারের প্রশ্নও ওঠে। তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের বিচার ঐতিহাসিকেরা করবেন। তবে তৎকালীন শিক্ষা-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে রবীন্দ্রনাথের স্থান। এবং রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থারই অন্যতম তাত্ত্বিক।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে আধুনিক শিক্ষার বড়ো সমস্যাটি কি? তবে নিশ্চয়ই উত্তর হবে, বিদেশী শাসনে কি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে, কি আয়োজনের দিক দিয়ে, এ দেশে "জাতীয়" শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হয়নি। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও চরিত্র কেমন, এ বিষয়ে এখন আমাদের চিন্তার অস্পষ্টতা হয়তো নেই। তবে স্বদেশী আমলে কবি রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সপক্ষে যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন, তার স্বচ্ছতা আজও অনাবিল।

তিন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার কেন্দ্রীয় তত্ত্ব হল :

(ক) প্রকৃতি (খ) স্বাধীনতা (গ) মানবিকতা ও বিশ্বপ্রাণতা। শিক্ষার স্বাভাবিকতার পক্ষে রুশো 'এমিলি'তে কলম ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও রুশোর মতো মনে করেছেন যে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র

রসে পূর্ণ করে নেবে, প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে-অভিনয়ে-ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় আনন্দের স্মৃতি সঞ্চয় করবে। এইটিই তো শিশুশিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। নিজের বিদ্যালয়ের ছেলেদের বলেছেন, "তোমাদের ভার তোমরা নাও।" ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কেননা তিনি মনে করেছেন যে প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে শিশুচিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে, ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঐ চিত্তে গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। এই গুরুতর অভাব যে শুধু আমাদের দেশেই আছে তা নয়। সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে "অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট" ব্যাপার করে ফেলা হচ্ছে। বিদ্যাশিক্ষাকে জীবনানুগ করবার উপায় কি? মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের পরিচয় লাভ করবার উপায়ই বা কেমন? এ প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ভাবিত, তখন তাঁর মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল; সে ছবি প্রাচীন তপোবনের। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় তা ঐতিহাসিক ভাবে কতখানি সত্য জানা নেই। তবুও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাদর্শকে মর্যাদা দিয়েছেন। কেননা তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য ছিল। "যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না।"

তাই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, "তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।"

বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, প্রকৃতির সঙ্গে তিনি একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছেন। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য, তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে তা রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন। প্রকৃতির সাহচর্যে বিদ্যার কি মার্কা হল সেটাই বড়ো কথা নয়। রুশোর মতো রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন যে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা গ্রহণ করলে চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে লাভ করা, এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের একটি মৌল প্রত্যয় এই যে প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই শিক্ষকতা লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ তপোবনের আদর্শকে অনেকখানি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের যে সাধনা সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ,

আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। অতএব তিনি মনে করেছেন যে ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বোধের শিক্ষা। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষাও নয়। অথবা কেবল কারখানার দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করাও নয়। এবং এই বোধের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেকখানি সার্থক হতে পারে।

(খ) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল যে আমরা যাকে বলি 'ইস্কুল' সেটি একটি যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ছেলেদের মানুষ করে তোলা সম্ভব নয়।

শিক্ষাবস্তুটা প্রণিধান। অথচ ইস্কুলের ও কলেজের কারখানা ঘরে আমরা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টার নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীই শুধু প্রত্যক্ষ করি। এই ব্যবস্থায় মানুষের মন পীড়িত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে বিদেশী বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের মন খাটছে না। কেননা এই শিক্ষা প্রণালীতে কলের অংশ বেশি। এ তো বিদেশীর ফরমাশ অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন। তারপর শৈশব ও কৈশোর থেকেই শিশুমনের উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ ও মুখস্থ-বিদ্যার শিলাবর্ষণ হতে থাকে। ফলে এ মন পুষ্টিলাভ করে না, সৃষ্টিকার্য চর্চার জন্য উপকরণ সংগ্রহে অকৃতকার্য হয়ে পড়ে। স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধির অবাধ প্রকাশ যদি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হয়, তবে এ শিক্ষাপ্রণালীতে যে এই লক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করে না, সে-কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। "আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই।"

বিদেশী কর্তৃপক্ষ শিক্ষার স্বাধীনতা নানাভাবে খর্ব করবার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাকে তাঁরা শাসন বিভাগের আপিসভুক্ত করতে চেয়েছেন। "এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেকটরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাকমিলান কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র, এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালীর ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।"

শুধু তাই নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয় তার চেয়ে পাক বাড়াবার চেষ্টা কর্তৃপক্ষ করেছেন। উদ্দেশ্য, শিক্ষার স্বাধীনতা খর্ব করে দেশকে নিঃসত্ত্ব কাপুরুষ করে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সংস্কারের অন্যতম পথ হিসাবে তাই দাবি করেছিলেন, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চাই—শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ভার জাতির প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত করা চাই।

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য।"

"অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মুক্তবুদ্ধি, জিজ্ঞাসু, কর্মী মানুষ তৈরি করবার প্রণালীর অন্যতম অন্তরায় ছিল নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজির

একাধিপত্য। শুধু কাঠামোতে নয়, পাঠ্যসূচীতে, চিন্তায়, ভাবনায়, পরীক্ষা-গ্রহণে—সর্বত্রই বিদেশী ভাষার অপ্রতিহত প্রভাব। ফলে এদেশে লোকশিক্ষার দায়িত্ব সর্বদা অবহেলিত, পূর্ণ মনুষ্যত্ব-উদ্বোধের প্রেক্ষিতে বিদেশী শিক্ষা একেবারেই ব্যর্থ। নানা নিবন্ধে ও ভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে বিদেশী-প্রবর্তিত নীরস শিক্ষায় আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হয়ে গেছে। আমরা বাল্য থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করেছি কেবল কতকগুলি কথার বোঝা টেনে। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে আমরা শুধুই মজুরি করে মরেছি; মেরুদণ্ড আমাদের বেঁকে গেছে এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এই শিক্ষা-প্রণালীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতার ও জীবনের নিবিড় মিলনের পথ কি? বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যই এই মিলন সাধন করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে বুঝেছেন যে দেশের মনকে কোনোমতেই পরের ভাষায় মানুষ করা সম্ভবপর নয়। সে কাজ সম্ভবপর মাতৃভাষার সাহায্যে। প্রাচীন বিদ্যার মূল্যায়ণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রাচীন কালের বিদ্যাটা অন্তত সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব হয়ে বইত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষী, কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক, সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেঁচ পেত। কিন্তু, ইংরাজি-নির্ভর বিলাতি বিদ্যাটা আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী কোনোদিনই হল না। এর কারণ এই নয় যে জিনিসটা বিদেশী। রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বিদ্যার বিরোধী নন, আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচীন টোল চতুষ্পাঠীর যুগে প্রত্যাবর্তনও তাঁর অভিপ্রেত নয়। কিন্তু যে সত্য তিনি বারংবার ঘোষণা করেছেন তা এই যে, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায়নি, তার ফলেই যত কিছু বিপত্তি। মাতৃভাষায় শিক্ষার অভাবে সর্বজনীন শিক্ষার দাবি অগ্রাহ্য হল। ফলে যে সর্বজনীন শিক্ষা উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাবে তার বনিয়াদ কাঁচা হয়েই রইল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো উপকরণ-বাহুল্য সঞ্চিত হল, বিভিন্ন কায়দা আয়ত্ত হল। কিন্তু শিক্ষা অনেকখানিই অন্তঃসারশূন্য হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বলেছেন যে, শিক্ষার ভোজে আপামর সাধারণকে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে। শহুরে উচ্চবর্ণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার আয়োজন দেশ গঠনের গোড়ার কথা। এবং সার্বিক বিদ্যা বিস্তারের সাফল্য নির্ভর করবে মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃতি দিলে। শিক্ষার স্বাধীনতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার আহ্বান জানিয়েছেন। গভীর দুঃখে বলেছেন—"আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।"

(গ) রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির রেশ তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে সুস্পষ্ট। অধুনা সব সভ্য রাষ্ট্রেরই অভিমত এই যে শিক্ষা বিশেষভাবে কাম্য। জিজ্ঞাসা এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? অনেকের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সৎ-মানুষ সৃষ্টি। আবার অন্য অনেকের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সু-নাগরিক সৃষ্টি। হেগেল-পন্থী সর্বগ্রাসী মতবাদে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা বলবেন, সৎব্যক্তি ও সুনাগরিকের মধ্যে তো কোনো বৈপরীত্য নেই কেননা সৎ-ব্যক্তি তো তিনি যাঁর সকল ভাবনা ও কর্ম সমষ্টির স্বার্থে অনুপ্রাণিত। ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি,—এদের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন তাই ওঠে না। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় যে এই দুই মতবাদ থেকে যে শিক্ষাপ্রণালীর উৎপত্তি, তাদের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। ব্যক্তিসত্তাকে যাঁরা মুখ্য মনে করেন তাঁরা শিশুকে দেখবেন স্বকীয়তার পটভূমিতে। অন্য মতবাদে যাঁদের আস্থা, তাঁরা ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবেই শিশুকে গড়ে-পিটে নেবার চেষ্টা করবেন। এই দুই মতবাদের গুণাগুণ যাই হোক না কেন,

এদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ব্যক্তিমানসের বিকাশ এবং কেজো নাগরিক তৈরি যে এক কথা নয় এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার কথা ভেবেছেন সেখানে মানুষ হওয়াটাই বড়ো কথা, জীবিকার লক্ষ্য কিংবা সুনাগরিকতার লক্ষ্য সেখানে গৌণ। জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে। তেমনি সুনাগরিকতার লক্ষ্য শুধু সমাজ জীবনকে নিয়ে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য মানব জীবনের পূর্ণতাসাধন। এই পূর্ণতাসাধনের শিক্ষা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শের মৌল প্রত্যয়।

এই পূর্ণতাসাধনের পথ কি? রবীন্দ্রনাথ বলছেন: আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে। এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম। বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে তাদের মধ্যেও মুষলপর্ব দেখা দিচ্ছে। এতে প্রমাণ হয় যে 'মানুষের সত্য' ছোট সীমার মধ্যে এতদিন কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করে বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যে সকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল, সে-সব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমবাদ, কিংবা শ্রেণী-আধিপত্য, কিংবা জাত্যভিমান, কোনো কিছুকেই প্রশ্রয় দেননি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন যে আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও 'মানুষ' হয়নি। তবুও সভ্যতার অগ্রগতির পথে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে, স্বতন্ত্রতাকে অতিক্রম করে এই বৃহৎ মানুষেরই আবির্ভাব। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল এই যে, বুদ্ধির বর্বরতা বর্জন করে মানব-সত্যের সরিক হওয়াটাই সার্থক প্রকাশ। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানে, কর্মে সত্য হয়ে ওঠা, 'মনের মানুষ'কে পাওয়া, রবীন্দ্র শিক্ষা-ভাবনার এই বোধহয় মূল বিষয়।

"আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে।" সেই প্রসারণের দিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তার মহৎকে, দেখেছেন মহামানবকে, হৃদয়কে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে বলতে চেয়েছেন— "সকল জীব সুখিত হোক্, নিঃশত্রু হোক্, অবধ্য হোক্, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক্"। সেই সঙ্গে এ-কথাও তিনি বলতে চেয়েছেন যে দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত যেন না হয়। এই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত "স্ব"-এর সাধনার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-সমস্যার আলোচনা করেছেন। মানুষের জ্ঞান-চর্চার বৃহৎ মানবীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে যে বিদ্যার সার্থকতা হবে, আজীবন এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতের বাণীমূর্তি ছিলেন। সঙ্গীতে-নাটকে-চিত্রকলায় ও সাধারণভাবে তাঁর শিল্প-কৃতির মাধ্যমে তিনি জাগরণের বাণী প্রচার করেছেন। আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের জাতীয়

শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রবক্তা। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থনে স্বজাতির নামে সর্বজনীন মানবীয় ধর্মবিধির অসম্মান তিনি করেননি। অর্থাৎ 'নেশন'-এর সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সত্যকে সংকীর্ণ করে ফেলেননি। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, এবং রবীন্দ্রনাথের এ জানার নামই প্রজ্ঞা, যে মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে নিজের পূর্ণখাদ্য পায় না। ফলে যে ইওরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই ইওরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে। নেশনরূপের মধ্যে মানুষের সত্যকে আবৃত করে রবীন্দ্রনাথ তাই কোনোদিনই শিক্ষার সমস্যাকে দেখেননি।

নূতন যুগের বাণী রবীন্দ্রনাথ কান পেতে শুনেছিলেন। এই বাণী হল : "হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো, সবপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে সত্যকে দেখো।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রাণতার বাস্তব রূপ তাঁর শান্তিনিকেতন। যে মন্ত্রের রূপ দেখবেন বলে তিনি নিয়ত প্রত্যাশা করেছেন সেই মন্ত্র হচ্ছে "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।" স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের খণ্ডিত করে দেখা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে আবিল করেনি। ধর্ম, ভাষা এবং জাতিগত সব রকমের পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে দেখেছেন।

ভেদবাধার তিমিরমুক্ত মানুষের রূপ ধ্যান করেছেন বলেই জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে কল্যাণকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। চিত্তসম্পদের ক্ষেত্রে দেশবিদেশের ভেদ, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ অপসারিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের যে চিন্ময় মূর্তির সৃষ্টি কল্পনা করেছিলেন, সে ভারতবর্ষে নানা জাতির নানা বিদ্যার, নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ হবে। সেই ভারতবর্ষে সকলের জন্যই স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে। এই মুক্ত, উদার ভারতের চিন্ময় মূর্তির ধ্যানই রবীন্দ্রমানসের অন্যতম দিক। এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ভারতের জ্ঞানে-কর্মে সমৃদ্ধ নূতন মানুষ সৃষ্টিরই কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথের ছবি ॥ যামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইওরোপিয়ান আঙ্গিকে। তাই তাঁর ছবি বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে আধুনিক ইওরোপীয় ছবির আসল সমস্যা ও উদ্দেশ্য কী?

একজন প্রসিদ্ধ ইওরোপীয় শিল্পী একবার তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে এই মূর্তিগুলি যদি পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় তবে হয়তো ভেঙে-চুরে কিছু প্রাণ আসে। অর্থাৎ ইওরোপীয় শিল্পীরা রিয়ালিজমে ক্লান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নতুন একটা পথ। তাঁরা দেখছেন শিল্পের অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ হয়েছিল আদিম যুগেই। তখন শিল্পের উপর সভ্যতার আবরণ দেবার চেষ্টা হয়নি, ঝোঁক পড়েনি ফোটোগ্রাফিক ফাইডেলিটির দিকে। বিষয়বস্তুর সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। ফলে কোনো গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবিতে যখন দেখি একটা ঘোড়া আঁকা হয়েছে, বুঝি যে ওটা ঘোড়াই; কিন্তু এই ঘোড়া বা ওই ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মতো নিখুঁত বর্ণনা তাতে নেই। অর্থাৎ ঘোড়ার মূল কথাটা আছে শুধু। তারপর সভ্যতা যত এগুতে লাগল তত ঝোঁকটা পড়ল রিয়ালিজমের দিকে। মানুষ নিজের নগ্ন দেহ নিয়ে কুণ্ঠা পেল, খুঁজল আবরণ ও আভরণ, আর তাতে প্রত্যহই বাড়াতে লাগল কৃত্রিমতার বোঝা। শিল্পীও ঠিক একই ভাবে নগ্ন ভাবাবেগে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন; নিখুঁত করার চেষ্টা, পালিশ করার চেষ্টা, এদিকেই পড়ল নজর। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প উঠল হাঁপিয়ে। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান শুরু করেছেন এই রিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে। পালিশ ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও। এই হল তাঁদের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে তাহলে কি আজকের শিল্পের কোনো তফাত নেই? আছে নিশ্চয়ই, কারণ শিল্পের এই হলো ইতিহাস, এর উদ্দেশ্যে ভ্রান্তি থাকলেও এটা সম্পূর্ণ অনর্থক নয়। কারণ, একদিক থেকে এর প্রকাণ্ড একটা শিল্পমূলক মূল্য আছে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি ছিল অবচেতনার স্তরে; তখনকার শিল্পীরা যে সত্যের আভাস পেয়েছে তা নিতান্তই আকস্মিক। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে কোনো মূর্তি যদি প্রাণের সন্ধান পায় সেটাও হবে আকস্মিক। এই অবচেতনা ও আকস্মিক সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হলো আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্য, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য প্রয়োজন শিল্প ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ শিল্প যতদিন রিয়ালিজমের ভ্রান্ত মোহে ঘুরেছে, ততদিন ধরে ঘোরার ব্যাপারে অনেক অনিবার্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো: যেমন ড্রয়িং, রঙ বা সামঞ্জস্যের দিক। একমাত্র এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের উদ্দেশ্যকে অবচেতনের স্তর থেকে চেতনার স্তরে আনতে পারা যায়। তাই দেখতে পাই আজ ইওরোপে যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রথমে কী পরিশ্রম করেছেন রিয়ালিস্টিক ছবির আঙ্গিককে দখল করতে; অথচ মজার কথা, উদ্দেশ্য এই রিয়ালিস্টিক ছবিকেই ভাঙা: পিকাসো, মাতিস, সকলেরই—হবেই বা না কেন? আইন অমান্য যিনি করতে চান তাঁকে তো প্রথম হতে হবে আইনের ব্যাপারেই পাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারী একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তবগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হলো না।

তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রঙের কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই ; অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলে কল্পনার প্রাবল্য সব সময়ে সমান সজাগ থাকে না। এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়তো তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন তাঁর 'খাপছাড়া'র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক ও চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারেনি।

তাছাড়া রিয়ালিজমের এই যে ছোঁয়াচ তা কি আধুনিক ইওরোপিয়ান শিল্পই সম্পূর্ণ এড়িয়ে আসতে পেরেছে? আমার তো মনে হয় আজও তা পারেনি। পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝছেন ডাইমেনশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজমের ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, "এঁদের নতুনত্ব কই দেখছিনে কিছু। আমি না হয় আঁকতে চেয়েছি আস্তো একটা পেয়ালা আর এঁরা সেই আস্তো পেয়ালাই আঁকছেন ভেঙে চুরে। নতুনত্ব কোথায় তা হলে?" কথাটা অনেকখানিই সত্যি। সত্যি বলতে, সেকেলে রিয়ালিস্টিক চিত্রকলায় ও অতি-আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলায় **দৃষ্টির** কোনো তফাত নেই। আমার মনে হয় চীন বলুন, জাপান বলুন, সারা জগতে শিল্পী-দৃষ্টি একই, ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়ালিজমের ছোঁয়া এভাবে আর কেউ কাটাতে পারেনি। পুরাণের একটা ভাবচ্ছবি ধরুন না—জটায়ুর সঙ্গে বাস্তব পাখির কোনো সম্পর্কই নেই, এর জন্মেতিহাসও অদ্ভুত, সেখানেও রিয়ালিজমের ছোঁয়াচ এসে পড়েনি। কিন্তু জটায়ু বলে একেবারেই চিনতে পারেন না কি? আমার তো মনে হয় যেদিন আধুনিক শিল্পী শিল্প সাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকতে পারবেন, সেদিনই আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের আদর্শ পরিপূর্ণ হবে। আমার বিশ্বাস আজ শিল্প এই রকমই কোনো পৌরাণিক জগৎ সৃষ্টি করার দিকে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপবোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরনের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি অ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার কোনো ছবিতে অ্যানাটমিবোধ যদি সত্যিই থাকে তাহলে শুধু এই ধরনের ছবিতেই আছে। কারণ ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য কতটুকু? এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশি আর কি? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য শিল্পেই কি এই সতেজ ভাব সবচেয়ে বেশি বর্তমান নয়? রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনি নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দ গঠনেই। আমার মতে গত দু-শ বছর ধরে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে

চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান : ছবির জন্যে খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।
রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কী বলতে চাই বোঝাতে হলে দুটো ছবির তুলনা করা ভালো। ধরুন দুজন শিল্পী একটি মেয়ের ছবি আঁকতে চান নিছক কল্পনা থেকে—অর্থাৎ দুজনেই আঁকতে চান না-দেখা মানুষ। একজন এই না-দেখাকে আঁকছেন নিতান্ত ঘরোয়া করে নিয়ে, কল্পনার প্রসার সেখানে নেই। আর একজন মেয়েটিকে আঁকছেন, তাও না দেখেই, কিন্তু তাকে দেখার গণ্ডির ভিতরে টেনে আনার কোনো চেষ্টাই নেই। কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার স্পষ্ট ধরা পড়ে, বৃহৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। পোর্ট্রেট দেখে-দেখে আঁকা হয়। তাই বিজ্ঞানী বলে দিতে পারেন মডেল শিল্পীর কত ফুট দূরে কত ইঞ্চি নিচে বসেছিলেন, কোন্ দিক থেকে আলো পড়েছিল, ইত্যাদি। দেখে-দেখে যখন মানুষ আঁকি তখন তার মুখ যতক্ষণ আঁকি শুধু মুখই দেখি, আর কিছু দেখি না, অপর দেহের নিম্নাংশ আঁকবার সময়ে মুখ দেখি না, শুধু নিম্নাংশই দেখি। একই মানুষ দশ ফুট দূরে দাঁড়ালে একভাবে দেখি, এক-শ ফুট দূরে দাঁড়ালে দেখি আর একভাবে, দু-শ ফুট দূরে গেলে আবার অন্যভাবে দেখি। কিন্তু সেই মানুষই যখন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখনো কি তাকে দেখি না? কখনো তাকে দেখি, দেখি সম্পূর্ণভাবে, তার সেই চোখে-না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আজকের মানুষ, তাই বিশেষ কোনো পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা তাঁর নেই। তাঁর ছবিতে এই বিশেষত্ব সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়।
রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার যে আলোচনা হয়েছিল, এখানে তা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন, আমার তো আর আর্ট-স্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়তো সম্পূর্ণই হয় না। আমি বললুম, এগারো বছর স্কুলে পড়েও তো দেখি ছেলে অনেক সময়ই মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনোদিন স্কুলের কাছ ঘেঁষেনি এমন ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি—ছবির বেলায় আপনারও হয়েছে তাই।

[প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮

রবীন্দ্র চিত্রকলায় অরূপের অন্বেষা ॥ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

'শেষের কবিতা'র অমিত রায় একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এই বলে যে, 'তাঁর রচনা-রেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো, গোল বা তরঙ্গ রেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকৃশো করা।'

অভিযোগের ছলে অন্যের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হলেও এ-সত্যানুভব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। আপন হস্তাক্ষরের এই প্রকৃতি-ঘেঁষা আদিমতা বা আদিম প্রকৃতি সম্বন্ধে অগাধ ঔৎসুক্য ও অবহিতিই তাঁর পরিণামী চিত্রকলার প্রাথমিক নির্দেশক। তাঁর হস্তাক্ষরের অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য—যা পরবর্তী যুগকে আচ্ছন্ন ও আকৃষ্ট করেছে অনুকরণে—তাঁর চিত্রকলার আদি-বীজ।

বলা বাহুল্য, হাতের অক্ষরের এই ছন্দ ও রূপময়তা যাকে শিল্পের ভাষায় লেখাঙ্কন (calligraphy) বলা হয়ে থাকে, শুধু একক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিকভাবে এসিয়ার চিত্রকলার আদি-নিয়ন্তা। চীন, জাপান, পারস্য এবং ভারতবর্ষে লেখাঙ্কন অঙ্কন-বিদ্যার অঙ্গীভূত এবং অন্যতম বিশিষ্ট শিল্প হিসেবে অঙ্গীকৃত। চীনের শিল্প-শিক্ষার্থীকে আগে করতে হয় আখরের আরাধনা, আকার সম্পর্কে তাদের ধারণা-লাভ ঘটে সেখান থেকেই। প্রাচীন পারসীকদের মধ্যে এ-বিশ্বাস প্রচলিত যে, যে-মানুষ ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ করতে পারে সুশ্রী, সুগঠিত ও ছন্দোরূপময় হস্তাক্ষরে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আগেই স্পর্শ করেছে তার ললাট। আর একজন ভারতীয় শিল্পী মীর মুল্লাহ আলী—বাদশাহ জাহাঙ্গীর যাঁর লিপিচাতুর্যের মুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন—লেখাঙ্কন প্রসঙ্গে তাঁর সগর্ব ঘোষণা হোল—'সুডৌল অক্ষরের এক একটি বঙ্কিমার পদতলে পরাভূত গগন-গম্বুজ নতি স্বীকার করে, এক একটি টানের মূল্য শোধ করতে মহাকাল হয় ফতুর।'

রবীন্দ্রনাথকে লেখাঙ্কনের চর্চা করতে হয়নি। জার্মান পল ক্লী-র মতো এ তাঁর অন্বেষণের বিষয় ছিল না। স্বাভাবিকভাবে, natural selection-এই তিনি করায়ত্ত করেছিলেন তাঁর হস্তাক্ষরের একটি বিশিষ্ট ফর্ম। কাঁপানো-বাঁকানো, গানের রেশ লাগানো, ঢেউ-এর মতো ওঠানো-নামানো, আদিমতার আভাস জাগানো, অথচ যা দৃঢ় শক্ত স্থাপত্য বা স্থাপত্যের গায়ে গঠিত ভাস্কর্যের মতো। এবং সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গতার ফলে এই সব অক্ষরমালার মধ্যে মানুষী-ভাব (human quality) আবিষ্কার করেছিল তাঁর সংবেদনী মন। তাই রচনাকালে একের পিঠে এক অক্ষর সাজানোর সময়ে যে-অক্ষরগুলি যে-যার আপনজনকে আগে-পিছে নিয়ে ভাবপ্রকাশের পক্ষে যথোপযুক্ত ও পরিপূর্ণ বাক্যের আকার লাভে সার্থক হোল, তারা যেমন অভিনন্দিত হোল কবির প্রসন্ন দৃষ্টিতে, ঠিক তেমনি তাঁর সকরুণ দৃষ্টিপাতের সজল বেদনায় অভিষিক্ত হোল তারাও, যে-অক্ষরগুলি কাব্যের সঙ্গীত-লোকে অসঙ্গত অনধিকার প্রবেশ করতে এসে আহত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অকালমৃত্যু লাভ করল অবশেষে।

লিখতে গেলেই লেখার পাতায় কিছু কাটাকুটি ঘটে অনিবার্যতই। সেটা দৃষ্টিদানের পক্ষে অনাবশ্যক বলেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু আপন অক্ষরমালার প্রতি আন্তরিক মমতাবিষ্ট বলেই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এই জাতীয় কাটাকুটির প্রতিক্রিয়া ঘটল ভিন্ন রকমের। "আমার হাতের লেখার কাটাকুটিগুলোর সামঞ্জস্যহীন কুৎসিত রূপ

আমার চোখে পীড়া দিত এবং আমার মনে হোত যেন পাপীদের মতোই তারা মুক্তির জন্যে আর্তনাদ করছে। তাই প্রায়ই আমি আমার আসল কাজ ফেলে রেখে, দয়াপরবশ হয়ে এদের নিয়ে বসতাম এবং একটা ছন্দশীল রূপের সমগ্রতায় নিয়ে গিয়ে এদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করতাম। এইভাবে এদের পিছনে অনেক সময় ব্যয় করেছি।"

অন্যত্র আরো বলেছেন—"যাদের মৃত্যু হোল তাদের একটা ভালোমতো কবর তো দেওয়া চাই।" (I must give them a decent burial !)

এইভাবে খাতার পাতায় মৃত অক্ষরদের আত্মার সদ্গতি সাধতে গিয়ে এক অর্থহীন বিচিত্র অলংকরণ বা নক্‌শার নতুন রাজ্যপাট গড়ে তুললেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিছক কলমের কাটাকুটি থেকে। একটি রেখার টানে আরেকটি রেখা এসে মিলিত হচ্ছে, তারা যেন ভেসে আসছে গানের পাখনায় ভর দিয়ে। তারা নিজেরাই যেন তাদের হারানো রূপের সন্ধানে ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে মরছে ইতস্তত। তারা কোনো সৃষ্টি-কর্তার আজ্ঞাবাহী অনুচর নয়। তারা অজ্ঞেয়, আকস্মিক, যেন 'হঠাৎ-গাওয়া ছন্দ বাল্মিকীর'। তারা ছন্দের ছন্দ। কোনো বস্তুবিশেষের আশ্রয় বা অবলম্বন ব্যতিরেকেও তারা আমাদের অনুভব ও অনুধাবনের দ্বারে প্রবেশপত্র পায় অনায়াসে। তাই এদের অভাবনীয় আবির্ভাবে স্রষ্টা নিজেই বিস্মিত।

হেনরী বিদো প্যারিসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর অন্যতম রসজ্ঞ সমালোচক, অনুরূপ আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনায় :

'মনীষী বাক যখন তাঁর আশ্চর্য সুন্দর হস্তলিপিতে Glaveein bien Tempere-র একখানি পাতায় প্রতিলিপি করবার সময় সমস্তক্ষণ ধরে একটি বিষণ্ণ চিন্তান্বিততায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন তিনিও নিজেকে দু-একটি মুহূর্তের জন্যে স্বপ্নের মায়াবী প্রবাহে ভেসে যেতে দিয়েছিলেন। আর সেই সময়টুকুর মধ্যে তাঁর কলমটিও নিজের মৌলিক ইচ্ছানুসারে কাগজের ওপর প্রায় একই ভঙ্গিতে (রবীন্দ্রনাথের মতো) ঘুরে বেড়িয়েছে এবং প্রায় একই ধরনের রেখাশিল্প খেলা করার মোহে গড়ে তুলেছে।"

আধুনিক চিত্রকলার জগতে এই 'খেলা করার মোহ' ঠাঁই পেয়েছে একেবারে তার প্রাণকেন্দ্রে। আধুনিক চিত্রকলায় বিমূর্তির ও বিশুদ্ধতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা এই খেলা থেকেই।

খেলা শিশুর ধর্ম। সৌন্দর্যের কোনো পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডে সে তৃপ্ত নয়। তাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে-তুবড়িয়ে দিয়ে তারা নতুন সৌন্দর্যলোক আবিষ্কার করে তাদের অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তির অন্তঃপ্রেরণায়। কাদাকে তারা কদাকার মনে করে না। তাই পারে অসুন্দরকে দিয়ে অনায়াস সুন্দর বানাতে। বিমূর্তির মধ্যে, নিরাকারের মধ্যে খোঁজে নানা আকারের মূর্তি।

এই 'খেলা করার মোহে'র টানেই মহৎ শিল্পীদের জীবনে দেখা যায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদকে পরিত্যাগ করে শৈশবের নির্জ্জন কল্পনালোকে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা। রূপকে নিয়ে অপরূপ সৃষ্টির চেয়ে তাদের অনেক বেশি উদ্‌ভ্রান্ত হতে দেখি রূপকে অরূপত্বের জগতে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার অভিপ্রায়ে। পিকাসোর মহানদী তাই বারে বারে নিত্য নতুন আবর্তনে, নিত্য নতুন শাখানদী বিস্তারে, সহজিয়া লোকশিল্পের খালে-বিলেও শিল্পের মুক্তি-অন্বেষণে এখনও উন্মুখর। 'খেলা করার মোহ' তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে এক মোহানা থেকে আর এক মোহানায়। দেখেছি শক্তিমান মাতিসকে সারা জীবনের অক্লান্ত আয়াসে মূর্তি ও বিমূর্তির যুগ্ম সম্মিলনে মানুষী-রূপের এক বর্ণসমৃদ্ধ অলংকৃত জগৎ সৃষ্টি করেও

শেষ জীবনে শেষ পর্যন্ত নিজের পূর্বকথিত উক্তি 'ডিজাইনিং শিল্প নয়'-এর বিরুদ্ধাচারণেও বিচলিত না হয়ে আত্মবিকাশের সম্পূর্ণতা খুঁজে পেলেন কাঁচি-কাটা রঙিন কাগজের টুকরো জুড়ে-জুড়ে চ্যাপেল-চিত্রণের অনবদ্য ডিজাইন উদ্ভাবনে; ঠিক যেমন গাছের শুকনো ভাঙা বিকৃত ডালপালাকে জোড়া লাগিয়ে এদেশে অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন আশ্চর্য 'কাটুম-কুটুম' খেলনার অনাড়ম্বর শিল্প তাঁর জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই 'খেলা করার মোহ' মন্ত্রটি যখন শুনি কোনো নির্জ্জন-জগতে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে আধুনিক ইওরোপীয় শিল্প-যজ্ঞের অতি প্রভাবশালী পুরোহিত ক্লী শিল্পের সকল ক্ষেত্র থেকেই সুদীর্ঘ সত্যান্বেষণের শেষে একদিন যে আতুর-আর্তি প্রকাশ করেছিলেন—"I want to be as though new born, knowing nothing, absolutely nothing, about Europe ; ignoring poets and fashions, to be almost primitive. Then I want to do something very modest ; to work out by myself a tiny formal motive, one that my pencil will be able to hold without any technique. One favourable moment is enough."

রবীন্দ্র চিত্রকলারও উৎস সেই নির্জ্জন-লোক—যা ছিল ক্লী-র অন্বিষ্ট। "The heart must do its work undisturbed by reflective consciousness. To know when to stop is of the same importance as to know when to begin. To continue merely automatically is as much a sin against the creative spirit as to start work without true inspiration."

শিল্পের ব্যাকরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থেকেও এক অজ্ঞাত অবচেতনার তাড়নায় এবং true inspiration ব্যতিরেকেই রবীন্দ্রনাথ যে সত্যি automatically ই অসংখ্য, প্রায় দু-হাজারের মতো, ছবি এঁকে যেতে পারলেন, সেখানেও তাঁর এই শুরুর পিছনে ছিল কোথায় থামতে হয় সে সম্বন্ধে সতর্ক মাত্রাজ্ঞান। এবং এ তিনি অর্জন করেছিলেন শৈশব থেকে সঙ্গীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা, আর বাংলা সাহিত্যের কাব্য, গান ও গদ্যের ডাঙাজমিতে অবিরাম অনলস শস্যসৃষ্টির সক্রিয়তা থেকে।

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টি ঘটেছিল শৈশবের বাঁধনঘেরা দিনগুলো থেকেই। পরবর্তী জীবনে তা বাঁধা পড়েছিল অবিচ্ছেদ্য পরিণয়-বন্ধনে। তাঁর ভ্রমণের পথ বিস্তৃত ছিল বিশ্বময়। শিশুকাল হতে সেই ভ্রমণের পথ থেকে তাঁর চিত্তের ভাণ্ডার ভরে উঠেছিল সঞ্চিত স্মৃতি-সম্পদে—যার 'কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা, কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশ্য, কোথাও বা যৌবনের কুসুম-প্রগল্‌ভ বনপথ, কোথাও বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত,' আর কোথাও 'মেঘপুঞ্জের স্তব্ধ দুর্বোধ্য বাণী'। এ-সমস্তই তাঁর কাব্যে-গানে প্রকাশিত হয়েছিল স্মৃতিলেখা ছন্দে। কিন্তু—

সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়—
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করেনি সঞ্চয়—
আপনার চিত্রশালে ;

তাইই একদিন আত্ম-অগোচরে উন্মাদবেগে আত্মপ্রকাশ করে বসল তাঁর ছবিতে। তাদের কেউই তাঁর পূর্বপরিচিত নয়। কোনো মানবিক সম্বন্ধ, কোনো মানসিক অনুষঙ্গ সূত্রে আবির্ভাব নয় তাদের। তারা অনাহূত ও আকস্মিক। তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে কোনোও দিন চাক্ষুষ দৃষ্টি-বিনিময় ঘটেনি। এমন কি পৃথিবীও কোনোদিন তাদের প্রত্যক্ষ করেনি চাক্ষুষে। সৌন্দর্যের হাটে তারা কর্কশ বলে লাঞ্ছিত, কুৎসিত

বলে বঞ্চিত, বিবর্ণ ও বিসদৃশ বলে বাতিল। কিন্তু তারাও চায় শিল্পিত হতে, চায় নতুন জন্ম। তাদের আকারহীন আত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছে একজন শিল্পী, যে তাদের গড়বে 'খেলা করার মোহে'। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এমনি রূপ সমস্ত দিকে দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিস্টকে খোঁজে তারা সবাই; তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন একেকজন খেলুড়ী আর্টিস্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে।"

এত কাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনিই তা শুনেছি।
সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি দেখছি তাই আপনিই।

এবং অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই অভিভূত বিস্ময়ই তাঁর প্রথম যুগের আঁচড়-কাটা রেখার টান-গুলোকে নিছক কাটাকুটির পাষাণ-কারায় আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। তারা সরবে, সদলে, সফেন উল্লাসে সব শৃঙ্খলাকে উড়িয়ে, সব শৃঙ্খলকে গুঁড়িয়ে, 'দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারাকে কাত করে ফেলে' দিয়ে, 'অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি'র নেশায় মেতে উঠল।

কাটাকুটির সময়েই ছন্দের অবাধ উন্মুক্ত সঞ্চরণকে অবলম্বন করে তাঁর চিত্রালেখ্য একটা ক্রমপরিণতির দিকে এগোচ্ছিল। লেখার বাতিল অংশগুলোকে সঠিক অংশের থেকে আলাদা করে দেওয়ার প্রয়োজনে যে বিচিত্র এবং কখনো কখনো স্তরমাত্রিক নক্‌শা গড়ে উঠছিল তার গতিতে কিছুটা বাধ্যবাধকতার নিয়ন্ত্রণ ছিল। ক্রমশ দেখা গেল অপ্রয়োজনেও কতকগুলো আকার গড়ে উঠছে। তাদের শরীর আছে, কিন্তু সাদৃশ্য নেই। তারা কোনো কিছুর প্রতিরূপ হতে চায় না, শুধু চায় কিছু একটা হয়ে উঠতে। সেখানে "idea is not illustrated : the illustration is the idea."

অস্তিসার নিরাকারে আত্মপ্রকাশের এই গরজকে রবীন্দ্রনাথ যে উপেক্ষা করতে পারলেন না, তার মূলে রয়েছে বিশ্বজগতের ছন্দলীলা সম্পর্কে তাঁর নতুন সত্য আবিষ্কার।

"বিপুল বিশ্বের অন্তহীন নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দের জগৎ ক্ষুদ্র একটা বুদ্‌বুদ মাত্র। অঙ্গভঙ্গির ভাষাই হচ্ছে বিশ্বজগতের ভাষা—সে যখন কথা বলে, আপনাকে প্রকাশ করে, তখন তা করে ছবি ও নাচের ভাষায়।"

"কাটাকুটির কাজ করতে করতে আমি একটা সত্যকে আবিষ্কার করেছি : এই যে অসংখ্য রূপের জগৎ, এখানে অনবরত রেখার ও রেখাঙ্কিত রূপের একটা নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন চলেছে : যে সব রূপে ও রেখায় একটু সুষ্ঠু ছন্দের প্রবাহ বর্তমান, তারই শুধু এখানে বাঁচবার অধিকার আছে। এবং আমি উপলব্ধি করছি যে আশ্রয়হীন বিসদৃশ্যের বেকার-সমস্যা সমাধান করে তাদের একটা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সার্থকতায় রূপান্তরিত করাই হচ্ছে সত্যিকারের কলাসৃষ্টি।"

নির্বাক অসীম আকারের নৃত্যে, বাক্যহীন সীমার ভাষায় আর অন্তহীন ইঙ্গিতে অনন্ত কাল ব্যেপে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে যে পথ ধরে, সেই পথেরই যাত্রী হল তাঁর চিত্রকলা।

শিল্পীর তুলি হয়ে উঠল দ্রুত। যেন মুহূর্তমাত্র বিরতির অবকাশ নেই। চোখের সামনে এই মাত্র যে রূপটি অস্পষ্ট মূর্তিতে ভেসে উঠেছে, তাকে এই মুহূর্তেই প্রাণদান করতে হবে। হয়তো ভেসে ওঠা রূপটি ছিল কোনো ফোটা ফুলের। আঁকতে গিয়ে সেটা হয়ে উঠল কোনো নৃত্যপরা নারীমূর্তি। এখানে ফুল বা নারী কোনোটাই সত্য নয়, সত্য কেবল ভঙ্গির ছন্দ।

"তিনি কেবল একটা রৈখিক সম্ভাবনার জন্মলাভে সাহায্য করেছেন : যে-রেখাটির অন্তঃস্থিত আবেগ সম্বন্ধে তিনি কিছুই আঁচ করতে পারেননি, অথচ যে-রেখাটি বিকশিত হয়ে উঠবার জন্যে অধৈর্য প্রতীক্ষায় উন্মুখর হয়ে ছিল। মনের গভীরে এই রেখাটির অস্তিত্বের খবরটিও তাঁর চোখে আগে থেকে স্পষ্ট হয়নি, ভবিষ্য শিল্পায়নের একটা পূর্ব-পরিকল্পনার আভাস অনুভব করা তো দূরের কথা। অপর পক্ষে, যে অসীম অসংখ্য রেখাচিত্রগুলি বিস্তীর্ণ সম্ভাবনায় মুখর হয়ে আছে, তাঁর মনের একান্ত একমাত্র কাজটি হোল শুধু তাদের সাধারণ্য থেকে সেই একটি বিশেষ ছবিকে বেছে নেওয়া, যে রেখা ভঙ্গিটি এই বিশিষ্ট একক প্রসারে ও পটভূমিতে সগৌরবে এসে হাজির হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে, পুরোপুরি এসেই পড়েছে, বলতে গেলে, এখন মাত্র শুধু স্পর্শবহ অস্তিত্বে রূপান্তরিত হবার যেটুকু দেরি।......কবির যে-হাতখানি অজস্র কবিতার জন্মলগ্ন সৃষ্টি করেছে, সুর-সঙ্গতি ছন্দে যে-হাতখানি ইতিপূর্বেই স্বত্ব-স্বামিত্ব অর্জন করেছে, সেই হাতখানিই কবির সঙ্গে পূর্বাহ্নে কোনো পরামর্শ না করেই নিজস্ব মৌলিক চেতনার আবেগে প্রাণস্পন্দিত হয়ে উঠেছে।" —হেনরী বিদো।

ছবি আসতে থাকল ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখের সামনে সারি সারি আকারের মহাযাত্রা। ক্রমশ তারা ছন্দসর্বস্ব একঘেয়েমির যাযাবর বৃত্তি থেকে মুক্তি নিয়ে কোথাও একটা স্থায়ী ও স্থিতিশীল (static) বসবাসের বাসনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। শুধুমাত্র গড়নের অস্থির গরজ নয় আর। চাই সাদৃশ্য। চাই এমন প্রাণশক্তি যার জোরে ভঙ্গিগুলো মাটিতে না লুটিয়ে সোজা শক্ত শিরদাঁড়ায় মাটির ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ছবি ছুটল সাদৃশ্য সন্ধানে। এটা তাঁর চিত্রলোকের দ্বিতীয় দেশ। যদিও দুয়ের মধ্যে মিল রয়ে গেল মূলকেন্দ্রে।

"উৎস মুখটি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু শিল্পপ্রবাহ সেই একই রয়ে গেছে। সূচনাস্থলে সব সময়েই একটি প্রাণ-কণিকা (cell) থেকে যাচ্ছে; যার চারিদিকে জাল বুনে বুনে মূল শিল্পটি নিজের থেকেই পেকে উঠছে। ঠাকুর মশায়ের ভাষায়, সূচনাস্থলে রয়েছে একটি প্রাণকেন্দ্র (nucleus)। কিন্তু যে মুহূর্তে সৃষ্টি-কার্যের যাত্রা শুরু হোল, তখন থেকেই প্রাণপুঞ্জের ক্রমবিবর্তনের নিয়ামক সেই অজ্ঞেয় বাধ্যবাধকতায় স্রষ্টার হাত বাঁধা পড়ল। তারপরের বিবর্তিত চিত্রগুলি এক ধরনের 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' রূপচারিত্র্য থেকে সৃষ্টি হতে শুরু করল। নিজস্ব কোনো বিবর্তন-ধারার প্রভাবে বা সাধারণ পৃথিবীর কোনো কোনো একান্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতিসিক্ত আবেগের প্রভাবে, তাদের ক্রমরূপান্তর চলতে থাকে। তার ফলেই, আমরা যাকে 'প্রকৃতি' বলে জানি, তার কথঞ্চিৎ অনুরূপ হয়ে যায় তারা। কোনো মুখের আদল পায়। কখনো কখনো আবার কোনো নির্দিষ্ট পরিণতিতে উপনীত হতে ইতস্তত করে।"—হেনরী বিদো।

তাঁর চিত্রকলার এই দ্বিতীয় পর্ব তিন ভাগে স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক দৃশ্য। মানুষের ছবি। জীবজন্তুর আকৃতি। অসাধারণত্বের দিক থেকে তাঁর জীবজন্তুর ছবিগুলো সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সে-সব মূর্তি এমনই বিকট, বীভৎস, কঠিন ও নির্দয় যে তাদের আদিম প্রাণীজগতেরও আদিতম পূর্বপুরুষ বলে বিশ্বাস হয়। পৃথিবীর কোনো দুর্গম অরণ্যে ঘুরেও তাদের চিহ্নমাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অথচ তাদের শরীরে বহু বিস্মৃত যুগের শীতল অন্ধকার ভিজে শ্যাওলার মতো এমনভাবে লিপ্ত, তাদের স্থূলত্ব এমনই ভারবহুল, আকৃতি এতই অতিকায়, তাদের চাউনিতে এমন কুটিল ক্রূর অভিসন্ধি, যার ফলে তাদের জান্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ মূঢ়তারই নামান্তর। একটি শকুনি, কয়েকটি জটলা-বাঁধা পাখি, অথবা কোনো সর্প জাতীয় জীব এমনিভাবেই বাস্তব হয়ে উঠেছে যে, তাদের মনোজগতের অন্ধকার পশুলোকের প্রতি আমাদের মনোযোগকে

তীব্র আকর্ষণ করে। আর যাদের কোনো ভাবেই চিনি না, যাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ অগাধ তাদের 'মানে কি'? এ-প্রশ্নের উত্তরে শিল্পীই পাল্টা প্রশ্ন হাঁকিয়ে বসেন প্রশ্নকর্তাকে—ঈশ্বর যে ডিনোসউর, হিপোপটেমাস এবং আরো কত কিম্ভূতকিমাকার জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তার মানে কি?

মানুষের ছবি অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বেলাতেও যথাযথ অনুকরণের দাসত্ব নেই কোনোখানে। অ্যাকাডেমিক অ্যানাটমির বাঁধন ছিঁড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছবির মানুষ, পার্সপেকটিভ-এর বাঁধন ছাড়িয়ে তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সেখানে অসংখ্য মানুষের অবিরাম চলাফেরা, আসা-যাওয়ার চলচ্চিত্রের দিকে তাকিয়ে আমরা কখনো কোনো সম্পূর্ণ মানুষকে পাই না। পাই তাদের আলোড়িত সত্তার কোনো খণ্ড মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী একটি ভঙ্গি, অথবা তাদের মুখমণ্ডলে কখনো সজ্ঞান মনোজগৎ কখনো বা অবচেতন চিত্তলোকের সদ্য-বিকশিত অভিব্যক্তি ও ভাব-সংঘাত। যা কখনো চিন্তায় বিদীর্ণ, ক্রূরতায় কঠিন, কখনো গাম্ভীর্যে অটল, কখনো পরিহাসে চঞ্চল। এই সব মানুষেরা যেন কোনো একদিন একাত্ম ছিল আমাদের পরিচিত পৃথিবী ও প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে এবং কোনো একদিন অতল বিস্মৃতির অন্ধকার অগোচরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল তারা। শিল্পী তাদেরই ছবি আমাদের দেখাতে চাইছেন সুদূর ধূসর নক্ষত্রলোকের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে উঁচু করে ধরে। তাই তারা অস্পষ্ট, অদ্ভুত, রহস্যাবৃত, কখনো বা নক্ষত্রের মতোই জ্যামিতিক। অন্তহীন ইঙ্গিত ছাড়া আপনাদের প্রকাশ করতে তারা অক্ষম।

এমন কি নিজের যে কটি প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছেন, সেখানেও দেখি শুধুমাত্র সাদা কালোয় আলোছায়ার মণ্ডলে, কোথাও প্রাকৃতিক মহিমার বর্ণানুষঙ্গে পাথরে-গড়া ভাস্কর্যের মতো এক অটল স্থায়িত্বের স্থিরতা। শেষ পর্যন্ত মুখের মুখোশ রচনা করে কৌতুক মিটেছে তাঁর, কে জানে এর কোনোখানে তাঁর প্রচ্ছন্ন চেতনার বিদ্রূপ মেশানো ছিল কিনা।

নারীমূর্তিগুলি তাঁর চিত্র জগতের আর এক অসীম বৈচিত্র্যের পরিচ্ছেদ। তারা যেন 'আদ্যিকালে সদ্য চোখ মেলা তারার মতো' বিষণ্ন, মলিন, নিভৃত, সুন্দর। নারী-প্রতিকৃতি অঙ্কনের সময়ে ইওরোপীয় ধরনে তিনি কখনো কখনো মডেলের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর সে-ছবিতে মডেল রূপায়িত হয়নি। ব্যক্তির সৌন্দর্যকে অবলম্বন করেও তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এক নৈর্ব্যক্তিক সুষমা। যেহেতু কোনো কিছুর অবিকল পুনরাবৃত্তি কোনো সময়েই তাঁর সৃষ্টির নিয়মাবলীতে স্থান পায়নি।

"যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়া রূপ, ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান, তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া" সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর নারীমূর্তিগুলির সকরুণ মুখচ্ছবি। তাদের বাঁকাচোরা আবছা ধরনের মুখের আদলও নারী জীবনের সলজ্জ আবেদন, বচনহীন বেদনা, সুস্নাত মাধুর্য আমাদের চিত্তলোকের অনেক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষারাশিকে বাসনার অস্থির চাঞ্চল্যে আলোড়িত করে তোলে; অথচ তাদের অব্যক্ত আনন্দ-বেদনার মর্মানুসন্ধানে আমাদের সমস্ত মুখরতার মৌনতা অবশ্যম্ভাবী। কোনো কোনো নারীমূর্তির পটভূমিকায় এক আলোকিত রক্তিমাভা অগ্নিশিখার মতো ব্যাপ্ত, সে-সব মূর্তির উষ্ণ আবির্ভাবকে মর্তলোকের বিরহ-মিলনের সীমায় বাঁধা যায়। কিন্তু কোনো কোনো মূর্তি যেন কল্লোলিনী জগৎ সমুদ্রের উপরে ধ্যান মূর্তিতে বসেছে তপের আসনে। তার চতুর্দিকে কর্মজীবনের প্রখর গর্জন রেখার টানে সজীব হয়ে উঠেছে সমস্ত পশ্চাদ্‌পট জুড়ে।

তাঁর অসংখ্য রঙের ছবিতে আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করা যায় লাল রঙের প্রতি পক্ষপাত। একই সঙ্গে লক্ষ্য

করা যায় তাঁর শেষ জীবনের বহু গদ্য পদ্য রচনায় এই রক্তিম রাগের প্রতি প্রবল অনুরক্তি। বিশেষ করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণনায়।

'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী বলেছিল ভালবাসার রঙ লাল। নন্দিনীর মুখের এই তত্ত্বকথাই যেন তাঁর রঙের ছবিতে নন্দনতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এবং নারী প্রকৃতির প্রেমপূর্ণ অন্তর্লোকের বেদনা ও উষ্ণতা উদ্ঘাটনে লাল রঙের প্রোজ্জ্বল ব্যবহার ঘটেছে বারেবারেই।

লাল রঙ প্রসঙ্গে 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে' একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে রঙ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে সবার আগে আকর্ষণ করতো তা হাল্কা নীল। অনেক দূরবর্তী ব্যবধান থেকেও সহজে তা প্রত্যক্ষগোচর হত তাঁর, অথচ যা অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে দিলেও অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। তাদের অদূর-দৃষ্টির দৃষ্টান্তে তিনি করুণা অনুভব করতেন। অথচ ছবিতে সবার আগে আসে লাল। নীল হাল্কা নীল সেখানে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না। পাহাড় ইত্যাদি আঁকার সময়ে জোর করে প্ররোচিত করা হয়েছিল তাঁকে নীলের ব্যবহারে। তাতে তাঁর আন্তরিক অসম্মতিই ছিল বেশি, তৃপ্তি অল্প। অবশ্য ফাউন্টেন পেনের ব্লু-ব্ল্যাক কালির একক রঙে অনেক ছবিই এঁকেছেন তিনি।

রঙ ব্যবহারে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না তাঁর। আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার ধূসরতায়। রঙের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রখরপন্থী। তাই গাছের ফুল নিংড়োনো রঙেও ছবি রাঙিয়েছেন অনেক। এমন কি হাতের সামনে যখন সব রঙই নিঃশেষ তখন চামড়া-রাঙানোর কালি ব্যবহার করেও ছবি শেষ করেছেন নিঃসংকোচে। জল রঙএর ছবিকে তেল রঙের ছবি মনে করিয়ে দেয় যে-সব ছবি তার পিছনে আছে এক অদ্ভুত কৌশল। রঙ লাগানোর আগেই ছবির জমিতে পেন্সিল ঘষা হয়েছে নানানসই করে, জোরালো আদিম উত্তেজনায় রঙগুলিকে মূর্ত করে তুলতে।

রঙের ব্যবহারে তাঁর সোচ্চার বিদ্রোহ পাশাপাশি দুটি বিরুদ্ধ বর্ণের সমাবেশ ঘটাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। এ-সব রঙের ছবি আলো-অন্ধকারের বিরহ-মিলনের রেখায় আঁকা। একই গাছের ছবি তা যখন কলমের আঁচড়ে আঁকা, দেখে মনে হল যেন 'ক্ষুব্ধ মুনির মতো' 'মাথা তুলেছে আকাশে।' আবার অনন্ত আকাশের গতি-চঞ্চল আলোর উদার প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে সেই গাছই রঙে আঁকা ছবিতে হয়ে উঠল যেন 'সূর্য মন্ত্র জপ করা ঋষির মতো'। কখনো কখনো গাছের ডালপালা থেকেই নানা অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি ভেসে উঠেছে তাঁর চোখে, ভেসে উঠে চোখে দেখার অভ্যস্ত জগতটাকে উল্‌টে-পাল্‌টে ছন্নছাড়া করে দিয়ে গেছে।

শুধু ছবির জগতে নয়, এই নতুন দেখা, বিশেষ করে দেখা ছবির জগৎ ছাড়িয়েও মৌলিক রূপান্তর এনে দিয়েছে তাঁর কাব্যের জগতেও। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের যে পরিবর্তন, তার মূল্য আদৌ যৎসামান্য নয়। সে-প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র আলোচনায় পরিসর প্রয়োজন বলেই এখানে সে সম্পর্কে নিরস্ত হবার আগে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি ও একমাত্র সুচিন্তিত ও প্রায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি সংগৃহীত করা হচ্ছে :

"তাঁর শেষ কুড়ি বৎসরের সাহিত্য ও তাঁর মনের গতি বোঝবার জন্য তাঁর ছবির বিশেষ মূল্য আছে; আমাদের মনে হয় কবি রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। চিত্র রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন, যে জগতের সত্তার বিষয় ইতিপূর্বে তিনি হয়তো এমন তীব্রভাবে অনুভব করেননি; ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন

world of gesture, যার কাছে রবীন্দ্রনাথের মতে world of meaning সামান্য। তাঁর শেষ-জীবনের রচনা 'রক্তকরবী' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা এই world of gesture-কে অনুসরণ করে চলেছে।"

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সূচনা ও ক্রমবিকাশ ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। ১৯৩০-এর মধ্যেই তাঁর ছবি কাটাকুটির নক্শা-পর্ব শেষ করে আদিম জীবজন্তুর অতিপ্রাকৃত কাঠামো নিয়ে আঁকা শেষ করে এনেছে।

"রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার ছবিগুলি দেখতে দেখতে কেউ যদি রক্তকরবীর কথা স্মরণ করেন তাহলে তিনি এই দুই-এর আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করবেন।…'রক্তকরবী'র রাজাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই; যেমন অন্ধকারে পাথরের মূর্তির সামনে এলে মূর্তি দেখি না, কিন্তু জানি সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ। 'রক্তকরবী'র রাজা প্রকাশ পেয়েছে ভাব ভাষা বা তার অর্থের দ্বারা নয়—বলবার ভঙ্গি বসবার ভঙ্গি হাতের মুঠোয় মৃত জন্তু নিয়ে রক্তকরবীর রাজা রূপের জগতে জীবন্ত।"

'রক্তকরবী'র পরে পুনশ্চ কাব্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের এমন ভাব এমন ভঙ্গি পাই যা ঠিক পারম্পর্য বজায় রেখে চলেছে বলে প্রমাণ করা শক্ত। 'শিশু তীর্থে'—

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।

·· প্রকৃতি এই প্রথম নিরুত্তর রইলেন কবির প্রশ্নে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কাছ থেকে তাঁর সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা পেয়েছেন। এবার যখন উত্তর পেলেন তখন বুঝলেন যে, বসুন্ধরাকে একদিন তিনি "ওগো মা মৃন্ময়ী বলে সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল মৃন্ময়ী মাতাই নন; তাঁর অন্য রূপও আছে।… বললেন—

অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।"

এই ভাবে এক সময় ছবি ও কবিতা হয়ে উঠেছে পরস্পর-পরিপূরক। কাব্যের প্রাচীন পটভূমি থেকে আসছে ছবি। ছবির জগৎ থেকে রেখার ভঙ্গি গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে কবিতার জগতে—কবিতাকে করে তুলছে নিরাভরণ, অলংকার-ভারমুক্ত। আবার কবিতার জগতে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রস-সৌন্দর্যকে নিংড়ে নিয়ে ছবির জগতে তাকেই প্রকাশ করছেন অসুন্দরের প্রতি নতুন-জাগা অন্তরঙ্গ সখ্যতায়। অসুন্দরকে, বিসদৃশকে তাদের যথার্থ রূপে ও রেখায় প্রকাশ করার তীব্র ও বেপরোয়া ব্যাকুলতাই রবীন্দ্র চিত্রকলার সার্থকতা। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে এ-কথা তিনি বলতে পেরেছিলেন—"আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে—'বেশ সুন্দর হয়েছে', তখন আমি তা নষ্ট করে দিই, খানিকটা কালি ঢেলে দিই, বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি।" ছবি যতই তাঁর অন্তর্নিহিত ছন্দবোধে সমৃদ্ধ অজ্ঞাত-চেতনের সৃষ্টি হোক, সৃষ্টির পথে যখন ক্রমশ তারা তাদের ভগ্ন রুগ্ন বিকৃত বিসদৃশ অস্থিমজ্জাহীন অস্থিসার অস্তিত্বে, তাদের বাঁকাচোরা জলো জটিলতা, তাদের উদ্ভট অসম্ভব আজগুবি যত 'নির্বাধুনিক' আকৃতি নিয়ে 'ভলকানিক ইরাপসনের মতো' ফুটে বেরুতে লাগল, নিজের অতিমার্জিত, অভিজাত, নিখুঁত সৌন্দর্যরুচিকে অস্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ যে তাদের সজ্ঞান-চেতনায় সম্বর্ধনা না জানিয়ে পারলেন না—তার মূলে যা ছিল তা 'অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপ', ছিল সুন্দর সৃষ্টির সংকীর্ণ, সুকুমার, লালিত, নিরুত্তাপ জড়পিণ্ডতাকে ভেঙে খান্ খান্ করে তাকেই আবার

অসুন্দরের দেশে ফিরে তৈরি করার সুচিন্তিত সংকল্প। তাই তিনি ভারতের নবীন শিল্পীদের কাছে একদা প্রত্যাশা করেছিলেন তুলির পৌরুষ; তার বাঁট বজ্রের মতো শক্ত হবে; 'সর্বত্রই সে অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার লাভ করবে'; 'চারদিকে যা তুচ্ছ জিনিস আছে বা অসুন্দর, তার মধ্যেও সুন্দরকে দেখবার সাধনা' করবে; সে-তুলি 'মায়া-সরস্বতীর পায়ের তলায় আলতা দেবার তুলি হলে চলবে না।' 'কোনো রকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল যাতে জুড়ে দেওয়া যায় এমন জিনিস মেপেজুকে, দেখেশুনে তৈরি করলেই হল—এই যে-যুক্তি আমাদের শিল্পীরা যেন তা মেনে না নেন' এই ছিল আধুনিক শিল্পের কাছে তাঁর সহজ স্পষ্ট ঘোষণা।

হয়তো ইওরোপীয় চিত্রকলার নিত্য নব উন্মেষের দিকে তাকিয়েই এ-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি কিন্তু ভারতের অনাগত শিল্পের ক্ষেত্রে এই নতুন সম্ভাবনার ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার পথ যে উন্মুক্ত সে-সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়ের অভাব ঘটেনি এই কারণে যে ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের মহিমান্বিত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর অপরিচয়ের দূরত্ব ছিল না। সেখানে রূপকে অবলম্বন করে রূপাতীত সৃষ্টির প্রয়োজনে কীভাবে কখনো নটরাজের দুটি চঞ্চল পদক্ষেপের গতিছন্দে উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে-র বিশ্বলীলা, কখনো কীভাবে দশটি হাতের অলৌকিক সমাবেশেও উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে অপরূপ সামঞ্জস্য ও সুষমাময় শক্তির আরাধ্য প্রতিমা, কীভাবে মানুষের শরীরের মধ্যে মানুষকে ছাড়িয়ে আর এক সত্তাজগৎ জেগে ওঠে অবলীলায়, কীভাবে মানুষের সঙ্গে সেখানে মানবিক রেখারূপ ভঙ্গিমায় মিলিত হয় জীবজন্তু, পশুপাখি ও বনরাজি—তার সত্য মর্মোপলব্ধি ঘটেছিল তাঁর জীবনে। অনেক অনৈক্য সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিল্পসত্য যে-জায়গাটিতে এসে একাত্ম হয়, আধুনিক চিত্রকলার পরিণাম সম্পর্কে ক্লি-ক্যান্‌ডিনস্কি-র উপলব্ধিতে যা প্রকাশিত, সেই abstract meaning ও harmonization-এর স্থির কেন্দ্রবিন্দু থেকেই তাই তিনি তাঁর নিজের চিত্রকলায় একলা চলা শুরু করে দিতে পারলেন একদিন।

বলা বাহুল্য, শুরুতে সংকোচ ছিল প্রচুর। বারে বারে দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। 'আমি কি আর ছবি আঁকি, শুধু আঁচড়-মাচড় কাটি। নন্দলাল তো আমাকে শেখালে না; কত বললুম।' প্যারিসের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি বিপুল সম্বর্ধনা পাওয়ার পরও, এমন কি পল ভ্যালেরি ও আঁদ্রে জিদ-এর মতো কলারসিকদের দুর্লভ প্রশংসায় নিজের ছবিকে বিশ্বের 'আগামী যুগের আর্ট' জানবার পরেও একেবারে নিঃসংশয় হতে পারেননি।

> তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
> লেখনীর নটন-লেখায়।
> নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
> নিখিলের কাছাকাছি,
> যে সংসারে হতেছে বিচার
> নিন্দা প্রশংসার।
> এই আস্পর্ধার তরে—
> আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।

ঠিক যেখানে তাঁর সার্থকতা, সেখানেই সন্দেহ। 'নির্বাকের গুহা' থেকে আনা ছবি—হয়তো বা ছবি নয়। 'অতএব মৃত র‍্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোনো

লাঘব হবে না।' আজ আমরা জানি এই গুহা-চিত্র তাঁর নিজেরও যশের লাঘব করেনি এতটুকু। 'আমার আঁকা ছবি যখন দেখি, যেন কোনো অতীত কালের জিনিস বলে মনে হয়।' আমাদেরই যে প্রয়োজন ছিল এই অতীত দর্শনের, এই আদিম সারল্যের, দুঃসাহসিক কল্পনার, দুর্গম রহস্যের কথা নয়, কাহিনী নয়, চোখ-ভোলানোর ছলা কলা নয়, আমাদেরই প্রয়োজন ছিল আঁচড়ের, আভাসের, বঙ্কিম রেখার, বিবর্ণ বর্ণের, উদ্দাম গতির, উদ্ধত মেরুদণ্ডের।

"রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে আধুনিক কালের প্রিমিটিভ বলা হয়। এক হিসেবে মন্তব্যটি খুব সারবান্। যখন বস্তু-অনুকরণে বিদেশী আর্টিস্ট দিশা হারাল, তখনই তারা ছুটল আফ্রিকায়, টাহিটিতে, গুহায়, মধ্যএসিয়ায়, ভারতবর্ষে, চীন দেশে, জাপানে। এই সন্ধান আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে ও-দেশে চলেছে। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে এই সন্ধান দশ বৎসরের মধ্যে সীমায় আবদ্ধ। 'খাপছাড়া' ও 'চিত্রলিপির' চিত্রে আধুনিক সমগ্র ইওরোপীয় চিত্র-প্রচেষ্টা কেন্দ্রভূত, ঘনীভূত হয়েছে। চোখ মেলে দেখলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবিকতা, নাক, মুখ, চোখ ও দৃশ্যপটে পাওয়া যাবে। অথচ চিত্রগুলি যেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর কল্পনা। মনো-বৈজ্ঞানিক তাদের বলবেন—অবচেতনার বুদ্বুদ। একই কথা প্রায় আজকালের অবচেতনাতেই আদিমতা আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নামকরণ প্রধান নয়। ভুললে চলবে না যে নতুন সৃষ্টির শক্তি বাইরেকার চৈতন্যের নিচুতলাতেই জমা হয়ে যায় এবং বিপ্লবের সময় সেখানেও হাত পাততে হয়।" (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

তবু আমাদেরই প্রয়োজনে একটা কিছু নামকরণ করতেই হয় তাঁর চিত্রকলার। ছবিতে কোথাও নাম নেই কারো। তাঁর নিজেরই প্রস্তাব ছিল—"যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনামীকে নিজেরাই নাম দান করুন—নামহীনাকে নামের আশ্রয় দিন।" আলাদা আলাদা করে নাম নয়, তাঁর সমগ্র চিত্র-কলাকে কি নামে ডাকবো তবে?

অমিত একবার লাবণ্যকে বলেছিল—যদি আপত্তি না করো তোমার নামটাকে একটু ছেঁটে দেব।

—তা দাও।

—তোমাকে ডাকব বন্য বলে।

—বন্য!

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ বয়সের প্রিয়া' ছিল তাঁর ছবি। এবং তিনি তো স্বহস্তেই তার শরীর থেকে লাবণ্যকে বেশ একটু ছেঁটে দিয়ে গেছেন। সুতরাং নামকরণের এই অমিতাচার কি তাঁর গুহা-থেকে-আনা ছবির সত্য মর্যাদাকে কিছুমাত্র লজ্জিত করবে?

স্বাভাবিক ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ॥ শঙ্খ ঘোষ

এক

প্রায় আশি বছর আগে এক বাঙালি যুবকের মনে হয়েছিল, 'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাঙলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী' হবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি, যদিও পরবর্তী ষাট বৎসর কাল তিনি নিজেই ছিলেন এই ভাষার অপ্রতিহত সেই জাদুকর, ভাষার সমস্ত সম্ভাব্য রূপ ও শক্তির আবিষ্কার ও নিপুণ খেলায় যাঁর দীর্ঘ জীবন কখনো অবসন্ন হলো না।

ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি, তার মানে এই যে আজও কবিতার কোনো পত্রিকায় প্রায় সব রচনাতেই দেখব পয়ার ছন্দের ব্যবহার, সামান্য কোনো-শতাংশে হয়তো অপরাপর ছন্দের চর্চা। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে, বিশেষত উচ্চারণ ও কথন-রীতির স্বভাবভঙ্গিকে বাঙলা ছন্দ আর আয়ত্ত করতে চায়নি, এ-কথা নিশ্চয় সত্যি নয়। বরং আধুনিক কবিসমাজের কোনো কোনো নেতা কেবল গদ্য-পদ্যের সমন্বয়কেই তাঁদের অন্যতম ব্রত বলে গণ্য করেন। তবে কি ঐ যুবকের—যুবক রবীন্দ্রনাথের—মূল বক্তব্যই ছিলো ভ্রান্ত? স্বাভাবিক দিকে ছন্দের গতি কি তবে অনিবার্যভাবে ছড়ার ছন্দকে আহ্বান করে না? এমন-কি উপরোক্ত কবি-নেতারাও কেন তুষ্ট থাকেন কেবল পয়ারের গূঢ়-শক্তি আবিষ্কারে এবং নিতান্ত অমনোযোগ দেখান লৌকিক এই ছন্দটির প্রতি?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর ঐ উক্তির দায়িত্ব কিছুই পরে গ্রহণ করেননি এমন নয়, বরং তাঁর দৃঢ়-মনস্কতার একটা দিক নিযুক্ত থেকেছে অবজ্ঞাত কোণ থেকে এই ছন্দ-রূপটির উদ্ধারণে। রামপ্রসাদ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরবর্তী জীবনে প্রচুর ছড়ানো নেই, কিন্তু ছড়া আর বাউলগানের সঙ্গে তাঁর নিবিষ্ট যোগের কথা আমরা প্রবাদের মতো জানি। হতে পারে যে ঐ সব রচনাই তাঁকে এমন গভীরভাবে মজিয়েছিল যার থেকে তাঁর সৃষ্টিতে গৃহীত হলো এই ছন্দ, এবং তাকে দেওয়া হলো এমন এক শালীন মর্যাদা যা ইতিপূর্বে সে পায়নি। অর্থাৎ লৌকিক জগৎ থেকে সচেতন সাহিত্যজগতে এনে ছড়ার এই প্রতিষ্ঠা, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথেরই অন্যতম কীর্তি।

ইতিপূর্বে উনবিংশ শতকেও তাকে ব্যবহার করা হয়েছে হেলাফেলায়। একদিকে যেমন এর প্রচলনও ছিলো নিতান্ত অল্প, অন্যদিকে এমন-কি রবীন্দ্রনাথও তাকে ব্যবহার করেছিলেন বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে, কবিতার ভাব যখন লঘু। বালক বয়সেই যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ম্যাকবেথে ডাকিনীর ভাষাস্পন্দের স্বতন্ত্র লয় থাকা উচিত, তা কেবল তাঁর মতো প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু এই ডাকিনী বা দস্যু, বিদূষক বা শিকারীর কথার জন্যেই পৃথকভাবে এই ছন্দের ব্যবহার বিশেষ করে বুঝিয়ে দেয় কি তিনি ভাবছেন এই ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে। অর্থাৎ ছড়ার ছন্দ তখনও পর্যন্ত ঈশ্বরগুপ্তীয় চিহ্ন শরীরে বাঁচিয়ে রেখেছে, গুরু কিংবা গম্ভীর রচনায় তার প্রবেশ এখনও সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কেবল অভ্যাসের তাপ। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেরুল তাঁর 'সিন্ধুদূতে'র সমালোচনা যেখানে তিনি সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন: 'ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়' এবং 'এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছ বসি সাগরের তীরে' নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

এই দীর্ঘপংক্তিক পয়ারব্যবহারে তিনি খুঁজে পেলেন ভাষা ও ছন্দ স্বভাবের সর্বাঙ্গীণ পরিণয়। পরিণামে লিখলেন তাঁর আপাত-যুগান্তক সিদ্ধান্ত, 'যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাঙলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।'

অথচ যখন ভাবি এই প্রবন্ধরচনার সমকালে প্রকাশিত হয়ে গেছে সন্ধ্যাসঙ্গীত ও প্রভাতসঙ্গীত, এবং ছবি ও গানও প্রায় প্রকাশের কুলে, তখন ঈষৎ বিস্ময় বোধ হয়। যখন তিনি গৈরিশছন্দকে আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিনন্দন করেন, তখন তা খুব স্বাভাবিক লাগে এই কারণে যে তাঁর কৈশোরিক রচনাবলীতেই ভাঙা-ভাঙা সেই ছন্দ-সাধনার পরিচয় আমরা পেয়েছি যার পরিণত রূপের নাম মুক্তবন্ধ। কিন্তু ছবি ও গান পর্যন্ত, ইতস্তত-প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি কবিতার অস্তিত্ব সত্ত্বেও, এ-কথা কখনোই মনে হয় না যে কবির শিল্পীদৃষ্টির বিশেষ কোনো স্পর্শ লেগেছে বাঙলার এই স্বাভাবিক ছন্দের দেহে, সমালোচক হিসেবে যার সম্পর্কে এত তিনি উৎসাহী।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচক দৃষ্টি ও কবিদৃষ্টি সমবিন্দুতে এসে মিলিত হলো আরো অন্তত পনেরো বছর পরে, ক্ষণিকা-রচনার কালে। ক্ষণিকাতে কবির ব্যবহার দ্বিধাহীন, যেন একটা বড়ো রাজ্য-জয় সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন দৃষ্টি অন্য রাজ্যে—এবং তাকে তিনি অধিকার করে নিলেন মহিমান্বিত সম্রাটের মতো, 'নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে তুচ্ছ কথা'। তাঁর হাতে তুচ্ছ পেলো অতুচ্ছের সম্মান, 'গভীর সুরে গভীর কথা' এখন তিনি আর বলেন না বটে, কিন্তু ঈষৎ অনুকম্পায়ী কি দেখতে পান না স্বচ্ছ জলের নীল তলে তাঁর 'আপন ব্যথার নিজের কথা'?

হয়তো তবুও এ সন্দেহ থেকে যায় যে বাইরে এই চপল চলন ছিলো বলেই ক্ষণিকাতে সম্ভব হয়েছে ছড়ার ছন্দের ব্যবহার, তার দ্বারা যদিও প্রমাণ হলো যে এ-ছন্দে সুন্দর সাহিত্যিক রচনা সম্ভব, তথাপি সঙ্গে সঙ্গে কি নতুন করে এ-ও আবিষ্কার হলো না যে ছন্দে জাতিবিচার মানতে হয়, ছড়ার ছন্দে সম্ভব নয় গভীর কথা বলা?

কিন্তু কাকে বলে গভীর কথা? অবিশ্বাসী যখন ক্ষণিকাতে তা দেখতে পান না, তখন অবশেষে খেয়াতে নেমে আসে বিশ্বাসের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, দেখতে পাই লৌকিক ছন্দের আকর্ষণে অলৌকিক পৃথিবী কেমন করে এসে দাঁড়ায়, রচনা করে অপ্রতিহত এক ঘুমের দেশ। ইতিমধ্যে একবার তিনি শিশুর জগৎ পরিক্রমা করে এসেছেন ঐ বাহনে এবং উৎসর্গেরও একটা বড়ো অংশ ছড়া। এ-দুই গ্রন্থের মধ্যবর্তিতা তাঁর যে শুধু প্রত্যয় বাড়িয়েছে তা নয়, ছন্দের শক্তি আবিষ্কারেও এখন তিনি বহুদূর অগ্রসর। যাকে আমরা ভাবতুম মাত্র গানের ছন্দ বা লঘুতার, এইখানে এসে দেখি একদিকে তা যেমন স্নিগ্ধ ভাবাবহ-নির্মাণে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি সবল শক্তির ঘোষণাতেও তাঁর আর দ্বিধা নেই। একদিকে যেমন সুমিত স্বরান্ত অক্ষরে কবি তাকে দেখতে পান 'ঘরেও নহে পরেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে'—তেমনি অন্যদিকে 'তীব্র তড়িত হাসি হেসে বজ্রভেরীর স্বরে' জগতের 'শক্তিমূর্তি'র কথাও তিনি বলতে পারেন হলন্তের ছড়ানো-ছিটোনো প্রয়োগে।

যেন এই ছন্দের এ-কূল ও-কূল পাড়ি দিয়ে নিলেন খেয়ায়, তারপর তাঁর গানের জগতের অবসানে বলাকায় এলো মুক্তির আহ্বান। এই আহ্বান, যেমন পয়ারের তেমনি এই ছড়ার, মুক্তি আনলো শুধু বাইরের অর্থে, চরণবন্ধনের মুক্তি, প্রবাহকে হয়তো আরেকটু প্রখর করা হলো এই মাত্র। কিন্তু পলাতকায় এই প্রাকৃতছন্দের

সমিল মুক্তবন্ধ এবং পুনশ্চেতার অমিল মুক্তবন্ধ রূপের পর—বা, তার আগে—এই ছন্দে আমরা এমন কিছু দেখলাম না যাকে বলা চলে বাস্তবিক আবিষ্কার, ছন্দের অন্তর্গত কোনো পরিণতি বা পরিবর্তন। এ-পর্যন্ত কবি যা করেছেন তা নিশ্চয় এক জীবনের পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি। কিন্তু সেই যথেষ্টতে যখন তিনি নিজেই তৃপ্ত থাকেন না, ইন্দ্রিয়গুলিকে সতর্ক রাখেন আরো মুক্তির অন্বেষণে, আসতে হয় গদ্যকবিতা পর্যন্ত, তখন মনে প্রশ্ন ওঠে যে এই জগতের শেষ তাঁর দেখা হয়েছিল কি না, প্রায় বাল্যবয়সে যে অভিমত তিনি জানিয়েছিলেন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছিল কি না। অর্থাৎ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙলার সর্বৈব ছন্দোমুক্তি ঘটিয়ে, এই প্রাকৃতছন্দকেও তার সকল সম্ভাব্য মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন কি? ছড়ার ছবিতে এসে কিন্তু মনে হয় এই মুক্তিসন্ধানে এখন তিনি আর উৎসাহী নন, ঈষৎ ক্লান্ত তিনি, সচেতন মনের চাপকে খুলে দিয়েছেন একটুখানি, ফলে সাবেককেলে শিশুকে নিয়ে সাবেককেলে ছন্দে এলেন ফিরে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, দীর্ঘ জীবনের অবসানেও কবি তাঁর গূঢ়তম বাণীর জন্যে নির্ভর করতে পারলেন না সেই ছন্দের ওপর যাকে একসময়ে তাঁর মনে হয়েছিল বাঙলার স্বাভাবিক ছন্দ। তাই ছড়ার ছবির উল্টোপিঠে প্রান্তিক এবং জীবনের প্রান্তে থাকলো শেষ লেখা, দুয়েরই বাহন পয়ার, যদিও পৃথক স্পন্দে। ফলে, আধুনিক কালের কোনো কবি যখন বলেন 'বাকরীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন' তখন সে-কথা একরকম প্রমাণিত সত্য বলে মানতে আমরা বাধ্য হই।

দুই

বস্তুতই প্রমাণিত সত্য। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই, বিপ্লবেরও আভাস নেই। এক হিসেবে, দীর্ঘকালীন মধ্যযুগীয় কাব্যে যে পয়ার এত বড়ো মর্যাদা পেয়েছে তারও একটা নিহিত কারণ তার স্থিতিস্থাপকতা বা সেই 'অফুরন্ত সঙ্কোচন সম্প্রসারণশীলতা' যাকে স্বভাবের অনুকূল বলে গণ্য করা যায়। অনেক চাপ, এমন কি চৈতন্যচরিতামৃতের মতো দার্শনিক শক্তির চাপও সে এমন অনায়াসে সহ্য করে, স্বভাবের সম্মতি না থাকলে যা সম্ভবই হতো না।

হতে পারে যে সর্বত্র সে-সব রচনা কাব্য হয়নি। কবি যখন স্বাভাবিকতা বা গদ্যতান সৃষ্টি করতে উৎসুক, তখন গদ্যকে তিনি আয়ত্ত করেন ছন্দের প্রবাহে। কিন্তু মধ্যযুগীয় রচনাবলী যেহেতু এই প্রবাহের শক্তি আবিষ্কার শেখেনি, তাই গদ্য-পদ্যের এই নৈকট্য তাকে করে তুলেছে নিতান্ত প্রোজেইক। মধুসূদনের ছন্দ-চর্চা সেই কারণে বৈপ্লবিক। পয়ারের স্থিতিস্থাপক বহনক্ষম শক্তি যখন পেলো এক অর্গলহীন প্রবাহ, তখন থেকে তার প্রতিভা হলো সর্বগ্রাসী, ছন্দের ক্ষেত্রে প্রায় একেশ্বর।

শৈশবকালীন মাইকেলবিমুখিতা তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সব অর্থেই উপকারী ছিলো। কেননা সর্বগ্রাসী পয়ারের বাইরে অন্য কোনো ছন্দ-রূপ তাঁকে আবিষ্কার করতে হতো অন্তত আত্মরক্ষারও প্রেরণায়। একটু বিলম্বিত হলেও ঐ প্রেরণার ফল দেখতে পাব মাত্রাছন্দের রহস্য-আবিষ্কারে, এবং জানি না, হয়তো প্রাকৃত বাঙলার প্রতি তাঁর আগ্রহের এই আতিশয্যও তারই এক গাঢ় প্রতিক্রিয়া!

কিন্তু অন্যপক্ষে পয়ারকেও তিনি ত্যাগ করেননি,—আর কেনই বা করবেন। এবং মধুসূদনের পরেও ঐ ছন্দ থেকে ক্রমে তিনি আরো শক্তি নিংড়ে নিতে লাগলেন, তৈরি হলো প্রবহমান পয়ারের অবলীলা এবং প্রকৃতপক্ষে এই বিন্দু থেকেই আর সন্দেহ থাকলো না যে পয়ার দিয়েই সকল প্রকার রাজ্য জয়

সম্ভব হবে। মধুসূদনের ছন্দও—হয়তো সংস্কৃতপন্থার আতিশয্যে, হয়তো ছেদের বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে—স্বাভাবিক কথনরীতিকে সর্বাঙ্গীণ আয়ত্ত করতে পারেনি এবং ঠিক সেই উদ্দেশ্যও যে তাঁর চেতনায় খুব স্পষ্ট ছিলো না এমন সন্দেহ হয় তাঁর আবৃত্তিপদ্ধতি জানলে। মেঘনাদবধকাব্য তিনি আবৃত্তি করতেন প্রত্যেকটি শব্দে থেমে, কাটা কাটা উচ্চারণে, শব্দগুলি ঢেউয়ের মতো একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ত না, বরং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকত। এর থেকে উচ্চারণগত একটা উদাত্ততা আসত হয়তো, কিন্তু স্বাভাবিকতা যে আয়ত্ত হতো না তাতে সন্দেহ কী!

শব্দগত অপরিচয় এবং অন্বয়ক্লিষ্টতা অনেক সময়েই কাব্যছন্দ ও বাক্‌ছন্দের মিলনে স্বাভাবিক বাধা। রবীন্দ্ররচনার প্রথম যুগ থেকেই এই বাধা অপসৃত, অনেক মসৃণ হলো তাঁর ছন্দ এবং ফলত মানসী থেকেই পয়ার এমন এক বেগবান প্রবাহ অর্জন করল, কৃত্রিমতার দূরত্ব যা অনায়াসে মুছে নিতে পেরেছে। ফলত এই ছন্দে যখন কোনো কাহিনী রচনা করেন কবি, কিংবা নাটক, তখন তা একদিকে যেমন কবিতার মহিমময় সৌন্দর্য ধারণ করে থাকে অন্যদিকে তেমনি লোকভাষার জীবন্ত স্পন্দন প্রায় তুলে ধরে তার আয়তনের মধ্যে, দেবতার গ্রাস বা গান্ধারীর আবেদন যার উদাহরণ।

এই শেষ বাক্যে 'প্রায়' কথাটি ব্যবহারের একটা বড়ো উদ্দেশ্য আছে। ঐ কাহিনী বা নাটকে ভাষার স্বভাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত হবার পরও যেটুকু বাকি থাকল তা চলিতক্রিয়া প্রয়োগ। রচনার অভ্যন্তরে নিমগ্ন হবার পরে আমাদের সচেতন চিন্তা প্রায়ই ভুলে যায় যে দুর্যোধন 'সুখী নই' বলে না, বলে 'সুখী নহি' কিংবা 'আজে'র পরিবর্তে 'অদ্য'।

সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে
একত্র আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্মহীন গর্বহীন দীপ্তিহীন সুখে।

কিংবা—

রাজদণ্ড যতো খণ্ড হয়
ততো তার দুর্বলতা, ততো তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুন্নত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন 'পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার।

এই সমস্ত অংশের স্রোত যখন ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন তার প্রবল জোরটাই আমাদের অন্য কোনো দিকে মুখ ফেরাতে দেয় না, এই ভাষাকে আমরা ততটাই সাধু ভাবতে পারি যতটা সাধু জীবনস্মৃতি বা চতুরঙ্গের ভাষা। চতুরঙ্গে যেমন সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার সত্ত্বেও তার স্পন্দটা মূলত চলিত, প্রবাহ অনর্গল-পয়ারে

ব্যবহৃত এই সব অংশেও ভাষার প্রায় ততটা স্বাভাবিকতাই আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু বুঝতে পারি যে কবি এতে তুষ্ট নন। বেশ মনে হয় যে 'স্বাভাবিক দিকে ভাষার গতি' অর্থে তিনি চলিত ক্রিয়ার ব্যবহারকেই বোঝেন, এণ্ডার্সনকে লিখিত চিঠিতে 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে'র পরিবর্ত রূপ 'যতো কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে'র উল্লেখ থেকেও তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু চলিত এই রূপ—যেমন গদ্যে তেমনি পদ্যে—সাহিত্যের অনুশাসকদের ঈষৎ ভয় করেছে, সবুজপত্র থেকে চলিত গদ্যের শক্তিমান প্রতিষ্ঠার আগে সে খুব নির্ভয়রূপে পদ্যেও প্রকট হয়নি।

নির্ভয়রূপে হয়নি, কিন্তু তার ব্যবহার ছিলো। ছড়ায় বাউলে রামপ্রসাদে আছে এই ভাষা, এবং রবীন্দ্রকাব্যেও আছে সবুজপত্রের আগেই—কিন্তু প্রথমোক্ত রচনাগুলি যেমন ঈষৎ অবজ্ঞাত ছিলো, রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনাবলীও তেমনি লঘুতা বা অলৌকিকতার দুই মেরুতে স্থিত। ঠিক এই কারণেই কবিকে সাধু আর অসাধু ছন্দের ভেদ কল্পনা করতে হয়েছে ভাষাভেদ অনুসারে। অল্প বয়সের চলিত গদ্য রচনার সঙ্গে ভবিষ্যতের বাঙলা ছন্দের এই স্বভাব-অনুগামী হবার স্বপ্ন মিলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি ভাষার চলিত রীতির প্রতি কবির আগ্রহ আবাল্য, প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের বহুপূর্ব থেকে তাঁর চিত্তভূমি প্রস্তুত ছিলো ঐ নবীন সতেজতার জন্যে। সন্দেহ নেই যে সবুজপত্রের যুগ তাঁকে অনেক বেশি পরিবেশগত প্রশ্রয় দিয়েছে, ফলে যাকে বলা হতো তরল ছন্দ বা লঘুভাবের উপাসক—তার ব্যবহারে এখন রচিত হলো দীর্ঘ-পংক্তিক সেই কবিতা "যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো। সকল হিয়ার পরশ দিয়ে," —তখন সেখানে আমরা শুনতে পেলাম প্রায় পয়ারের সেই গূঢ় স্পন্দন, যদিও তার ছন্দ ছড়ার।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর ছন্দ ওর স্পন্দনে মেলাবার এই সুন্দর সম্ভাবনাময় সাধনা কবি খুব বেশি আর করলেন না। অন্যপক্ষে, এই ভেদও তিনি অন্যায়রকম মনে রাখলেন যে পয়ারে ব্যবহৃত হতে পারে সাধু ক্রিয়াপদ, আর চলিতের জন্যে চাই ছড়ার ছন্দ।

পুরনো অভ্যাসই অবশ্য এর একমাত্র কারণ নয়। প্রথমাবধি কবি সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন যে সাধু ও চলিত ভাষার মূল প্রভেদ হস্-ধ্বনির ব্যবহারে। এবং পয়ার ছন্দের এই প্রাচীন দুর্বলতাও তাঁকে পীড়া দিয়েছে যে এখানে 'হসন্ত শব্দকে আমরা আমল দিই না।' তার মানে এই যে 'চলছি' কথাটি পয়ারের স্বভাবে তিন মাত্রার মূল্য পায়, অথচ আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে তার মাত্রা বস্তুত দুই। এমন কি 'সিন্ধুদূতে'র সমালোচনায় কবি এতদূর পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন যে 'মন বেচারির কী দোষ আছে' এর উচ্চারণ-অনুসারী বিন্যাস হওয়া উচিত 'মন্‌বেচারি কী দোষাছে।'

উচ্চারণগত এই স্বভাব রক্ষা না করলে পয়ারে চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার ক্লান্তিজনক কৃত্রিমতায় পূর্ণ হতে পারে, এ আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের ছিলো হয়তো। সেইজন্যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কবি তাঁর পয়ারে স্বভাবতই এই ক্রিয়াকে যথেচ্ছ গ্রহণ করতে পারেননি, শেষ কবিতার ছলনাময়ীকে যদিও বলেছিলেন 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' বা 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 'তাহার গৌরব' 'কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে' বা 'ছলনা সহিতে'র মতো ব্যবহারও তো করতে হলো। কেবল শেষ কবিতায় নয়, সাধু ও চলিত ক্রিয়ার মিলনগত এই স্বৈরাচার বহুপূর্ব যুগ থেকেই প্রচলিত, একে নিছক চলিত ব্যবহার আমরা কখনোই বলব না, এবং এর একটা দিকনির্ণয়ী সূত্রও হয়তো আমরা লক্ষ্য করতে পারব। সেই সমস্ত চলিত ক্রিয়া তিনি প্রথম থেকেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত যার সমস্তটাই স্বরসমন্বিত, যা হসন্ত মধ্য

নয়। 'অনায়াসে যে পেরেছে' এ-কথা যিনি অনায়াসে লেখেন পয়ারে, তিনি ঠিক তার সঙ্গে কেন বলেন 'ছলনা সহিতে'? কেননা ঐ ক্রিয়াপদের চলিতরূপ 'সইতে'র মধ্যবর্তী অংশটা এমনি নেমে গেল যার দ্বারা তাকে পূর্ণ মাত্রা মূল্য দেওয়া সঙ্গত নয় বলে কবি সহজেই বুঝতে পারেন অথচ তাকে দ্বি-মাত্রায় ব্যবহার করার সুযোগও তিনি নেন না। প্রথম যুগের কবিতাতেও ঠিক ঐ একই শ্রুতিচেতনা তাঁকে 'মরিতে চাহি না আমি'র সঙ্গে সঙ্গে 'ফেলে দিয়ো ফুল' লিখতে বাধা দেয় না।

কিন্তু মধ্যবর্তী খুব সংক্ষিপ্ত একটি সময় এসেছিল যখন রবীন্দ্ররচনার পূর্ণাঙ্গ চলিতরীতি ব্যবহৃত হয়েছে পয়ারের আয়তনেই। আমরা ভাবতে পারি পরিশেষের সেই অল্প কটি কবিতা, যার অনেকটা পরে গৃহীত হয়েছে পুনশ্চতে, পত্রলেখা বা বাঁশির মতো কবিতা। ঐখানে যেমন একটা অজানিত দুঃসাহস করেছেন 'আকবর বাদশার সঙ্গে' পদটির অষ্টমাত্রিক ব্যবহারে, অজানিত কেননা এর সচেতন প্রবল ব্যবহার রবীন্দ্রকাব্যে অত্যন্ত অল্প, একটা রুদ্ধ দুয়ার তাই তাঁর হাতে খুলতে খুলতেও খুলল না, পরিশেষে সম্ভব হলো না মানসীর মতো আরেকটা বিপ্লব—অন্যদিকে তেমনি এ-সব ক্ষেত্রেই পাই এমন ব্যবহার: 'লিখতে বসেছি চিঠি' 'মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি কুঁকড়ে গিয়েছে' 'যাই তাকে খাইয়ে আসি গে'।

প্রবোধচন্দ্র আশ্চর্য বোধ করেছেন এই দেখে যে অন্য কোনো কাব্যে ও-রকম প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়া হয়তো অনুচিত। পরিশেষের পূর্বে নেই তা স্বাভাবিক, কিন্তু পরিশেষের পরেও যখন নেই তখন তার অন্য একটা ইঙ্গিত কি আমরা আবিষ্কার করতে পারি না? পরিশেষের ঐ ব্যবহারগুলির একটা অসঙ্গতি কবির শ্রুতিতে ধরা দিয়েছিল বলে বিশ্বাস হয়, কেননা যে-মাত্রায় ঐ শব্দগুলিকে রাখা হয়েছে সেভাবে পড়তে গেলে উচ্চারণে একটা কৃত্রিমতা অনিবার্য, আবার উচ্চারণের স্বভাব ঠিক থাকলে ঐ সব অংশে ছন্দ ভূমিসাৎ হয়, তাতে এসে যায় গদ্যের টান। 'লিখতে বসেছি চিঠি' 'উঠত না শঙ্খধ্বনি' 'লেখা করলেন শুরু'—এই অংশগুলি আটমাত্রায় বসাতে গেলে লি, উ বা ক-এর উপর এমন একটা টান পড়ে যাতে পরবর্তী অংশ খুব শিথিল শোনায়। ঠিক সেই রকম 'ঘরেতে এলো না সে তো' 'দেয়ালেতে মাঝে মাঝে' 'শেয়ালদা ইষ্টিশানে'-এর চিহ্নিত অংশগুলিকেও আনতে হচ্ছে নিতান্ত ছন্দ রক্ষার প্রেরণায়। বস্তুত, শ্রুতিগত এই দুই পীড়াকর অসঙ্গতি বর্জন করে ভাষার স্বাভাবিক রীতিকে পূর্ণাঙ্গ করবার পরবর্তী প্রেরণাতেই পুনশ্চের জন্ম সম্ভব হলো। কবির গদ্য কবিতা সৃষ্টির পশ্চাৎপটে অন্যতর বহু হেতুক অস্বীকার না করেও বলা সঙ্গত মনে করি যে পরিশেষের দুর্বলতাগুলি মুছে নেবার এক উল্টো প্রয়াস থেকে এলো পুনশ্চের কবিতা, যার পর থেকে হসন্ত মধ্য চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার কবিকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করত গদ্যছন্দের অভিমুখে।

উল্টো প্রয়াস এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের সমকালেই তরুণতর কবি সম্প্রদায়ের সাধনায় এই দুর্বলতা মোচনের অন্য একটি দিগন্ত একটু একটু করে দেখা যাচ্ছিল। 'পদাতিকে'র কবি কিশোর যে পয়ারগত বিপ্লবের স্পষ্ট রেখা তৈরি করলেন, ইতিপূর্বে বুদ্ধদেবের রচনাতেও দেখা দিয়েছে তার ঈষৎ আভাস। এই বিপ্লবের ফলে আমরা জানলুম পয়ারে মধ্যবর্তী হসন্তকে ইচ্ছে করলেই আমরা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে মাত্রা কমিয়ে দিতে পারি। 'কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু খোঁজা করে'র পরবর্তী লাইন অনায়াসে হলো 'অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে'—ইচ্ছে করলে যাকে লেখা যায় 'অনেকদিন খিদিপুর্‌র ডকের অঞ্চলে' এই চেহারায়। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেবও লিখছেন 'বিশুষ্ক বীরভূম' বা 'আমরা আজ দুঃসাহসী'র মতো শব্দগুচ্ছ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই আয়োজন যে ছন্দ-তত্ত্বের সুকল্পিত অধ্যবসায়ের ফল এমন নয়। তাঁর নির্ভর

ছিলো একান্তভাবেই তাঁর শ্রুতি এবং তাঁর আদর্শ ছিলো জনতার স্বাভাবিক মুখের ভাষা। অন্যপক্ষে, তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ জানতেন আধুনিক পয়ারে এই হওয়া উচিত হস্-ধ্বনির প্রাপ্য অথচ তাঁর রচনায় এর সজ্ঞান প্রয়োগ প্রায় দেখি না বললেই চলে। 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত' লিখে যে নীরেন রায় কিছুমাত্র অপরাধ করেননি, দিলীপকুমারকে কবি তা সুন্দর বুঝিয়েছেন। কিন্তু ঐ 'একটি'কে যে পয়ারে তিনি নিজে প্রায় কখনোই দু-মাত্রায় ব্যবহার করেন না তাও সত্যি। ছন্দ-ব্যাখ্যার সময়ে এই ব্যবহারের নিদর্শন যখন তিনি রচনা করেন :

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, শুঁট্‌কি দেখো চেখে।

তখন ঐ কমা দুটির প্রয়োগ সত্ত্বেও রচনায় কি ছড়ার তালটাই বড়ো হয়ে ওঠে না? পয়ারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই উদাহরণ বা এর পূর্ববর্তী 'একটি কথা শুনিবারে তিনটি রাত্রি মাটি' খুব যে ভালো আদর্শ নয় তা স্বীকার করতে হয়। এই ব্যবহারে তিনি অবচেতনে-অভ্যস্ত নন বলেই তাঁর হাতেও এমন বিপদ ঘটলো।

রবীন্দ্র পরবর্তীদের পক্ষে ছড়ার ছন্দের আকর্ষণ যে আর বেশি বেঁচে রইল না তার কারণ এখন বোঝা যায়। অনায়াস-চলিত ব্যবহার এবং বাক্‌স্পন্দের সৃষ্টিতে তাঁদের স্বাভাবিক উৎসাহ পয়ারেই প্রশ্রয় পেলো। তার অনিয়মিত পদভাগের প্রবাহ এবং চলিত ক্রিয়ার যথেচ্ছ সঙ্কোচন-প্রসারণ শেষ পর্যন্ত অবাধ স্বাধীনতা দিলো এই কবিদের।

আর রবীন্দ্রনাথ, ক্রিয়াপদের এই ব্যবহারটিকে তিনি আনলেনই না পয়ারে, তিনি তুষ্ট থাকলেন অনেক সময়েই সাধু-চলিতের মিশ্রতাজাত পদ্য ভাষায়। এই তুষ্টি তাঁর কেন এলো ভাবলে অবাক লাগে, আর যখন তাকে ভাঙতে চাইলেন, আনতে চাইলেন পরিপূর্ণ চলিত ভাষা, তখন—যে কথা আগে বলেছি—তাঁর টান হলো অনিবার্যভাবে গদ্যছন্দের প্রতি। অর্থাৎ একদিকে পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা, বিচিত্র বন্ধুর তান, অনর্গল প্রবাহ, অন্যদিকে মৌখিক আলাপচারিজাত গদ্য কবিতার ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথিত সেই স্বাভাবিক ছন্দটিকে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারলেন না, তাকে দিতে পারলেন না উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো প্রসার। সে বাঙলার দ্বিতীয় ছন্দ হয়ে থাকল তো বটেই, কখনো কখনো এমন-কি তৃতীয় মনে হয়—তদুপরি প্রথমের সঙ্গে তার ব্যবধান প্রায় রাজা-প্রজার দূরত্ব ভাবিয়ে দেয়।

তিন

কিন্তু কেবলই কি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন? অথবা লৌকিক এই ছন্দ-রূপটির ভিতরেই ছিলো এমন কোনো দুর্বলতা যা চলিত বাক্-স্পন্দের প্রতিকূল?

বাঙলা ভাষার স্বভাব এই যে তার প্রতিটি শব্দের আদিতে ঝোঁক পড়ে না, ইংরেজি বা সংস্কৃতের প্রস্বর-বিধি এখানে অচল, এ-ভাষায় ঝোঁক থাকে শব্দগুচ্ছে বা বাক্যাংশে। 'এখন আমরা কোথায় যাব?' এই সম্পূর্ণ বাক্যটিতে স্বভাবত একটিমাত্র ঝোঁক পড়তে পারে এবং সেই ঝোঁকটির সন্নিপাত কোন্ শব্দে তার উপর বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ নির্ভর করবে। কিন্তু যদি, ধরা যাক, লৌকিক ছন্দের অন্তর্গত করতে হয় ঐ বাক্যকে, যদি লেখা হয় 'এখন আমরা কোথায় যাব কোন্ অজানা দেশে'—তাহলে বাক্যের সবটাই

থাকল বটে, কিন্তু ঐ স্পন্দ প্রায় কিছুই থাকল না। তার কারণ ঐ অংশটি পড়তে চারটি আঘাত লাগছে, এবং ঐ আঘাতগুলির দ্বারা একরকম তরঙ্গ উত্থিত হলেও তার স্বাদ হচ্ছে একেবারে স্বতন্ত্র।

বস্তুত, এই কৃত্রিম শ্বাসাঘাতজনিত ছন্দস্পন্দ নির্মাণ এবং অতিনিরূপিত বৈচিত্র্যহীন পর্বসন্নিবেশই ছড়ার ছন্দের প্রধানতম দুর্বলতা। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন যে স্বাভাবিক ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ ঐটে, কিন্তু প্রৌঢ় বা বৃদ্ধবয়সেও যে তার দুর্বলতার কথা তিনি বলেননি বা সেই দুর্বলতা মোচনের সাধনা করেননি তা ভাবলে বিস্ময় লাগে।

এই সাধনার কোনো সম্ভাব্য পথ ছিলো কি?

ছেলে ভুলোনো ছড়া রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-ও জানেন যে এই ছন্দ এখনো ভাঙা-চোরা, অমার্জিত, অসংস্কৃত। তাঁর নিজেরই রচনায় অবশেষে এ-ছন্দের যে রূপ তৈরি হলো তার প্রতি পর্বে বিন্যস্ত হলো চারটি অক্ষর বা সিলেবল্। এর একটা সুবদ্ধ রূপ তিনি আনলেন, যেমন নির্দিষ্ট আঁটোসাঁটো নিয়মের বন্ধন তিনি অন্য প্রতি ছন্দেই তৈরি করেছেন। রবীন্দ্রসাধনার একটি বৈশিষ্ট্য আমরা এই লক্ষ্য করি যে তাঁর প্রথম যৌবনেই ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী জীবনের অনেক ভঙ্গি, ফ্রী ভার্সের কিছু আভাস, মুক্তবন্ধ—কিন্তু তখনই তিনি ঐসব মুক্তিকে বিশদ করতে উৎসুক না হয়ে বরং আগে বন্ধনটা তৈরি করেছেন। তা না হলে যা হতো তা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। ফলে ছড়ার ছন্দের যে নির্দিষ্ট বন্ধ তিনি তৈরি করলেন তা তাঁর সাধনার সঙ্গে খুব সঙ্গতিপূর্ণ, সাহিত্যিক আয়োজনে ব্যবহৃত হবার ভূমিকা স্বরূপ এই ছিলো ছড়ার ঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু এই বন্ধটি একবার প্রস্তুত হয়ে যাবার পর এখান থেকে কবি কি আর মুক্তির সন্ধান করেছিলেন? হয়তো না।

যাকে বলা যায় তিন অক্ষর বা পাঁচ অক্ষরের পর্ব, রবীন্দ্রনাথ ছড়ায় তা প্রায় ব্যবহার করেন না বলে প্রবোধচন্দ্র তৃপ্তি বোধ করেছেন। এমন-কি তিনি এ-ও জানিয়েছেন, মধুসূদনের 'যেমন কর্ম ফলল ধর্ম বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' পদটির তৃতীয় পর্ব নিতান্ত ত্রুটিদুষ্ট। অথচ ছড়ায় এ-রকম পর্ব অনর্গল তো বটেই, এমন-কি এর দ্বারাই হয়তো ছড়াকারেরা বৈচিত্র্যের একটা আস্বাদ নিতেন। 'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়লো' বলতে কোনো বাঙালি শিশু বিপন্ন হয় না। উক্ত ছড়ার অধিকাংশ পর্বেই পাঁচ মাত্রা এবং আমরা জানি যে ঐ সন্নিবেশ এ ছন্দের এক প্রাথমিক ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল পর্বগুলিতেই একটা সমতল সমতা এনেছেন তাই নয়, এই সমতায় আরো কয়েকটি অলিখিত নিয়ম তিনি মেনেছিলেন। সেই নিয়মের বশে একটি পর্বে চারটি হলন্ত অক্ষর ব্যবহার করতে তিনি রাজি ছিলেন না, তিনটি হলন্ত থাকলে চারটি অক্ষরের প্রয়োজনই বোধ করতেন না। দুটি হলন্ত দুটি স্বরান্তই এর সবচেয়ে প্রশস্ত ব্যবস্থা, কিন্তু এমন-কি সেখানেও এদের বিন্যাসে প্রায় গাণিতিক একটি নির্দেশ মানতে কবি সম্মত ছিলেন। — — ⌣ ⌣ বা ⌣ ⌣ — — এ-ছন্দে খুব কমই ব্যবহৃত; — ⌣ — ⌣, ⌣ — — ⌣, ⌣ — ⌣ —, — ⌣ ⌣ — এই কটি রূপই এর সহজ স্ফূর্তি আনে। চারটি স্বরান্ত অক্ষরের ব্যবহার মাঝে মাঝে আসে বৈচিত্র্য হিসেবে।

উপরোক্ত যে-বিন্যাসগুলি কবি সমূলে বর্জন করতে চেয়েছেন বা কমই ব্যবহার করেছেন, আপাতশ্রুতিতে সেখানে কটুতা আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে অনভিপ্রেত আঘাত যে অপ্রস্তুত শ্রুতিকে উত্তেজনা-জনিত সুখ দেয় তাতে সন্দেহ কী!

এখন প্রশ্ন এই যে কটু শোনায় কেন। যখন দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন 'অনেক বাক্য' হানাহানি, গর্জনবর্ষণ অনেকখানি' তখন ঐ গর্জনবর্ষণে যে অনেকের কান বিপন্ন হবে তা সত্যি। তা হবে এই জন্যে যে প্রথমাবধি এই ছন্দ আমরা সেই অতিরিক্ত ঝোঁকের দ্বারা পড়তে অভ্যস্ত যা বাঙলাভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং সেই ঝোঁকে যে চারমাত্রার পর্ব তৈরি হয় তার অল্প অবসরে গর্জনবর্ষণের মতো অতখানি ওজন চাপানো সম্ভব নয়। অক্ষর যতই থাকুক, ধ্বনি তো ওখানে স্পষ্টই অনেক বেশি, 'অনেক বাক্য' এবং 'গর্জনবর্ষণ'কে একই সীমায় আনতে আমাদের জিহ্বা নিতান্ত ত্রস্ত এবং শ্রান্ত বোধ করে, আর সেই শ্রান্তিতে কান অপ্রসন্ন হয়।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে উক্ত পংক্তিটি অনিবার্য কোনো ছন্দ-দোষ বহন করে। অতিরিক্ত ঝোঁকের ঐ প্রেরণাকে বর্জন করে—এবং তা বর্জন করা নিতান্ত অসম্ভব নয়—যদি স্বাভাবিক বাক্‌স্পন্দে ওকে উচ্চারণ করি, তাহলে দেখতে পাব ঐ চরণে মূল দুটি অংশ : 'অনেক বাক্য হানাহানি' এবং 'গর্জনবর্ষণ অনেকখানি'। তখন, এই প্রসারিত আটমাত্রার আয়তনের মধ্যে 'গর্জনবর্ষণ' অনেকটা শান্ত জায়গা পায়, তার তাড়া কমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিকটুতা দূরে যায়। আমি অবশ্য বলছি না যে এমন-কি দ্বিজেন্দ্রলালেরও খুব একটি নিপুণসুন্দর লাইন ওটি, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের ব্যবহৃত ঐ লাইনটির দ্বারা আমি দেখাতে চাইছি যে এ-জাতীয় পর্ব-বিন্যাসই প্রকৃতপক্ষে ছড়ার ছন্দকে তার অভিপ্রেত মুক্তি দিতে পারতো, সুবদ্ধ পর্বরূপে অভ্যস্ত থাকতে রাজি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যার ব্যবহার একেবারেই করলেন না। এ ছন্দে প্রতি পর্বের মাপ চারের এবং তার ওজন ছয়ের, কবির এই সিদ্ধান্ত যদিও সূক্ষ্মশ্রুতির পরিচায়ক, এই ছন্দের আকৃতি প্রায় পুরোই ধরা পড়ে ঐ এক কথায়,—তথাপি এই সিদ্ধান্তই তাঁকে একটা নির্দিষ্ট রেখার ওপারে যেতে দেয়নি, তাও সত্যি।

তখন কথা উঠতে পারে যে উপরোক্ত ঐ পর্বভাগে এবং বিশেষত প্রস্বরের অভাবে ছড়ার জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর থাকলো কোথায়, সে তো হয়ে উঠলো প্রায় পয়ারেরই সগোত্র। ঠিক এই কথাই বলবার অভিপ্রায় আমার, এতক্ষণ আমি কথার এই পরিণতির দিকেই আসতে চাইছি যে বাঙলা ছন্দ একটা জায়গায় গিয়ে পয়ার এবং ছড়ার মিলনবিন্দু খুঁজতে পারে। তার একটা সুবিধা হয়তো এই যে পয়ারের সঙ্কোচন-প্রসারণ প্রবণতাকে আরো অনেকটা এগিয়ে নেওয়া যায়, তার অধিকারে পাই প্রায় সমস্তটা জগৎ। 'গর্জনবর্ষণ' মাত্রা-ছন্দে আটমাত্রা, ছড়ার নতুন ব্যবহারে তাকে হয়তো নিয়ে আসা যাবে স্বাভাবিক চারে, পয়ারের সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও এখনো ঐ শব্দগুচ্ছ সেখানে ছ মাত্রার কমে তুষ্ট হবে না। তার মানে এই নয় যে ঐ রকম প্রবল এক শব্দগুচ্ছের মাত্রা যথাপরিমাণ কমিয়ে দেওয়াতেই ছন্দরচনার একমাত্র সার্থকতা, তার মানে মাত্র এই যে প্রয়োজনমতো ছোটোবড়ো সব ব্যবহারেই শব্দগুলি অভ্যস্ত হতে পারবে। মধ্যযুগীয় রচনার যে-সব টুকরো অংশে ছান্দসিকেরা কবিদের ছন্দদোষের কথা বলেন, উল্লেখ করেন যে পয়ারের মধ্যবর্তী এই অংশ সহসা ছড়ার দোলা দিচ্ছে—সে সব উদাহরণ বস্তুত এটাই প্রমাণ করে যে এ দুয়ের মধ্যে একটা আত্মিক যোগাযোগের সম্ভাবনা প্রায় প্রথমাবধি বর্তমান। বুদ্ধদেব অতর্কিতে একবার এদের এই চারিত্রিক সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন, 'ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি'র মতো অনায়াস পয়ারপংক্তি লক্ষ্য করেছিলেন রাবিন্দ্রীক এক ছড়ার সূচনায়, কিন্তু এই চাবি দিয়েও তিনি এই মিলনের কোনো রহস্য উন্মোচনে এগিয়ে আসেননি। বরং এর সুনিরূপিত মাপের কথা মনে রেখে এইটেই বলেছেন

যে 'অনেক কথা আছে যা এ ছন্দে ঢোকে না, অনেক ভাব আছে যা এ ছন্দ বহন করতে পারে না।' গাম্ভীর্য এর প্রকৃতিগতই নয়, তাঁর এই সিদ্ধান্ত পুরনো এবং ঈষৎ ভ্রান্ত, কিন্তু এর ক্লান্তিকর বৈচিত্র্য-হীনতার দুর্বলতা ছন্দ-চেতন হয়েও তিনি দূর করতে উৎসাহী হননি। ঠিক সে সাধনা না থাকলেও অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কাব্যচর্চায় এই ছন্দটিকে বরং অধিকতর সম্মানে তার স্তিমিত চলন থেকে মুক্তি দেবার ঈষৎ চেষ্টা করেন 'অবগাহনের প্রতি পলক চেতনা ঢালে অচঞ্চল' বা 'প্রকাণ্ড গাছ প্রকাণ্ড বন বেরিয়ে এলেই নেই'—এর মতো ক্বচিৎ-কখনো রচনায়। কিন্তু এর দ্বারাও প্রত্যাশিত সেই মিলন আমরা পাচ্ছি না, পাচ্ছি মাত্র অসমতল বন্ধুরতার তৃপ্তি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে তাঁরই পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-চর্চায় এই পয়ার-ছড়ার মিলন-মুহূর্ত যেন প্রায় আবিষ্কৃত হতে চলেছিল। আলেখ্য-গ্রন্থের সে-সব ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রলাল যে পরিপূর্ণ সিদ্ধি অর্জন করেছেন তা মনে করা নিশ্চয় অসঙ্গত, কিন্তু প্রবলতর প্রতিভার হাতে তা কি সম্পূর্ণতায় পৌঁছতে পারতো না?

সেই প্রবলতর প্রতিভা এই সাধনায় নিযুক্ত হয়নি। আর হয়তো তারই ফলে পরবর্তী কবি-নেতারাও পয়ারেই নিমগ্ন, অত্যন্ত সাম্প্রতিক দু একজন কবি ভিন্ন এই অবিজিত জগৎটিতে কেউ এসে দাঁড়াতে উৎসুক নন। যদি তা দাঁড়াতেন, তাহলে হয়তো আমরা দেখতাম যে দিলীপকুমারের 'স্বরাক্ষরিক' নামক পৃথক কোনো ছন্দ-পরিকল্পনা অবান্তর, প্রকৃতপক্ষে ছড়ার স্বভাবের মধ্যেই আছে তার মুক্তির প্রত্যাশা এবং সেই মুক্তি একদিকে যেমন তাকে করে নিতে পারে পয়ারের আত্মার সঙ্গে লীন, অন্যদিকে—মাত্র তখনই—তার থেকে পেতে পারি আমরা বাঙলার স্বাভাবিক ছন্দ, শুধু চলিত ক্রিয়াপদে নয়, চলিত বাক্-স্পন্দে। হয়তো তখন রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু সফলতা আমরা দেখতে পাব। ভবিষ্যতের বাঙলা ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দ হবে না বটে, কিন্তু সেই ছন্দেরই এক মুক্ত রূপ হতে তার বাধা কী?

গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ ॥ হরপ্রসাদ মিত্র

মোপাসাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁস ছোট একটি ছড়ার উল্লেখ করেছিলেন :

And the little dolls
Run, run, run
Three times round
And then they are gone.

মোপাসাঁর গল্পগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে ব্যর্থ কয়েকটি প্রাণী—ভাগ্যের হাতের পুতুলের মতো তারা অসহায় ; তারা আমাদের চোখের সামনে দু'দিনের জন্য দেখা দেয়, তাদের ব্যর্থতায়, তাদের গভীর হতাশায় আমাদের অভিভূত করে নিমিষেই তারা শেষ হয়। মোপাসাঁ সুনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন না। অন্ধ-আতুরের জন্য সংকট প্রাণ সমিতি খোলবার পরামর্শও দেন না। ক্ষণিকের জন্য একটি ছবি দেখিয়েই তিনি অন্য ছবিতে মন দেন। তারপর···তারপর আর কি? আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন, "His indifference is equal to that of nature, it astonishes me, it irritates me."

গল্পগুচ্ছের পাঠকদের মনের কথা হচ্ছে এই। গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের শেষে স্বতঃই বলতে হয়, "It astonishes me, it irritates me." সাধারণ মেয়ের মুখ দিয়ে শরৎবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদনটি মনে পড়ে। কিন্তু সাধারণ মেয়ে অসামান্য নয়; তাই তার জিত হোক ভাবলেই তার জিত হয় না। অনেক পরাজয়ের ইতিহাস তার চোখে মুখে, তাইতেই তার সৌন্দর্য। সে যা, সে তাই।

ছোট গল্পের আঙ্গিকের প্রধান দুটি বিশেষত্বের একটি হল এই objective বা নৈরাত্ম্য দৃষ্টিভঙ্গি; দ্বিতীয়টি গল্পের বক্তব্য ও পরিমাপ-নির্দেশক। এডগার অ্যালেন পো লিখেছিলেন, আধঘণ্টা থেকে দু ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায়, এমন একটি কাহিনীই ছোট গল্পের উপযোগী। জীবনের বিশেষ একটি ঘটনা, মনের বিশেষ একটি ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে নাটকীয় রীতিতে—এই হল ছোট গল্পের আদর্শ।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে এই আদর্শের নিখুঁত প্রকাশ চোখে পড়ে। কিন্তু সেইটেই বড়ো কথা নয়। মনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার মননে, তার সৃষ্টিতে। সেই শক্তিতেই সৈন্যের চেয়ে সম্রাট বড়ো, তোতাপাখির চেয়ে মানুষ এবং সাধারণের চেয়ে প্রতিভাবান। এই সব গল্পে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার আশ্চর্য প্রসার আমাদের মুগ্ধ করে। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের ভাঙা ইস্কুলের নগণ্য পণ্ডিত যে গল্পের নায়ক হতে পারে, এমন অদ্ভুত কথা গল্পগুচ্ছ পড়বার আগে কেই বা বিশ্বাস করত? নিতান্ত সাধারণ এবং অতিশয় সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আবির্ভাব দেখা গেল। 'একরাত্রি', 'পোস্ট মাস্টার', 'মাস্টার মশাই'—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের এই লেখাগুলি অতীতের একটা বিদ্রোহের মতোই আকস্মিক। ধ্বংসোন্মুখ জমিদারি অথবা প্রাচীন ইতিহাসের অর্ধ-কল্পিত পরিবেশ থেকে বাঙালী পাঠকের মনকে একেবারে নিচের তলায় টেনে আনা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই,— 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই', তারই মাঝে সমতল, মসৃণ, উর্বর এই পল্লীশ্রী আমাদের একমাত্র

সম্পদ—এমন একটি অভিযোগ আজও শুনতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। গ্রামের মাটি আর মায়ের স্নেহেই আমরা মানুষ হই; সুতরাং গুরুতর রোগের ঝোঁকে, প্রলাপের মধ্যে ফটিকচরণ যখন কলকাতা থেকে গ্রামে ফেরবার জন্য ছুটি চায়, তখন তার মানে বুঝতে পাঠকের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। তবু উত্তেজনা কি এ-জীবনে কম? বৈদ্যনাথের মতো নিস্পৃহ, শান্তশিষ্ট লোকটিকেও শেষ পর্যন্ত 'স্বর্ণমৃগের' সন্ধানে বেরুতে হয়। ছড়ি এবং ছিপ তৈরি করে জীবনের যে নিরুপদ্রব ধারাটি বয়ে চলেছিল তা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে সে একদিন ছিটকে পড়লো দৈব ধনলাভের উচ্চাশায়। কাশীর পোড়ো বাড়ির নিচে গঙ্গার স্রোত, সেখানে শিকলে বাঁধা শূন্য তামার হাঁড়ির অবিরাম আর্তনাদ, জলের নিচে মড়ার মাথা। বৈদ্যনাথের এই অভিযান কি তুচ্ছ? এত বড়ো হতাশা কি ফিকে? আমাদের জীবনের এই চাঞ্চল্য, এই সংঘাতের পরিচয় পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

স্টিভেনসন গল্পের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন—আখ্যাপ্রধান, আবহপ্রধান এবং মনস্তত্ত্বপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ নিছক আখ্যানের জন্য অবশ্য কোনো গল্প লেখেননি—(কোনো লেখকই বোধহয় লেখেন না)। যে-সব গল্পে আখ্যান দীর্ঘ, যেমন ধরা যায় 'রাসমণির ছেলে', 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র'—সেখানেও মনস্তত্ত্বের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। কাহিনীর চেয়ে চরিত্রই বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শানিয়াড়ির চৌধুরী বংশের উত্থান-পতনের পটের উপর দু-একটি মুখের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি ফোটে। কালিপদ এবং ভবানীচরণ, শৈলেন এবং রাসমণি আমাদের মনে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে যায়। 'স্ত্রীর পত্র' শুধু অভিনব আঙ্গিকের জন্যই স্মরণীয় নয়। মেজবৌ শ্রীক্ষেত্র থেকে স্বামীর কাছে চিঠি লিখেছেন; সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের একটি রূপহীনা মেয়ের সহিষ্ণুতা থেকে সকলের অগোচরে মেজ বৌয়ের মনে লেগেছে বিদ্রোহের আগুন। বাংলা দেশের এই নিতান্ত সাধারণ অন্তঃপুরের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই একটি মাত্র প্রদেশেই পাওয়া যায়—তাঁর ছোট গল্পে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন 'পোড়া কাঠ' রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমনি বিন্দু। বিন্দুর শাড়িতে শেষ পর্যন্ত আগুন লাগে, আমরা অভিভূত হই। আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে বলি, 'হায় রে পুতুল!' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলি:

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!"

বাংলা সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র ভালো ফোটেনি,—কথাটি রবিবাবুই একবার বলেছিলেন। গল্পগুচ্ছে চোখ-ঝলসানো মেয়ের সংখ্যাই বেশি। এর কারণ বোধহয় এই যে, বাঙালী পুরুষের মন প্রায়শই শিশু মনের হ্রস্ব-দীর্ঘ সংস্করণ—কর্মবিমুখ এবং পরমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে এদেশে অন্তঃপুরের হাজার নিগড় বেষ্টিত হয়েও মেয়েরাই ছিলেন জীবনের প্রস্রবণ। অন্তঃপুরকে কেন্দ্রে রেখেই এ দেশের সমস্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' দেখেছি ননীবালার নিষ্ঠা, দামিনীর বিদ্রোহ, 'স্ত্রীর পত্রে' দেখলাম বিন্দুর সহিষ্ণুতা, মেজ-বৌয়ের বিদ্রোহ। 'কঙ্কাল' গল্পে দেখেছি আর-এক বিদ্রোহিণীকে, নিঃস্বার্থ আত্মদানে যার অনাস্থা। 'বিচারক' এবং 'পুত্রযজ্ঞে'র মধ্যে অবৈধ প্রেমের কথা আছে। বাংলাদেশে পতিতাদের নিয়ে গল্প লেখার শরৎচন্দ্রেই সূত্রপাত এমন একটি সহজ বিশ্বাস আজকাল অনেকেই পোষণ করেন, দেখেছি। অবশ্য শরৎচন্দ্র উপন্যাসের সম্রাট। কিন্তু বিষয়বস্তুরই যদি কথা ওঠে, তাহলে এই প্রসঙ্গে, শরৎচন্দ্রের পূর্বগামীদের মধ্যে অনেককেই স্মরণ করতে হয়। এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে যে দরদ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যে নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি

যে নৈরাশ্য দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে, শরৎচন্দ্রের একাধিক পতিতা-জীবনীর ফলশ্রুতির সঙ্গে তা তুলনীয়, এবং এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। শরৎবাবুর গল্পে-উপন্যাসে অবশ্য খুঁটিনাটির বাহুল্য আছে—এই অর্থে তিনি রিয়ালিস্ট; প্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের মতো অবিমিশ্র আবেগধর্মী নন, তিনি চতুর অথচ হৃদয়বান; রবীন্দ্রনাথের গল্পে চাতুর্য আছে, হৃদয় আছে এবং কবিত্ব আছে। মোপাসাঁ সম্বন্ধে ক্রোচে লিখেছিলেন, "He distinguishes himself and emerges from the company of his contemporaries and compatriots, the Zolas, Daudets and their like, themselves endowed with noteworthy qualities and possessors of certain artistic form but not fundamentally and essentially poetical like him." রবীন্দ্রনাথের গল্পেও গীতিকাব্যের হাওয়া বয়।

"Religion of Man"-এ কবি এক জায়গায়ে প্রশ্ন করেছেন, আর্ট বলি কাকে? উত্তরে লিখেছেন, It is the response of Man's creative soul to the call of the Real. আন্তরিকতাকে কবি কি মূল্য দেন, এ থেকেই তা বোঝা যায়। অননুভূত সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের তাগিদে বঙ্গদেশে সম্প্রতি নতুনতম যে লেখক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, তাঁরা এখানকার কলকোলাহলমুখর গোধূলির স্বপ্নালোকে দাঁড়িয়ে একবার দিগন্তের অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কর্তব্যজ্ঞানটা ছোট কথা। সে আছে পুলিস কনস্টেবলের। পক্ষান্তরে কর্তব্যবোধ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। তাতে কর্তব্যের ভার নেই, অথচ মধুর নিষ্ঠা এবং পরম আত্মসমর্পণ—দুইই আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় আন্তরিকতার অভাব কোথাও নেই। তিনি সমাজের যে স্তরের অধিবাসী, তার বাইরে অনেক দুর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি চলে, এবং সে দৃষ্টি এতটুকু ঝাপসা নয়। এবং প্রসঙ্গ বিশেষে অতিমনোযোগ বা obsession-এর দোষও তাঁর নেই। তাঁর মন সজীব, সুতরাং তাঁর কৌতূহলও ব্যাপক। গল্পগচ্ছে বালকের চাপল্য এবং প্রৌঢ়ের জল্পনা, দরিদ্রের অশ্রু এবং ধনবানের অপব্যয়, কুমারীর অনুরাগ এবং বিধবার প্রেম, সবই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোথাও অতিনিবদ্ধ নয়—যে দোষের প্রকাশ দেখি শৈলজানন্দের মাতৃত্ব চিত্রণে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিকতা প্রীতিতে। তবে বিশেষের চেয়ে সাধারণ এবং প্রাদেশিকতার চেয়ে বিশ্বমানব মনের ছবিই তাঁর কয়েকটি গল্পে ফুটে উঠেছে। 'কাবুলিওয়ালা' নিগ্রো হলেও ক্ষতি ছিল না এবং ভুটানি হলেও গল্প ঠিক থাকত। কারণ, ওর মধ্যে কাবুলের ভুবৃত্তান্ত, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনধারণের পদ্ধতি প্রভৃতি গৌণতম। মুখ্য বিষয় হচ্ছে একটি শিশুর মনে সুদূরের কৌতূহল এবং একটি সন্তান-বৎসল প্রবাসীর পিতৃত্ববোধ। চেকভের স্মৃতিসঞ্চারে দেখা যায় গল্পের নামকরণ সম্বন্ধ তিনি খুঁতখুঁতে ছিলেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গল্পটি তাঁর হাতে পড়লে, তিনি ওর শিরোনামা কেটে লিখতেন 'পিতা'। 'একটা আষাঢ়ে গল্পে'ও এই সর্বজনীনতার নিদর্শন মেলে। তাসের দেশ প্রাদেশিক সীমানায় বাঁধা নেই, বিপুলা পৃথ্বীর একাধিক ভূখণ্ডে এর দর্শনলাভ ঘটে। নামের অপপ্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়—'দৃষ্টিদান'। দৃষ্টিদানের সিদ্ধান্ত বলতে যা বুঝি, সে হচ্ছে এই যে, যে মেয়েকে ভালবাসো, মনে রেখো সে দেবী নয়, সে মানবী। নিজের দৃষ্টি যে সময়ে স্বামীকে দান করল, অপরের সঙ্গে স্বামীর শুভদৃষ্টি বিনিময়ের বাধা ঘটালো সে-ই। প্রেমের জন্যই সে দান করেছিল, প্রেমের জন্যই সে স্বার্থপর। সে দেবী নয়, মানবী। চেকভ বোধহয় ও গল্পের নাম রাখতেন 'দেবী না মানবী?' অথবা 'পরিচয়' বা ঐ রকম অন্য একটা কিছু।

মানুষের মনের অতলে কত অতৃপ্তি, কী বিচিত্র বুভুক্ষা। অনেক জিনিস আমাদের চোখেই পড়ে না। হঠাৎ কিছু একটা ঘটে, আর এক মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন সত্য। 'দিদি' গল্পটিতে এমনি একটি কাহিনী আছে। 'আবাদ' আর একটি উদাহরণ। একটি ভবঘুরে ছেলে প্রথমে আশ্রয় পেল, তারপর গৃহিণীর কাছে মায়ের মতো স্নেহ পেল—এবং তারপর, কী আশ্চর্য, সেই নির্বোধ অভিমান করে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিল—এই হচ্ছে 'আবাদে'র মোট কথা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ডবল ডেকারে' 'অপূর্ণ' নামে যে গল্পটি প্রকাশ করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে সেটি মনে পড়ছে। 'অপূর্ণ' 'আবাদে'র অন্য সংস্করণ। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম 'পয়লা নম্বর'। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের মধ্যে আমরা ঋজু, সংযত, উদ্দীপ্ত যে ভাষা-বিন্যাসের পরিচয় পাই এবং যাতে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব শীলমোহরের ছাপ পড়েছে, সেই লিখনরীতির প্রয়োগ দেখা যায় 'পয়লা নম্বরে'। আর মনে হয় সিতাংশুমৌলি একেবারে একালের লোক—এই 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ', 'দুই বোন'-এর যুগের মানুষ।

কিন্তু গল্পগুচ্ছের সবচেয়ে চমকপ্রদ গল্পগুলি কোন্ শ্রেণীতে পড়ে, এ প্রশ্ন আমাকে যদি কেউ করেন, আমি স্পষ্ট গলায় বলব,—আবহপ্রধান। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' প্রভৃতি গল্পগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্পে ছাড়া আর কোথাও কি পাওয়া যায়? এই আবহসৃষ্টির নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পে দেখা যায়। এমন কি 'ঘাটের কথা' 'রাজপথের কাহিনী' প্রভৃতি নতুন ধরনের চিত্রধর্মী গল্পগুলিতেও এই ঝোঁকটি রয়ে গেছে। এদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনার। দৃষ্টান্তের জন্য—'পুরনো বাড়ি'র উল্লেখ করা চলে। কিন্তু 'পুরনো বাড়ি'তে কবিকেই বেশি চোখে পড়ে, গল্প লেখককে কম। 'ঘাটের কথায়' কবি এবং গল্প লেখকের সমবেত প্রচেষ্টায় একখানি ছবি আঁকা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই ধারাটির প্রকাশ দেখি বুদ্ধদেব বসুর 'রেখাচিত্রে'। বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলেও 'রেখাচিত্রে' এই আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটেছে এবং বহির্জগৎ থেকে তাঁর দৃষ্টি অনেকটা সরে গিয়ে অন্তর্মুখী হয়েছে। তাঁর 'জ্বর', 'মেজাজ' প্রভৃতি গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আঙ্গিক অনুসরণ করলেও মৌলিক এবং উপাদেয় এবং তাতে বুদ্ধদেব বসুরই ছাপ আছে।

অবিমিশ্র গুরু বিষয়ের পক্ষপাতী অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি হাসির গল্পও লিখেছেন এবং অন্য ধরনের গল্পেও প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। 'মুক্তির উপায়ে'র comedy of errors আমাদের নির্মল আনন্দ দেয়। 'অধ্যাপক' গল্পটিতে অনন্ত অবকাশ সম্বন্ধে মহীন্দ্রকুমারের বিতর্ক-বুভুক্ষা অথবা 'ভাইফোঁটা'য় ডিরোজিও-র ছাত্র সনাতন দত্তের সত্যনিষ্ঠার প্রসঙ্গ গভীর বেদনার মধ্যেও আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে।

চেকভের গল্প পড়ে গোর্কি বলেছিলেন, এ যেন শরৎকালের এক বিষণ্ণ বিকেল। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আমি দেখলাম পরিপূর্ণ একটি পৃথিবী হাসিতে-কান্নায়, শোকে-আনন্দে, কথায়-নীরবতায়, ত্যাগে-স্বার্থপরতায়, মৃত্যুতে-অমরতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মানুষ; তাদের চারিদিকে দিন-রাত্রির সনাতন লীলা, তাদের মাথার উপর অনন্ত আকাশের নীল, সেখানে কিছুই দেখা যায় না, শুধু অদৃশ্য এক বিধানের অক্লান্ত হাত নিরন্তর তাদের জীবনের পট পরিবর্তন করে,—সেই হাত ঋজু আর বলিষ্ঠ, সেই বিধাতা রসিক এবং নির্মম—গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ।

[প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৮]

অসম্ভবের ব্যাকরণ ॥ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে 'সে' 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প' এইসব বই রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে লিখেছিলেন। তার আগেই 'কল্লোলে'র লেখকদের বিদ্রোহকে তিনি তির্যকভাবে কৌতুক করেছেন 'শেষের কবিতা'য়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নিবারণ চক্রবর্তীকে, যিনি এমনকি হাতের লেখার নরম মোলায়েম গোল ছাঁদের বদলে সোজাসুজি কাঁটা-ওঠা কোণ-তোলা খোঁচা-লাগা তীক্ষ্ণ, ঋজু, সরল ছাঁদকেও আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করলেন না। আর নিজের বিপক্ষে ওকালতিটা এত তীব্র ও প্রবলভাবে ক'রে বসলেন যে সব যেন বিদ্যুতের মতো ঝলশে উঠেই চোখ ধাঁধিয়ে দিলো—তাক লেগে গেলো এমনকি উত্তরসাধকদেরও। 'শেষের কবিতা' যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা রাখতে পারলো না। কিন্তু স্মরণীয়, তাঁর জীবনের নিষ্ঠুরতম উপন্যাস রচিত হ'লো এই সময়ে—মালঞ্চ। আরো: ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় উন্মোচিত হ'লো এক ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবী, যার কর্দমের মধ্য থেকে আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলো ভীষণ-সুন্দর এক শতদলের রক্তাক্ত আভা, রক্তমাংসের ভালোবাসা দপদপ ক'রে উঠলো 'চার অধ্যায়ে'র রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে। আর এই সময়েই তাঁর রগরগে চিত্রকলা উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে ভৌতিক এক ভূদৃশ্য, যার সমান্তর হ'লো এক আদি পৃথিবী, যখন পৃথিবীটারই সত্যি-সত্যি তৈরি হ'তে বাকি ছিলো, হাজার মুখে গিলে উগরে যা ঠাণ্ডা, নিক্তিমাপা ও ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছে; প্রবল সব জ্বলজ্বলে রং তাকিয়ে থাকে ডাইনির চাউনির মতো, আর রেখার হিংস্রভীষণ চিৎকারে ঝমঝম ক'রে বেজে ওঠে জাদু-বিদ্যার ঝোড়োমন্ত্র। যুগপৎ সবদিক থেকে তখন যেন তিনি প্রতিদিনের পরিচিত এই আইনমানা, বাধ্য বশংবদ, অপোশে-চলা জগৎটিকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। এমনকি যেন রাগের সঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, যাতে এই হিংস্র হাসিই এই অর্থহীন দৈনন্দিনকে বাতিল ক'রে দিতে পারে। তিনি কি তখন সব অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, তাকেই কি তিনি মারাত্মক আঘাত হানতে চাচ্ছিলেন যাকে বাস্তব ব'লে থাকি, যেখানে যত রাজ্যের যুক্তি-তর্ক ও শৃঙ্খলার প্রাণঘাতী আধিপত্য? এই প্রশ্নটার উত্তর সহজ হয় না, যখন ভাবি যে এরই সমসাময়িক কালে ওই তিনটি 'মহীয়ান আবোল-তাবোল' রচনা করেছিলেন তিনি। সময়ের দুই কালো হাত একই জায়গায় এদের এমনভাবে ঠেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তাতেই অবাক হ'তে হয়। কেননা মূলত এই ভীষণ প্রতিবাদে এই তিনটি শিশুসেব্য গ্রন্থও উন্মুখর—অথচ 'শিশুসেব্য' এই কথাটিও আবার সেই সঙ্গে সন্দেহের উদ্রেক ক'রে দিয়ে যায়।

এই কারণেই সন্দেহ জাগে যে, সাধারণ লোকের মনে এ-রকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে ছোটোদের জন্য লিখতে গেলেই পাতলা ক'রে বলতে হবে সব কিছু, বলতে হবে তরল ক'রে, মোলায়েম ক'রে—এমনকি নিজের মেজাজ ও মনোভঙ্গির সঙ্গে না-মিললেও তা চেষ্টা ক'রে বানাতে হবে। অথচ এখানে যেন ইচ্ছে ক'রেই রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাটাকে ভেঙে দিতে চাইলেন; স্যাকরার ঠুকঠাক নয়, কামারের চরম ঘা টিও নয়, পর-পর তিনবার হাতুড়ির আঘাতের মতো এই বই তিনটি এসে কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে গিয়ে চ'লে গেলো, উপড়ে ফেললো সবগুলি খুঁটি একেবারে মূলসুদ্ধ—কিছুতেই যাতে কোনো সন্দেহ না জাগে সেইজন্যই উপর্যুপরি

তিন-তিনটি বাড়ি পড়লো যেন। দুটি বই আবার নিজের আঁকা ছবি দিয়েই সাজানো থাকলো, যাতে তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনোরকম কথাই না উঠতে পারে। এদের কী বলবো? 'প্রতিভাবানের খেয়াল'? 'অবসরকালের আত্মবিনোদন'? 'চিরচেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর একটি ভঙ্গি'?

ভঙ্গিটি যে নতুনতর, তা তো নিঃসন্দেহ। কিন্তু নিছকই কি অবসরকালের আত্মবিনোদন? শুধু মাত্রই প্রতিভাবানের খেয়ালখুশি? মোটেই তা নয়—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এগুলি না-লিখে কোনো উপায় ছিলো না। এইভাবেই নিষ্কাশিত করতে হয়েছিলো ভিতরের সব তাপ, নিরর্গল ক'রে দিতে হয়েছিলো সব কপাট, বাধ্য হয়েছিলেন তা করতে। একবার তাঁকে শৈশব-সাধনা করতে হয়েছিলো মুক্তির জন্য, আমেরিকার বস্তু-গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলেন, 'বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি ক'রে।' দমবন্ধ হয়েছিলো কুশ্রী দেয়ালের অভ্যন্তরে, তাই অবাধ আকাশকে খুঁজেছিলেন শৈশব-কল্পনায়। তারও আগে আরেকবার মাতৃহারা শিশুদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে 'শিশু' কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে নিজের শৈশবকে তৃষিতের মতো পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন, যেন শান্ত সন্ধ্যাবেলায় বাটির দুধের মতো স্মৃতির সুষমাকে আকণ্ঠ পান ক'রে পুষ্টি আর স্নিগ্ধতা চাইলেন করুণভাবে—দুর্বল রোগী যেমনভাবে তার স্বাস্থ্যকে উদ্ধার করতে চায়। জীবনে কখনোই এমন কিছু তিনি রচনা করেননি, যা প্রয়োজন থেকে উত্থিত নয়। অজস্র লিখেছেন ফরমায়েশি—এটা ঠিক; কিন্তু ফরমায়েশি হ'লেই নিজের বিরোধী হবে, এমন কোনো কথা নেই, যেহেতু ফরমায়েশ মেনে চলা নির্ভর করে নিজেরই ইচ্ছের উপর। আসলে যখনি নিজের জন্য কোনো কিছু জরুরি ব'লে মনে হয়েছে, তখনি তা-ই করতে চেয়েছেন—বিভিন্ন সময়ে তাঁর মধ্যে যে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব কাজ ক'রে গেছে তার কারণও তো এটা। একবার যে রসিকতা ক'রে বলেছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড়ো দোষগুণ হচ্ছে স্ববিরোধ, এই কথাটা প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে। কাজেই সেই সময়ে তাঁর চিত্রকলার মধ্যে পাথর-চাপা যে-সব মনোভাব ঝাঁকুনি দিয়ে, লাফিয়ে, পিঠ বাঁকিয়ে, ঘাড় তুলে, কাঁধ ঝাড়া দিয়ে বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চাচ্ছিলো এই বইগুলির ভিতর তারা জোর ক'রে নিজেদের জায়গা ক'রে নিলো—চেষ্টা ক'রেও আর তাকে ঢেকে রাখা গেলো না।

তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে কেন লিখেছিলেন 'ধ্বংস' নামে গল্প ও তারই পরিপূরক কবিতা, যার ভিতর ভীষণভাবে রাগ, ক্ষোভ, আর ঘৃণা ফুটে উঠেছে—যার মিল কেবল তাঁর চিত্রকলায় আর তাঁর শেষ দিকের নৃত্যনাট্যে। যে-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আস্তিক্য বুদ্ধি উত্তরকালকে ঈর্ষিত, পীড়িত ও বিচলিত করেছে, উটের পিঠে শেষ খড় পড়ায়, তা যখন দুমড়ে বেঁকে ধ্ব'সে যেতে চাইলো, তখন সাধ্য কি তাঁর বিবেক চুপ ক'রে থাকে।

> সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
> আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
> কল বল সম্বল সিভিলাইজেশনের
> তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
> মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
> আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেয়া পশুরে।
> মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,
> কত মারে এত বাঁকা হ'তে পারে সিধা তা। (গল্পসল্প : মানুষ সবার বড়ো)

দুই

সিধে ক'রে দেবার জন্যই যেন অসম্ভবের ব্যাকরণ রচনা ক'রে বসলেন তিনটি বইতে। দেখিয়ে দিলেন এমন এক হাস্যকর পৃথিবী যার ভিতর সংগোপনে আমাদের এই দৈনন্দিন জগতেরই পরিণাম লুকিয়ে আছে। 'খাপছাড়া' তো যেন সোজাসুজিই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসলো। যা-কিছু সৃষ্টিছাড়া, বেয়াড়া, মাত্রাতিরিক্ত দলে-দলে তারা ভিড় ক'রে এলো যেন। 'গল্পসল্প'তে কথক দাদুটির আশপাশে ভিড় জমলো তাদের, সাংসারিক সুবুদ্ধিসম্পন্ন চালাকেরা যাদের পাগল বলে। যা-কিছু আইন-মানা, নিক্তিমাপা, আপোশে-চলা, নামহীন সেই 'সে' যেন তারই মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ ঠাট্টা কৌতুক আর ব্যঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠলো। আর সব কিছুর অন্তরাল থেকে গানের ধ্রুবপদের মতো কেবল বোঁচা গোঁফের হুমকি শোনা যেতে লাগলো, গলা কাটার ধুম প'ড়ে গেলা দেশে-বিদেশে, গ্রামে-শহরে। আবহমানের লোকায়ত দৈনন্দিন—ছড়ার ছেলে-ভুলোনো চালের ভিতর ধীরে-ধীরে যা ফুটে উঠলো—সাধারণ লোকের সেই সরল ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা তারই আড়াল থেকে ভীষণ এক রেডিয়ো খবর জানাতে লাগলো ক্রমাগত কোথায় বোমা প'ড়ে তলিয়ে গেলো জাহাজ, যা শুনে খাঁচায় পোষা চন্দনা কেবল ফড়িঙে পেট ভরে।

> গ্যাঁগোঁ করে রেড়িয়োটা, কে জানে কার জিত—
> মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
> টিয়ের মুখে বুলি শুনে হাসছে ঘরে-পরে—
> রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে। (ছড়া : ৬)

প্রায় হিংস্র হ'য়ে উঠেছে তাঁর রচনা, ভীষণ হ'য়ে উঠেছে যেন, রাগে ফেটে পড়তে চাচ্ছে। এই প্রথম যেন মহাকবির করুণাও মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো। 'সভ্যতার সংকট' অভিভাষণের মধ্যে যে-মন প্রকাশিত, তাই এখানে অন্যভাবে উগ্র হ'য়ে ফুটে উঠলো: রাগে, ক্ষোভে, অসহায় আক্রোশে এমনকি 'ছোটোদের জন্য উদ্দিষ্ট' গ্রন্থেও বারে-বারেই ফুটে উঠলেন তিনি, প্রতিবাদে প্রায় ফেটে পড়লেন। এই বিষয়ে তাঁর ছড়ার সাক্ষ্যই সবচেয়ে কার্যকরী হবে :

> আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁসে,
> কলম আমার বেরিয়ে এলো বহুরূপীর বেশে
> আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
> আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শ্যাওলা ঘেরা নায়ে।
> কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড় পুতুলের বিয়ে,
> বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে। ....
> আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
> দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয় পাওয়া। (ছড়া : ৬)

যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই জন্যেই তাঁর পক্ষে সাধ্য ছিলো না প্রতিবাদ না ক'রে। আর তিনিই যে রবীন্দ্রনাথ, তাই হ'লো সেই কারণ যার জন্য তাঁর কলমকে পরিয়ে দিতে হ'লো বহুরূপীর বেশ। মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল আগে লেখা এ-সব : বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ, অশান্ত, স্বস্তিহীন—সারা জীবন ধ'রে যা-কিছু ভেবেছেন, যা ছিলো তাঁর ধ্যানের ও আরাধনার—সব যেন ধ্বংস হ'য়ে যেতে বসলো। আর

তাই হরবোলার মতো বেরিয়ে এলেন তিনি নতুন কণ্ঠস্বর নিয়ে, ঘোষণা করলেন : মানি না একে, কিছুতেই মানি না, কেননা অঘটন সত্যি নয়। সিন্ধুপারে যে-ওলোটপালোট কাণ্ড চলেছে, সুরাসুরের যে-প্রবল ধাক্কা, সেই মন্থন ও উল্লম্ফনের চিত্র রচনা করলেন তিনি, আর উপায় হিশেবে বেছে নিলেন আবোল-তাবোলকে—তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর কুশীলবেরা উল্টেপাল্টে ডিগবাজি খেয়ে গেলো, বিপর্যস্ত হ'য়ে গেলো ঠাট্টায় আর কৌতুকে—যা একদিক থেকে তাঁর প্রতিবাদেরই দলিল।

তিন

এই কথাটা বিশদ করার যোগ্য। যন্ত্রযুগের সূচনায় ইওরোপে যখন মানুষকে কতগুলি যোগ বিয়োগের সংখ্যা বা শতরঞ্জ খেলার ঘুঁটি বানিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছিলো, তখন সাহিত্যের সকল বিভাগেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠেছিলো। যে-ভীষণ পার্থিবতা গোটা ইওরোপকে কুক্ষিগত করতে চাচ্ছিলো, তার বিরুদ্ধে চিৎকার উঠলো যেন, কবি-শিল্পীরা কেউ মানতে চাইলেন না যন্ত্রযুগের এই ভয়ানক আব্দার—'সব মানুষকে এক ছাঁচের ক'রে দাও'। পোশাকের ছাঁট, কি চকচকে জুতোর ডগা যে মানুষের সর্বশেষ পরিচয় নয়, কেবলমাত্র মানুষের বেলাতেই যে দুই আর দুইয়ের যোগফল সব সময়েই চার হয় না, এই সর্বনেশে স্পর্ধার বিরুদ্ধে এই কথাটাই ফুটে উঠেছিলো সমস্ত সৃষ্টিকর্মের ভিতর। আর তারই ছাপ পড়েছিল 'মহীয়ান আজগবি'তেও যেখানে আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যকভাবে বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল—যা কিছু সরলীকৃত ও গতানুগতিক, যা-কিছু গড্ডলপ্রবাহ ও প্রচল-নির্ভরতার স্মারক—অর্থাৎ আরামপ্রদ, নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার,—রতিসুখ, অর্থবিত্ত, আর যশাকাঙ্ক্ষায় ভরপুর, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একদল বেপরোয়া লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের, গতানুগতিক হিশেবে যারা পাগল, মাথা-খারাপ, ও স্বেচ্ছাচারী—কোনো যুক্তি-শৃঙ্খলার তোয়াক্কা যারা রাখে না এবং অন্যদের সহস্র মুখনাড়া, ভ্রূকুটি ও ঠোঁট বাঁকানোতেও যারা পেছপা হয় না বরং একরোখা জেদে ভ'রে থাকে—তাদের কথাই বলা হয়েছিলো লুইস ক্যারল আর এডোয়ার্ড লিয়রের আবোল-তাবোলে। এই পার্থিব আইন-কানুনে কিছু চলে না সেখানে, সব নিয়মের বেড়াজাল যেন একলাফে টপ্‌কে পেরিয়ে যাওয়া হ'লো, লঙ্ঘন করা হ'লো প্রচলিত ব্যাকরণের সমস্ত সতর্কতা, আর এটাই আমাদের গোপনে বাঁকাভাবে ভিতরের কথাটা বুঝিয়ে দেয়।

সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ কি পরিমল রায়—বাংলা দেশের এই তিনজন কবি একদিক থেকে এই অসম্ভাবনারই আরাধনা করেছিলেন। তাঁদের রচনার ভিতরেও পাওয়া যায় এই বিদ্রোহের মরিয়া চিৎকার—প্রত্যেকের প্রহসনেই নিজস্ব কতগুলি মার্কা আর চিন্তা আছে, কিন্তু তবু হয়তো মূল জায়গাটা এখানেই। সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলে শশব্যস্ত ও মগ্ন এমন অনেককেই দেখা যায় যারা হয় ছায়া ধরার ব্যাবসা করে, নয়তো মৌলিক কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেয় নতুন-নতুন কল বানিয়ে, যে-কলের প্রলোভন সব পথ ঘুরিয়ে মারবে, মাত্রই দুটি ল্যাজ ব'লে মশা-মাছি তাড়াতে পারে না এমন হ্যাংলা লোক, আর হাসির ভয়ে মুহ্যমান রামগরুড়ের ছানা, ঢাল-তরোয়াল নিয়ে তৈরি স্বাবলম্বী গোয়েন্দাপ্রবর যে চোর ধরবেই ব'লে অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে এবং সর্বোপরি সেই নামহীন সনাতন বালখিল্য যে বাবুরাম সাপুড়েকে এমন সাপ ধ'রে দিতে অনুরোধ করছে যে আসলে সাপই নয়। পরিমল রায়ের বিশ্বেও এই একই উল্টো নিয়ম রাজত্ব ক'রে চলেছে—সেখানে বৌকে ঠেলে নৌকো থেকে ফেলে দেয় নববিবাহিত বর; মা ও বৌকে গুলি ক'রে মেরে ফেলায় বাবামশাই পিঠ চাপড়ে প্রশংসা ক'রে বলেন 'ভাগ্যিশ এক গুলিতেই সাবাড় হ'লো, না হ'লে মজা দেখাতুম—কেননা

গুলি আজকাল যা মাগ্যি'; আর বিয়ের সূচনায় দুই পুরুতে পাণ্ডিত্যের ঝগড়া বাঁধে যেই অমনি লগ্ন শেষ হবার সময় বরের ভুরুতে গাঁট্টা ঘনায়। অবনীন্দ্রনাথের নানা রচনাতেও এই ধরনের অদ্ভুত কিম্ভূত ও সৃষ্টিছাড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—বহু গল্পেই পাওয়া যায় সেই চরিত্রটিকে যার নাম অবু, আর পথে-বিপথেতে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে পাওয়া যায় দুটি চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ : একজন হ'লো অবিন, তার কাণ্ড ছাখে অন্যজন যার নাম অবু, আর সে কেবলি অবাক হয়—কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবে তার সঙ্গে নিজেকে জড়ায় না। লিয়রের 'আপাতলঘু পঞ্চ-পদাবলী'তে দর্শক ছিলো 'They' বা অন্যেরা—অবনীন্দ্রনাথ আরেক ধাপ এগিয়ে এসে সেই They বা দর্শকদের নিজেরই অন্য সত্তা ক'রে দিলেন। আরো মর্মান্তিকভাবে প্রতিবাদ করলেন সব সরলীকরণের —দেখিয়ে দিলেন একই সঙ্গে মানুষের ভিতরে বিদ্রোহ ও মেনে চলা—এই দুই টানই কাজ ক'রে যাচ্ছে।

আর এই তিনজনই একদিক থেকে একই গোত্রের, কেননা তিনজনেই ছিলেন যুগপৎ শিল্পী ও কবি, শুধুমাত্র হাস্যরসের ছোটো বেড়ায় তাঁদের কিছুতেই এঁটে রাখা যায় না। যে-তিনটে বইতে রবীন্দ্রনাথ অসম্ভবের ছন্দটি সচেতন ও নিপুণ ভাবে বাজিয়েছিলেন, তার ভিতর দুটিতেই অসংখ্য ছবি এঁকে অলংকৃত করেছেন—আর সেই বিচিত্র ও প্রচণ্ড চিত্রশালা কড়াভাবে, রাগিভাবে, অসংবরণীয়ভাবে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছে তাঁর সচেতন ও নির্গুণ মন—প্রচণ্ড গমকে কেঁপে উঠেছে মূর্চ্ছিত শূন্যতার তার। কিন্তু এইখানেও তিনজনেরই সঙ্গে মূল তফাতটি স্বপ্রকাশ, যদিও এই তিনজনের মতোই তাঁর শিশুসেব্য রচনাকর্ম কেবল ছোট্ট একটি গণ্ডির মধ্যে আঁটে না, বরং বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন স্বাদে ও গন্ধে আমাদের অনুরক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

চার

'ব্যাকরণ মানি না,' সঙিন-তোলা বন্ধনীর ভিতর স্পষ্টভাবে এই কথা ঘোষণা ক'রে তবেই অসম্ভবের ছন্দটি ধরতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়। যত রাজ্যের আজগবি আর উদ্ভট যে শেষ পর্যন্ত সেই খেয়ালি জগৎটিকে উন্মোচিত ক'রে দিয়ে গেলো, যেখানে সবই উল্টোপাল্টা, ডিগবাজি খাওয়া, আবোল-তাবোল, তার পিছনে কান পাতলেই এই বিদ্রোহী ঘোষণাটিই শুনতে পাওয়া যায়। যে-খেয়ালখোলাকে তিনি স্বপ্নময় দোলা নিয়ে আবির্ভূত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, অত্যন্ত সচেতন শিল্পী সে—কবি, ভাষাতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী, হাস্যরসিক, ও সর্বোপরি বিদ্রোহী; আর এই স্বপ্নময় দোলাটিই আসল—স্বপ্নের এই ঝাপসা নীল কুয়াশাই সব ভুলভ্রান্তি ও এলোমেলোর ভিতর 'অসম্ভবের ছন্দ' জাগিয়ে দিলো। 'অসম্ভবের ছন্দ' কথাটি একদিক থেকে চাবিকাঠির কাজ করতে পারে এখানে। ওরই মধ্যে সংগোপনে লুকিয়ে আছে বলীয়ান জাদুমন্ত্র যার পরাক্রান্ত প্রভাব কিছুতেই অমান্য করতে না-পেরে সিসেমগণ শেষকালে এক উল্টোপাল্টা জগতের রুদ্ধদ্বারগুলি খুলে দিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যতিঃপাতের সুনিয়মিত শৃঙ্খলাই যদি ছন্দ হ'য়ে থাকে, যদি প্রাণ পদার্থের স্পন্দনের মধ্যে নৃত্যপর স্তব্ধতার লুক্কায়িত আবেশই হয় ছন্দের দোলা, তাহ'লে এ-কথাটা সহজেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে কোনো বিশৃঙ্খল ভুবনের কথা তিনি বলেননি—বরং সেখানেও নিয়ম আছে, অমোঘ নিয়ম, কিন্তু সেই নিয়মটাই উল্টো আইনের অধীন; এবং শুধু তা-ই নয় তাঁর পরিকল্পিত সব এলোমেলো, বেয়াড়া আর কিম্ভূতের ভিতর কোথাও যেন এই পরিচিত ও বাধ্য জগতের কোণগুলি লুকিয়ে আছে, যারা হঠাৎ এসে একেক সময় ছদ্মবেশের আড়াল থেকে উঁকি মেরে পরক্ষণেই আবার গা-ঢাকা দেয়। যে-ভাবে মামুলি তর্কশাস্ত্র আর শাবেকি ব্যাকরণ তাঁর আবোল-তাবোলের তোড়ে নাকানিচোবানি খেয়ে একেবারে নাজেহাল

হ'য়ে যায়, আসল মজাটা লুকিয়ে থাকে তার ভিতরেই। ঠাট্টা আর আজগবি এই দুইই ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে তার ভিতর, আর ব্যঙ্গের লক্ষ্যের প্রতিও কোনো রাগ প্রকাশিত হয় না সেখানে। যেটাকে যে-রকম ব'লে সবাই জানে, সেটাকে অন্যরকম ক'রে দেয়া নয় কেবল; মনস্তত্ত্ব, চরিত্রসৃষ্টি, ঠাট্টা এমনকি বিশুদ্ধ অদ্ভুত রস—এদের সম্মিলিত প্রভাবেই রচনাটি তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী হ'য়ে ওঠে। না-হ'লে, কোনো নিয়মহীনভাবে উল্টো ক'রে দেয়া অতি সহজ কাজ—এবং সেখানে হাসি নামক ব্যাপারটিরও কোনো অর্থ থাকে না, বরং একদিক থেকে বোকামিরই নামান্তর হ'য়ে ওঠে। 'যদি বলো লাট সাহেব কলুর ব্যবসা ধ'রে বাগবাজারে শুঁটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের,' রবীন্দ্রনাথের 'সে' এই কথা বলেছিলো। আসলে, 'অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো'। এবং সেই কারিগরি নির্ভর করে সাধর্ম্য ও বৈসাদৃশ্য আবিষ্কারে—যা মূলত কবিদের কাজ। কবিরাই কেবল সেতু বেঁধে দিতে পারেন সব বিপরীত আর বিসদৃশের ভিতর—অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে ছেঁকে বাস্তব অবাস্তব নানা জিনিশের সঙ্গে সচেতনভাবে যোগসাজশ ঘটিয়ে তবেই সত্যিকার দিব্যদ্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। হাঁস আর সজারু, বক আর কচ্ছপ, হাতি আর তিমি এইসবেই কেবল যোগাযোগ হ'তে পারে—কেননা একটির শেষ বর্ণে অন্যটির প্রথম বর্ণের ধ্বনি বেজে ওঠে; যা হয় না, তাকে বাজাতে গেলেও ধীরে ধীরে উল্টো যুক্তি তৈরি ক'রে-ক'রে এগোতে হয় যার ফলে শেষ পর্যন্ত সিংহ আর হরিণ মিলে যেতে পারে।—শিং নেই এই কষ্ট ঘুচে যায়। সেইজন্যেই বাংলা ক্রিয়াপদের আশ্চর্য ও উদ্ভট ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখতে পাই কল্পদ্রুমের মতো তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়। চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও নিয়মের ভিতরকার সব কোণগুলি মিলে মিশে পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে আবিষ্কার করেছে অনিয়মের নিয়ম। শব্দের শাদা মানবটিকে ধ্বনির দোলা লাগিয়ে চেহারা-বদল করার জাদুবিদ্যা জানতে হয় তার জন্য। হৃদয় ধিক্কার আর হিক্কা মিলিয়ে তৈরি হলো হিদ্‌হিদ্‌হিদিক্কার; আর তিড়িং-তিড়িং ক'রে জ্ব'লে ওঠা আর আতঙ্ক মিশিয়ে তৈরি হ'লো তিড়িতঙ্ক—এই কথাটি তিনিই ধরতে পেরেছিলেন, অভিধানের সঙ্গে যার পরিচয় অনেক। ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মধিক্কার ও নাকিকান্নার হেঁচকি—এই বিষয়টির অভিজ্ঞতা এবং শব্দের কান থাকলেই হিদ্‌হিদ্‌হিদিক্কারের সব রস অফুরানভাবে আমাদের গাম্ভীর্যকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। এই 'বুগবুলবুলি' ভাষার আইনকানুনগুলো যেমন অটুট ও অভঙ্গুর, তেমনিভাবে অমোঘ ও কঠিন হ'লো অসম্ভবের ব্যাকরণ। 'সে'-র ভিতর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন; বুঝতে পারি, পাঠকদের বুদ্ধিতে তাঁর আস্থা ছিলো না ব'লেই রচনার ভিতরেই রচনাটিকে উপভোগ করার মালমশলা ও উপায়গুলি নিজেই জুগিয়ে দিয়েছিলেন। অতিথিকে জিরাফের মুড়িঘণ্ট আর শর্ষে বাঁটা দিয়ে তিমিমাছ ভাজা খাওয়াবার বর্ণনার ভিতর স্থূলতা দেখেছিলো সে—ও-রকম রচনা করা যে কত সহজ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলো। তাসমানিয়াতে দেখা বিন্তি তাস খেলার প্রসঙ্গে যা-যা ঘটেছিলো, তার বিবরণ একেবারে হাঁপ ধরিয়ে দিয়ে ছাড়ে তার কারণই হ'লো গোটা ব্যাপারটার অস্তিত্বই নেই কোনো ভূ-ভারতে—আর তাই একেবারে অচেনা ব'লেই—তার ভিতর উঁচু দরের হাসি নেই। তবু 'যা কিছুই জানিনে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না।' কিন্তু কেবল ওই পর্যন্তই তার দৌড়। অদ্ভুত রসের গল্প জমে তখনি, যদি বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য ক'রে তোলা যায়। 'নেহাত বাজারে চলতি ছেলে ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি' কেবল অপযশেরই ভাণ্ডার হ'য়ে ওঠে।

পাঁচ

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার ভিতর আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন—তা যে একেবারেই অচেনা আমাদের এমন নয়, কেননা ঠাট্টা বা ব্যঙ্গের পিছনে লক্ষ্য আছে উদ্দেশ্য আছে এমনকি বক্তব্যও আছে। কিন্তু তার উপরে তিনি যে-আবরণ চাপিয়ে দিয়েছেন আপাত চোখে তার বিশ্বাস করবার অতীত ব'লে মনে হয়। মজাটাও ওইখানেই লুকিয়ে আছে। সব অসম্ভাবনার তাৎপর্যই স্পষ্ট প্রতিভাত হ'য়ে যায় হঠাৎ যখন ছন্দ মিল কি বাণীভঙ্গির চমকপ্রদ বিন্যাসের ভিতর সব কিম্ভূতকেই বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠতে দেখি। হঠাৎ একসময়ে সচমকে লক্ষ্য করি এই সবই আয়নার ভিতর দিয়ে দেখানো হচ্ছে; এমন এক আয়না যা কেবল প্রতিবিম্বকে উল্টে দিয়েই তুষ্ট হয় না, ত্যাড়া ব্যাঁকা তিনকোনা, পাঁচকোনা বেঢপ ও কিমাকার ক'রে দেয়। আর এই আয়না যে কতখানি শক্তিশালী, তার প্রমাণ স্বরূপ কেবল রচনাকর্মের সচেতন ও সুচিন্তিত কারিগরিটাই মন্ত্রপড়া জলের মতো সব কিছুর ভিতর সোডার ভিতরকার ভশভশানো হাস্যধারা ঢুকিয়ে দেয়।

আসলে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মহাকবিটি বিশ্বজগতের দুর্দশায় এতই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন যে এই বহুরূপী হরবোলার বেশ না-দিয়ে পারেননি। তার ভিতর যে সমসাময়িক বহু বিষয়ের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছিলো, তার কারণই এটা। সবচেয়ে বেশি রাগ ছিলো অতি চালাক স্ববারির উপর—যা 'সফিস্টিকেশনে'র দান। কোনোকালে তাঁকে তিনি সইতে পারেননি—এখানেও তাকেই স্যাকরার ঠুকঠাক এলাত করেছেন—কিন্তু কামারের হাতুড়ি তাঁর রুচির পরিপন্থী ছিলো ব'লেই সেই ঝলমলে ঠুকঠাককেই শিল্পের দ্বারা পরাক্রান্ত ক'রে তুলেছিলেন।

বস্তুত অসম্ভাবনার তাৎপর্যটি যদি উদ্দেশ্যময় না-হয়, কেবলমাত্রই খেয়ালি হয় তাহ'লে আক্ষরিক অর্থেই তার 'ননসেন্স' হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 'সে'-র ভিতর নানা প্রসঙ্গে এই কথাটিই তাঁকে বলতে হয়েছিলো; আর নিজেকে ছোটো ক'রে ছেঁটে, কেটে মাপ মতো ক'রে আনতে পারেননি ব'লেই তাই শেষ-পর্যন্ত 'সে'ও একটি বিষণ্ণ ও ট্রাজিক উপন্যাসে পরিণত হ'য়ে—আক্রান্ত হয় স্মৃতি ও অফুরান গোধূলি দ্বারা যেখানে 'সুকুমার' যেহেতু পেটের খিদের বদলে শিল্পের খিদে দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো বলেই প্রচলনির্ভর গতানুগতিক গড্ডল প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে উড়োজাহাজের মাঝিগিরি শিখে চন্দ্রলোকের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়ে। এমন এক যুগ ছিলো যখন ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিলো—সে যুগের নাম সত্যযুগ। সেই সত্যযুগের অভাববোধই বিলীয়মান ইচ্ছাগুলোকে বিশ্বসৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দেবে হয়তো। এই পৃথিবীর চেয়ে সত্যতর যে আকাশ; হয়তো সেখানে তার দাম আছে, এখানে বাড়ির ছাদে ভাঙাছাতার ছদ্মবেশী পক্ষিরাজ কি আতসবাজির আধপোড়া কাঠি পড়ে থাকে না; সব থাকে শূন্যময় ও ফাঁকা, নিয়মমানা, যান্ত্রিক। মানুষের ভিতরে একটি যে গোপন আকাঙ্ক্ষা আছে তার প্রতিবাদ করার, তারই আভাসে ইঙ্গিতে তাই তার অসম্ভব ইচ্ছেগুলো ভরপুর হ'য়ে থাকে। এইদিক দিয়ে তা হয়তো রূপকথার সহকর্মী, এইদিক দিয়ে তা হয় তো রাজা সলোমানের যন্ত্রপড়া ছিপি খুলে দেয়। অন্তত জাদুকরের ডুগডুগির আওয়াজ শোনা যায় তার ভিতর—ধুলোর উপর বসে যায়, দাড়িওলা বুড়ো লোকটার কিসের নেশার পাওয়া চোখটা সম্মোহিত করে ফেলে সবাইকে, আর যা-তা মন্ত্র আউড়ে শেষকালে ফাঁকা ঘাসের উপর থেকে ঢাকা চাদর তুলে নিতেই দেখা যায় ক্ষণকালের ভোজবাজির ঠাট্টা, যা তুচ্ছ পরিত্যক্ত বর্জিত অকেজো ও বাতিল হ'লেও শেষ-পর্যন্ত মায়াবলে এক সত্যতর ও পূর্ণতর কোনো জগতের সন্ধান দেয়।

রবীন্দ্র সমালোচনার আদি-পর্বে

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আজ কয় বৎসর হইল, একদিন কোনো সাহিত্যসেবকের গৃহে কয়জন সাহিত্যসেবকের সমাগম হইয়াছিল। সেখানে অতি যশস্বী হইতে নিতান্ত নগণ্য, অতি প্রবীণ হইতে অত্যন্ত নবীন কয়জন সাহিত্যসেবক উপস্থিত ছিলেন। তাহার অল্পদিন পূর্বে রবীন্দ্রবাবু ভাষার স্রোতে "সোনার তরী" ভাসাইয়াছেন। তখন অনেকে বলিতেছিলেন যে, এবার রবীন্দ্রবাবুর সোনা-রূপা লাভ হউক আর নাই হউক, সাত রাজার ধন এক মানিক লাভ হইবেই—প্রভূত যশোলাভ নিশ্চয়ই হইবে। কথায় কথায় রবীন্দ্রবাবুর কবিতার কথা আসিয়া পড়িল; "সোনার তরী"র প্রথম কবিতার অর্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভগবানকে না পাইয়া ও হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া ইহা হতাশ-হৃদয় ভক্তের হতাশার গান; কেহ বলিলেন, প্রাণ দিয়া প্রাণ না পাইয়া ইহা ব্যথিতহৃদয় প্রেমিকের বেদনার গান; কেহ বলিলেন, সাহিত্যসেবায় প্রতিভা, অবসর ও অর্থব্যয় করিয়া পাঠকদিগের নিকট আশানুরূপ আদর না পাইয়া ইহা বিষণ্ণহৃদয় কবির বিষাদের গান।

শিল্পী কি ভাবিয়া তাঁহার শিল্প রচনা করেন, তাহা শিল্পীই বলিতে পারেন। শুনিতে পাই মিশরে sphinx মূর্তি দেখিয়া সে আননে কেহ বিষাদ, কেহ ঘৃণা, কেহ আনন্দ, কেহ বিরক্তিভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সে আননে কোন্ ভাব ব্যক্ত করা শিল্পীর অভিপ্রেত ছিল এবং কোনো ভাব ব্যক্ত করা শিল্পীর অভিপ্রেত ছিল কি না, তাহা কে বলিবে? রবীন্দ্রবাবু কি ভাবিয়া "সোনার তরী" লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কবির কবিতায় পাঠক আপন মনোমতো অর্থ করিবেন। শেকস্‌পীয়রের নাটক-সমূহে স্থানে স্থানে সমালোচকগণ যতো প্রকার অর্থ করিয়াছেন, স্বয়ং লেখক বোধ করি তাহার এক-চতুর্থাংশ শুনিলে বিস্মিত হইতেন। আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রবাবু কি ভাবিয়া "সোনার তরী" লিখিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তবে এ-কথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রবাবুর আর যে আক্ষেপ করিবার কারণ থাকুক, তিনি যে পাঠকদিগের নিকট আশানুরূপ আদর পান নাই, তাঁহার এ আক্ষেপ করিবার কোনোই কারণ নাই। আর এই আদর যে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার ন্যায্য প্রাপ্য তাহাতেও সন্দেহ নাই।

যখন তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজের উপর রবীন্দ্রবাবুর প্রভাবের কথা মনে করা যায়, যখন যুবক সমাজে রবীন্দ্রবাবুর অন্ধ উপাসকদিগের উপাসনা লক্ষ্য করা যায়, যখন স্মরণ করা যায় যে, একদল নবীন পাঠক রবীন্দ্রবাবুর কুঞ্চিত কুন্তল হইতে তাঁহার কোমল কণ্ঠস্বর পর্যন্ত সকলেরই প্রশংসা করে এবং কোনো সভাস্থলে তাহাদিগের উপাসিতকে উপস্থিত দেখিলে বিষয়ের ও সময়ের গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহার একটি সঙ্গীতের জন্য এমন ব্যগ্রতা প্রকাশ করে যে তাহাতে স্বয়ং রবীন্দ্রবাবুকেই লজ্জিত হইতে হয়, তখন এ-কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে রবীন্দ্রবাবুর আশানুরূপ আদর হয় নাই। রবীন্দ্রবাবুর এই আদর সর্বজনীন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় যে রবীন্দ্রবাবুকে কেবল Fit audience though few লইয়াই থাকিতে হয় নাই,

ইহাই কি যথেষ্ট নহে? রবীন্দ্রবাবুর কবিতার, ছোট গল্পের, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধের উপাসকের অভাব নাই।

"চৈতালী"তে অনেকগুলি কবিতা আছে। রবীন্দ্রবাবুর "দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে" সত্যই "গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।" সে সকল কবিতার মধ্যে অনেকগুলি চতুর্দশপদী। এক একটি ভাবে প্রায় এক একটি কবিতা সম্পূর্ণ, কবিতাগুলি যেন ভাবস্রোতে এক একটি তরঙ্গ; কোথাও একটি তরঙ্গে একটি ভাব সম্পূর্ণ; কোথাও দুই তিনটি তরঙ্গে একটি ভাব সম্পূর্ণ।.........

"চৈতালী"র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া প্রথমেই ওয়ার্ডসওয়ার্থকে মনে পড়ে। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় ও "চৈতালী"র কবিতায় প্রভেদ সহজেই চক্ষে পড়ে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার স্নিগ্ধভাব "চৈতালী"র কবিতায় নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-প্রেম আর রবীন্দ্রবাবুর বিষাদপ্রবণতা বড়োই বিভিন্ন। "ইছামতী নদী"কে সম্বোধন করিবার সময় "চৈতালী"র কবি আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"যখন রবো না আমি, রবে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চারিয়া প্রাণ,
তোমার আনন্দ গাথা এ বঙ্গে, পার্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতী!"

রবীন্দ্রবাবুর অন্য অনেক কবিতার মতো এই কবিতায়ও বিষাদের অন্তঃসলিলা প্রবাহ প্রবহমান। ইহার সহিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের Yarrow Visited শীর্ষক কবিতার শেষাংশ তুলনা করুন—

"The vapours linger around the Heights,
They melt—and soon must vanish;
One hour is theirs, nor more is mine—
Sad thought, which I would banish,
But that I know, where'r I go,
Thy genuine image, Yarrow!
Will dwell with me—to heighten joy,
And cheer my mind in sorrow."

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় বায়রনের কবিতার তীব্র জ্বালাময় ভাব ছিল না; তাহা সরল সুন্দর প্রাণস্পর্শী। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা সম্বন্ধে কবির কথায় বলা যাইতে পারে—

"The moving accident is not my trade;
To freeze the blood I have no ready arts;
'Tis my delight alone in summer shade
To pipe a simple song for thinking hearts."

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহিত রুশোর কোনো কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই জনতার কোলাহল হইতে দূরে অভ্রভেদী গিরিশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষিত। রুশো স্পষ্টই বলিয়াছেন, "I am surprised that baths of the salutary and beneficial air of the mountains are not one of the principal

remedies of medicine and morality." উভয়েরই শিক্ষা সাধারণ লোকের শিক্ষা হইতে বিভিন্ন প্রকারের ছিল। সেই শিক্ষা লইয়া রুশো জনতার মধ্যে আসিয়া, সিন্ধুবিহারী মৎস্যকে পল্বলে আনিলে সে যেরূপ বোধ করে, সেইরূপ বোধ করিয়াছিলেন। আর তাহা বুঝিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ জনতা হইতে দূরে থাকিয়া গীত গাহিয়াছিলেন। তাঁহার আপনার কথায় তিনি

"Even from the meanest flower that blows
Thoughts that do often lie too deep for tears."

পাইবেন।

রবীন্দ্রবাবু এই জনতার এতই মধ্যে অবস্থিত এবং এই জনতাও তাঁহাকে নিকটে পাইবার জন্য এমন লালায়িত যে রবীন্দ্রবাবুর কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার সৌন্দর্য পরিস্ফুট হওয়া অসম্ভব বলিলেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না।......

* * * * *

১২৯৭ বঙ্গাব্দে "মানসী"র ভূমিকায় রবীন্দ্রবাবু যুক্ত অক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছিলেন। তাহার পর ১২৯৯ বঙ্গাব্দে "সাধনা"য় "বাঙলা শব্দ ও ছন্দ" বিষয়ক আলোচনায় রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন—"শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাঙলা ভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কর্ণধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়।" সেই প্রবন্ধেই অক্ষরের লঘু গুরু নিরূপণের কথা বলিয়া রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন: "ইংরাজিতে অনেক সময় আট-দশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘু বাণের মতো ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙলায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।"

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইহা মনে করিবার কারণ ছিল যে, রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র কবিতায় এই অভাব দূর হইবে। কিন্তু "চৈতালী"র অনেক কবিতা পাঠ করিয়া তাহা বোধ হয় না। নিম্নে আমরা "চৈতালী"র একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

"সে ছিল আরেকদিন এই তরী পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধা-গীতি স্বরে;
ছিল তার আঁখি দুটি ঘন পক্ষ্মচ্ছায়,
সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
পাশে বসি বলে যেতো কলকণ্ঠ কথা,
কতো কি কাহিনী তার কতো আকুলতা!
প্রত্যুষে আনন্দ ভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাত পাখির মতো জাগাত আসিয়া।
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়,

আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোনখানে,
তাই ভাবিতেছি বসে সজল নয়নে।"

রবীন্দ্রবাবুর "স্মৃতি" সুন্দর। কিন্তু ইহারই শেষ দুই ছত্রের সহিত আমেরিকান কবি পো-এর একটি কবিতার কয় ছত্র তুলনা করুন—

"—The moon never beams without
bringing me dreams of the beautiful
Annabel Lee ;
And the stars never rise but I see the bright eyes
of the beautiful Annabel Lee."

"চৈতালী"র "শেষ চুম্বন" শীর্ষক কবিতাটি এইরূপ—

"দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
ঊষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।
ম্লান হয়ে এলো তারা, পূর্ব দিগ্বধূর
কপোল শিশির সিক্ত, পাণ্ডুর বিধুর।
... ... গেনু দূরে।"

ইহাতে বর্ণনার বাহুল্য ও বাহার উভয়ই আছে কিন্তু এ কবিতার যাহা প্রাণ, সেই মর্মব্যথার করুণস্বর ইহাতে নাই। ইহা প্রাণহীন শোভাময় প্রতিমূর্তির সহিত উপমেয়। এ যেন প্রেম লইয়া ছেলেখেলা; যেন কোনোদিন জীবনের কোনো অবসরকালে নিতান্ত কর্মাভাব প্রযুক্ত কাহারো হৃদয় লইয়া দুই দণ্ড খেলা করা হইয়াছিল; তাহার পর আঘ্রাত কুসুমের মতো সে হৃদয় ত্যাগ করা হইয়াছিল—এ তাহারই ম্লান স্মৃতি! প্রভাতের সৌন্দর্য বর্ণনার সহিত সে স্মৃতিটুকু বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেই মধুর বর্ণনার মধ্য হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়- সে সহজে চক্ষে পড়ে না। এ কবিতাটি পাঠ করিয়া মূরের সেই কথা মনে পড়ে—

"To sigh, yet feel no pain,
To weep, yet scarce know why ;
To sport an hour with beauty's chain,
Then throw it idly by.
To kneel at many a shrine,
Yet lay the heart on none ;
To think all other charms divine
But those we just have won,"

* * * * * * * *

মানব মাত্রেরই বোধ করি কতকগুলি স্থিরীকৃত ধারণা থাকে। এমন কতকগুলি ধারণা আছে, যাহা ব্যক্তি-

বিশেষে, পরিবারবিশেষে, শ্রেণীবিশেষে বা জাতিবিশেষে পরিবর্তিত হয় না, পরন্তু সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। সে সকল ধারণা সত্য কি মিথ্যা—বিশ্বাসের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, তাহা বিচারের কথা। কিন্তু এ-কথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, কোনোরূপ যুক্তি না দেখাইয়া সহসা আমাদিগের সেইরূপ কোনো ধারণায় গুরু আঘাত প্রদান করিলে, সমস্ত হৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠে। কবিতায় সেরূপ ধারণার যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার একরূপ অসম্ভব। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রবাবুও পাঠকের এইরূপ একটা অতি প্রাচীন ধারণার উপর অকারণে অনেকটা আঘাত প্রয়োগ করিয়াছেন। "চৈতালী"-র একটি কবিতা এইরূপ—

"সতীলোকে বসিয়াছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
... ...
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী (সতী)।"

অন্তর্যামী সে কাহিনী জানিতে পারেন এবং যে "অন্তর্যামী"কে কাব অন্যত্র বলিয়াছেন—

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।"

আপনাকে যাঁহার বীণা বলিয়া কবির সন্দেহ হইয়াছিল, সেই "অন্তর্যামী"র কৃপায় কল্পনাকুশলী কবিও হয়তো সে কাহিনী কল্পনা কর্ণে শ্রবণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু আমরা সে ব্যক্তিগত কাহিনীর বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি এবং মর্ত্যের এই অভাগিনীর এই অভিনব পদগৌরবে আমাদিগের অতি প্রাচীন ও প্রিয় একটি ধারণা বড়ো গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। বার্নস একস্থানে মানবের পাপের কথা কেমনভাবে বলিয়াছেন—

"Then gently scan your brother man,
Still gentler sister woman ;
Though they may gang a kennin wrong,
To step aside is human :
One point must still be greatly dark,
The moving why they do it !
And just as lamely can ye mark
How far, perhaps, they rue it."

"আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী একস্থানে বলিয়াছেন—

পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়,
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও-শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

* * * * *

পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।"

এই সকলই পাপীর প্রতি করুণার কথা—পাপের গৌরব-গীতি নহে। কোনো জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইলে, জাতীয় কবি হইতে হইলে, জাতির সুখ-দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি নিতান্তই আবশ্যক। "চৈতালী"র "অনাবৃষ্টি" শীর্ষক কবিতাটি এইরূপ—

শুনেছি পুরাকালে……
……পুরুষের প্রতি!"

যে কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক বীজ বপন করিয়া কেবল বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে—যে দেশে একবার অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে অজন্মা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, সে দেশের কবির পক্ষে অনাবৃষ্টির মতো একটা গুরুতর বিপদ লইয়া এরূপ বিদ্রূপ করা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। বিগত ৬০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ চারিবার দুর্ভিক্ষের ভীষণ অনলে দগ্ধ হইয়াছে; এখনো এদেশে দুর্ভিক্ষ ঋতু পরিবর্ত্তনেরই মতো আসিতেছে যাইতেছে। ১৮৩৭ খ্রীঃ দারুণ দুর্ভিক্ষে উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ মানব প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; ১৮৫৭ খ্রীঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, উড়িষ্যায় ও বিহারে দুর্ভিক্ষের ধ্বংস-লোলুপ শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল; ১৮৭৭ খ্রীঃ মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের হিসাব মতোই ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—মৃত সৎকার করিবার লোক ছিল না—শৃগাল কুকুরে মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া শেষ করিতে পারে নাই—তপনতাপতপ্ত প্রান্তরে হতভাগ্যদিগের অস্থি সমস্ত দেশকে ভয়াবহ শ্মশানের আকার দিয়াছিল। তাহার পর এই ১৮৯৭ খ্রীঃ অনাবৃষ্টি হেতু দেশের সর্বত্র দুর্ভিক্ষের যে ভীষণ প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়াছে, আমরা স্বচক্ষে যে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছি—সে দৃশ্য যেন আর কখনও কাহাকে দেখিতে না হয়। যে-দেশে অনাবৃষ্টি হেতু এইরূপ দুর্দশা উপস্থিত হয়, সেই দেশের কবি অনাবৃষ্টি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—

কলিযুগে হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি! নারীর মিনতি
এখনো কেবল খাটে পুরুষের প্রতি।"

ইহাতে জাতির দুর্দশায় দুঃখের একটা কথা নাই—জাতির বেদনায় সহানুভূতি নাই, জাতির প্রধানতম দুর্গতিতে একটু করুণার চিহ্নও নাই!!! জাতির সুখ-দুঃখ যদি আমাদিগের সুখ-দুঃখ না হয়, তবে আমরা জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াও অন্তর্ভুক্ত নহি—তবে জাতির প্রতি আমাদিগের কিছুমাত্র ভালবাসা নাই—তবে যে জননী জন্মভূমি প্রকৃতই স্নেহময়ী জননীর মতো স্নেহতপ্ত ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন, সেই

জন্মভূমির প্রতি আমাদিগের ভক্তি বা ভালবাসা কিছুই নাই!!!

*　　*　　*　　*

"চৈতালী"র সমালোচনা রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার সর্বাংশিক সমালোচনা নহে; পরন্তু তাঁহার প্রতিভার একভাবের আংশিক সমালোচনা মাত্র। রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার সর্বাংশিক সমালোচনার সময় এখনও আইসে নাই এবং আমাদের সকলেরই ইচ্ছা সে সময় যেন শীঘ্র না আইসে। সে সমালোচনা দর্শন করা আমাদিগের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে নাও থাকিতে পারে; কিন্তু এ-কথা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যে আমাদিগের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে "চিত্রাঙ্গদা", "বিদায় অভিশাপ", "মানসী" ও "সোনার তরী"র কবিকে পাইয়াছি, ইহা আমাদিগের বিশেষ গর্বের কথা। রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভা-রবির ভাস্কর জ্যোতিতে আমাদিগের সাহিত্যাম্বর বহুদিন ধরিয়া উজ্জ্বল থাকুক। রবীন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যে যে নবীন সৌন্দর্য সম্পদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃত চন্দ্রের মণ্ডলে।"

[দাসী, ৮ম ভাগ. ১২শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৮৯৭]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি *

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী। শ্রাবণ। সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র "গান।" আমরা ভাবগ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলকধাঁধার ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না।—

আজি যতো তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।

বাঙলায় লিখিত, কিন্তু বাঙালী পাঠকের পক্ষে "গ্রীক।"

দিকে দিগন্তে যতো আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,

অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। "আনন্দের গভীর গন্ধ" বোধ করি আকাশ-কুসুমের সৌরভের মতো—প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও "নাসাগম্য" নহে। রবীন্দ্রবাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, অনেক গাহিয়াছেন—এখনও যে তিনি যা-তা ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক-কবিসুলভ কবিত্ব-কণ্ডূতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন—সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত অপকারী, রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও যদি তাহা না বুঝিতে

* সে-যুগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্র-বিরোধিতা বহুশ্রুত। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা না করায় তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনার স্বরূপ কিংবদন্তীর মতোই দাঁড়িয়েছে। তাঁর সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল "মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা", এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য মাসিকে প্রকাশিত গল্প-প্রবন্ধ-কবিতার আলোচনা থাকতো। এই বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কি জাতীয় সমালোচনা প্রকাশিত হত তার নমুনা স্বরূপ দু-একটি সংখ্যা উল্লিখিত হলো। —স. ন. সা.

পারেন, তাহা হইলে আমরা নাচার।

……অনেক দিন হইতে বাঙলা ভাষার 'বানান' বদলাইবার চেষ্টা হইতেছে। 'ঙ' বেচারা বহুকাল "মাথায় পাগড়ি" বাঁধিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ক-বর্গের এক প্রান্তে সুপ্তিসুখে মগ্ন ছিল। রবিবাবু এই নিরীহ ব্যঞ্জন বর্ণটিকে কলমের তীক্ষ্ণ খোঁচায় জাগাইয়া তুলিয়া তাহার আলস্য অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়াছেন। এখন 'ঙ' বেচারা বঙ্গদর্শনের দরবারে 'ঙ্গ' 'ং' প্রভৃতি অনেকের 'বেগার' একাকী খাটিয়া দিয়া নিজের ধার সুদসমেত পরিশোধ করিতেছে।

[সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১১]

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রবাবুর "চোখের বালি" নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে শীঘ্রই "চোখের বালি" অভিনীত হইবে। রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর বাহার দেখিবার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু "চোখের বালি"র নাটকত্ব কোথায়, বলিতে পারি না। তবে তিলতর্পণ-ধৃত নাটকের ব্যুৎপত্তি এই—ন নাস্তি আটকো যস্মিন্—যাহাতে কিছুই আটক নাই।

[সাহিত্য, কার্তিক ১৩১১]

বঙ্গদর্শন। কাতিক। সম্পাদকের "নৌকাডুবি" এখনও চলিতেছে; ভক্ত পাঠকগণ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভরা ডুবির প্রতীক্ষা করিতেছেন।

[সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১১]

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী 'দুপুরে ও নিশীথে' বৈরাগ্যের—দেহতত্ত্বের--'ও পারে'র গান ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'তাঁহার' সন্ধানে মানসীকে নিযুক্ত করিবার পর, বাঙলা সাহিত্যের কবিতা কুঞ্জে—টপ্পার আসরে বৈরাগ্যের সুর জমিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর ব্রহ্মলাভের বয়স হইয়াছে। নবীন কবিরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়ার আলখেল্লা পরিয়া বাউলের সুরে দেহ-তত্ত্বের গান ধরেন, তাহা হইল আমাদিগকেও সুরদাসের ভাষায় বলিতে হয়,—'দেখো এক বালা যোগী' ইত্যাদি! টপ্পায়, খেয়ালে, ধ্রুপদে, মেঠো সুরে, সংকীর্তনে 'তাঁহাকে' পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙলার কবিতা কি 'যৌবনে যোগিনী' সাজিবে? এই যে নব-নারীকুঞ্জর দেখিতে-ছিলাম। নিমেষ না পড়িতে একি পরিবর্তন! এই অকালপক্কের দেশে কবির অনুভূতিও কি শুকদেব গোস্বামীর মতো ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপোবনে—ওঁ বিষ্ণু—'সমাজে' যাত্রা করিবে? সুর-সপ্তক অক্কা লাভ করিবে? কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে কেবল নাদব্রহ্ম গর্জিতে থাকিবে? জটাজুট-শালিনী, রুদ্রাক্ষমালিনী, গেরুয়া-ধারিণী তরুণী কবিতার কচিমুখে করুণ সুরে 'শেষের সেদিন' শুনিলে সহজ মানুষের ধমনী স্তব্ধ হইয়া যায়, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ উপস্থিত হয়, আশা করি, নবীন কবিরাও তাহা অস্বীকার কবিবেন না। অতএব ভোঃ ভোঃ কিশোর কবিগণ ফ্যাশনের অনুবর্তী হইয়া অকালে 'ও পারে' পাড়ি জমাইবার চেষ্টা করিও না। তাহা একদিকে যেমন হাস্যরসের উদ্দীপক, অন্যদিকে তেমনই সাংঘাতিক।— এই নব জাগরণের যুগে গতানুগতিক হইয়া দেবর্ষি নারদের বীণাতন্ত্রীর ঝংকারের অনুকরণে সফল হইলেও কোনো লাভ নাই। যদি কিছু বলিবার থাকে, নিজস্ব থাকে, বলিয়া যাও। জীবনের সন্ধ্যায় পুরবী ইমন ভাঁজিও, এখন—অরুণরঞ্জিত প্রভাতে ললিত ভৈরবী আলাপ করো। তাই-ই স্বাভাবিক।

[সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০]

অমরেন্দ্রনাথ রায়

আমাদের দেশে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শ্লোক আছে—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভেতি॥

কিন্তু কবিত্বশক্তি যে সুদুর্লভ, এ-কথা অনেকেই এখন মানিতে চাহেন না। কিছুদিন হইতে এই দেশের লোকেই কবিতার ও হেঁয়ালির ব্যবধান মুছিয়া ফেলিয়া ঐ শক্তিটাকে অতি সুলভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চেষ্টা অবশ্য তাঁহাদের মধ্যেই বেশি চলিতেছে, যাঁহাদের রচনায় হেঁয়ালির অংশই অধিক।

তবে সমালোচনা-ছলে দুই-চারিজন লেখকও যে ঐ হেঁয়ালিসর্বস্ব কবিতার সমর্থন না করিতেছেন, এমন নহে; কিন্তু তাঁহাদের কথা ধরি না। কারণ, তাঁহারা যাহা বলেন, তাঁহার অধিকাংশই মুখস্ত কথা। এমন কি, তাঁহাদের অনেককেই দেখিয়াছি, তাহারা কী বলিতেছেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না।—নিজেদের বুদ্ধির দুয়ারে চাবি দিয়া রবীন্দ্রনাথের কথাগুলাই তাঁহারা কেবল কপচাইয়া যান মাত্র।

এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই গুরু। অস্পষ্ট কবিতা-রচনায় 'নবীন কবিবরগণে'র প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ ও উৎসাহ প্রধানত তাহা হইতেই। অতএব এই কবিতা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে তাহারই কথা ধরিয়া আলোচনা করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতি'র এক স্থলে লিখিতেছেন,—"প্রতিধ্বনি নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটি অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না, তখন বিষম মুশ্‌কিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে, কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হয় ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।"

কিন্তু ফুলের গন্ধের সহিত কবিতা বুঝা-না-বুঝা ব্যাপারের তুলনা করায় কি সার্থকতা হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। এ ধোঁয়াটে ধরনের উপমা প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট না হইয়া আরও ঝাপসা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ফুলের গন্ধই হউক, আর তাহার সুন্দর আকৃতিই হউক, এ সমস্তই বহিরিন্দ্রিয়ের উপভোগের সামগ্রী। মনে রাখিতে হইবে, পুষ্পবিশেষের গন্ধ শুঁকিয়া বা তাহার শোভা দেখিয়া মনের সকল অবস্থাতেই কিছু একই ধরনের ভাবের উদয় হয় না। মানসিক অবস্থাভেদে একই পুষ্পের গন্ধে কখনও বা মনে দুঃখের তরঙ্গ উঠে, কখনও বা সুখের তরঙ্গ উঠে। কিন্তু কবিতা জিনিসটা মানুষেরই তৈয়ারী জিনিস। মানব হৃদয় হইতে উহার উৎপত্তি এবং মানব হৃদয়ের উপভোগের জন্যই উহার সৃষ্টি। সেইজন্য কবিতা নিজেই ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া মানব-মনে একটিমাত্র ভাবের উদ্রেক করে। যাহা দুঃখের কবিতা, তাহা চিরদিনই দুঃখের কবিতা। আর যাহা সুখের কবিতা, তাহা চিরদিনই সুখের কবিতা। যা-তা অনির্দিষ্ট ভাবের উদ্রেক করাই যদি কবিতার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কোকিলের কুহুস্বরও কবিতার স্থান

অধিকার করিত।

কবিতা বুঝাইবার জন্য লিখিত না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে বুঝিবার জিনিস সে বিষয়-সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। প্রকৃতির interpretation অর্থাৎ ব্যাখ্যা দেওয়ারই নাম কলাবিদ্যা। কবিতা জিনিসটা সুকুমার কলাবিদ্যারই অন্তর্ভূত। অতএব কবিতা বুঝা ব্যাপারটা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কবিতা কেবল শব্দরঞ্জিত চিত্রমাত্র নহে।

এটা আমাদের মনগড়া কথা বলিয়া কেহ ভাবিবেন না। রসজ্ঞমাত্রেই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের রচনায় যখন অর্থহীন কবিতার অংশ বেশি ছিল না, তখন তিনি নিজেই এই মতাবলম্বী ছিলেন। তখন তিনি কবিতা কাহাকে বলে, কবিতার উদ্দেশ্য কি, এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে অন্যরূপ বুঝাইয়াছিলেন। আমরা নিজে বেশি কিছু না বলিয়া তাঁহার সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

গীতি কাব্য সম্বন্ধে প্রায় নয় বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"আমরা যাহাকে গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটি মাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—
শূন্য মন্দির মোর,'

সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা-বাদলে ভাদ্র মাসে শূন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে —যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।"

"একলা কবির কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে; তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখ দুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও হৃদয়ের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।"

পাঠকের বুঝাবুঝির উপরেই যে কবিতা-জন্মের সার্থকতা নির্ভর করে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একবার নহে—বহুবার বহু প্রবন্ধে পূর্বে বুঝাইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—"হৃদয়ের ধর্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়।"

"গাছে ফল যে কটা ফলিয়া উঠে, তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না—আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রাঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব, সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলো ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমি লাভ করিবার সুযোগ— এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়।"

"এই যে এক মনের ভাবনার আর এক মনের মধ্যে সার্থকতা-লাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে

এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়।...এ-কথা বোধহয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে কোনো বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি, তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়।...বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ বহু প্রবন্ধে নানা রকমে বুঝাইয়াছিলেন যে, "একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়।...সেইজন্য যখন আমরা দেখি, একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিতেছে, তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।" আর "অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য; —সেই প্রকাশ যেখানে যতো অসম্পূর্ণ সেইখানে ততো সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।"

কাব্যের প্রকাশ যে সুস্পষ্ট অর্থাৎ বুঝিবার মতো হওয়াটাই উচিত এবং তাহার ব্যতিক্রমে যে কাব্যে দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তির দ্বারাই বুঝাইয়া দিলাম। এইবারে তাঁহার কথার দ্বারাই বুঝাইয়া দিব যে, কাব্যের প্রকাশ ধোঁয়াটে হয় কেন।

ভাষার দীনতা ছাড়া কবিতায় অস্ফুটতা দোষ ঘটিবার প্রধানত আরও দুইটি কারণ আছে। একটি কারণ— ভাবুক চিত্তে যে ভাবটি আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় নাই, সেই ভাবকে আকার দান করিতে গেলেই তাহা অপরিস্ফুট হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উহাকে 'জালিয়াতের কল্পনা' বলা যাইতে পারে। আর দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদিন ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,— "এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মানুষ আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে, সেই লোকটাই যে সব সময়ে লেখে তা ঠিক মনে হয় না। লেখক-মনুষ্যটি ভাবুক মনুষ্যটির প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনি অনেক সময়ে অনবধানতাবশত ভাবুকের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করেন না।" "আমি মনে করচি, আমার যেটি বক্তব্য আমি সেটি ঠিক লিখে থাকি এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে, কিন্তু আমার লেখনী যে কখন পাশের রাস্তায় চলে গেছে আমি হয়তো তা জানতেও পারিনি।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কি এখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি না যে, অস্পষ্ট কবিতার মধ্যে 'বৃহৎ আইডিয়া'র যে ভান করা হয়, সেটা শুধু ভান মাত্র? তাহাতে সত্যের সম্পর্ক মাত্র নাই? আর বৃহৎ idea-র কবিতাই বা এমন কে কি লিখিয়াছেন যে, যাহা উচ্চতায় হিসাবে রামপ্রসাদের গানের নিকটস্থ হইতে পারে? অথচ রামপ্রসাদ বুঝিতে কি কাহারও কষ্ট বোধ হয়? নায়ক-নায়িকার হৃদয় রহস্যই বা এমন কে কি ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা গুণে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীর পায়ের তলায় আসন পাইতে পারে? অথচ তাঁহাদের তুল্য সহজ ভাষার কবি আর কেহ আছেন কি?

বাক্য এবং অর্থ উভয়েতেই যাহাতে প্রতিপত্তি হয়, সেজন্য মহাকবি কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙলার নব্য কালিদাসেরা অর্থ জিনিসটাকে একেবারে গ্রাহ্যই করেন না। বাক্যই তাঁহাদের কবিতার সর্বস্ব। তাই সে কবিতা এক কান দিয়া ঢুকিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যায়। মরমের সহিত সে কবিতার সম্পর্কমাত্র নাই। সে কবিতা পড়িয়া Gifford সাহেবের কথাই মনে পড়ে—

"Abortive thoughts, that right and wrong confound,
Truth sacrificed to letters, sense to sound.
False glare, incongruous images, combine,
And noise and nonsense clatter through the line."

আসল কথা, হো হো করিয়া মিথ্যাকে চাপা দেওয়া চলে না। 'কবিতায় বুঝিবার কিছু নাই, এ-যে কেবল গন্ধ' বলিয়া মেকি চালাইতে চেষ্টা করিলেও তাহা চলিবে না। লোকে এক-একটু করিয়া বুঝিতে শিখিতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের 'নিজের মধ্যে যে একটা গৃহবিবাদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে না' বলিয়াই তিনি ঐ অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিতেছেন।

[রবিয়ানা, ১৩২৩]

চিত্তরঞ্জন দাশ

চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'সাহিত্যে'র মতো বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রমণ না থাকলেও রবীন্দ্র-বিরোধী কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। "স্ত্রীর পত্রে"র প্রতিবাদে লেখা বিপিনচন্দ্রের "মৃণালের কথা (১৩২১)" 'নারায়ণে'র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "পয়লা নম্বরে"র উত্তর "দোসরা নম্বর" লিখেছিলেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। শেষোক্ত লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে"র ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের সমতুল্য মনে করতেন না। "বাঙলার গীতিকবিতা" প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, ৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত) লিখেছিলেন :

"ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাঙলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইওরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই যুগের এই কবিতার কথা অন্য সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন শুধু একটি কথা বলিয়া রাখিব। আমি যে "রূপান্তরে"র কথা বলিয়াছি, আজও পর্যন্ত আমাদের এই যুগের গীতি-কাব্য সেই রূপান্তরের অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের লেখার কোনো-খানেই তাহা মিলে না। মাইকেলের অশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার "ব্রজাঙ্গনা" সেই পর্দার কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই, ব্রজ কবিতায় শুধু নিতান্ত বাহিরের জিনিস লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছিলেন মাত্র। সুরেন্দ্র মজুমদারের 'মহিলা', বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদা মঙ্গল' আমাদের আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহাদের কবিতাতেও সেই সুর সেইভাবে জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া বাক্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, সে বিচার করিবার সময় আমার বোধ হয় এখনও আসে নাই।

একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর শুধু একজন নীলকণ্ঠ—যাঁর

সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।”

সেই পুরানো সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজও বাঙলার ভিখারী বৈষ্ণব তাহা গাহিয়া বেড়ায়। কিন্তু কল্পকলার সেই রূপান্তরে কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলেরি লক্ষ্য তাই, সাধ্য তাই, সাধনা তাই। সে সাধক এখনও আসেন নাই। তবে বাঙলা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙলা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।”

এই বক্তব্যই তিনি “রূপান্তরের কথা” নামে পরবর্তী প্রবন্ধে আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন :

“আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙলার আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই প্রাণে-প্রাণে অনুভূতি, সেই “স্বাদিতে নিজ মাধুরী” প্রাণের সেই সার্বভৌমিক কল্পকলার রূপান্তর হয় নাই। চণ্ডীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আছে। গীতি-কবিতার প্রাণ কবির আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে। কবির প্রাণে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে যে রূপের পরিচয় কবি লাভ করেন, তাহার আত্মার নিগূঢ় কথাটি, মর্ম্মটি প্রকাশ করিয়া তোলাই গীতি-কবিতার ধর্ম্ম। কথাটি অপ্রিয় হইলেও আমাকে বলিতে হইবে, বাঙলার আধুনিক গীতি-কবিতায় সে জিনিসটা পাওয়া যায় না। এই যে শতবর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্যে গীতি-কবিতার বিরাট আয়োজন, ইহা আমাদের জীবনের কোনো কর্ম্মই, কোনো সাধনাকেই সার্থক করে নাই ; কোনো সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

“পিতলকি কাটারি কামে নাহি আওল
উপরকি ঝকমকি সার।”

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতির নয়—মাথার বোঝা। ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহরণ করা। ইংরাজি সাহিত্যের ও ফরাসী কবিতার তর্জমা, হয়তো বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাঁদে গড়া। তাহাতে বাঙালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই—আছে শুধু অনুকরণ! অনুকরণে কখনও জীবন আসে না, ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন, একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙলার প্রাণের সঙ্গে তাহার কোনো যোগ নাই।”

এ ছাড়া ‘নারায়ণে’র ৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩২৪) “ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ” শীর্ষক একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। অপর্ণা দেবী “মানুষ চিত্তরঞ্জন” গ্রন্থে বলেছেন, “অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথের অতো কঠোর সমালোচনা না থাকলে ‘নারায়ণ’ সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, সব যুগে সব মনীষীকেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্র লেখনী ও আশীর্বাদপুষ্ট ‘সবুজ পত্রে’ পিতৃদেবও কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সমগ্র জীবন ভরেই সে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন তিনি। পিতৃদেব যখন “রবিদ্বেষী” বলে সমালোচিত হলেন, তখন তিনি বললেন, “কথাটা ঠিক হলো না, আমি রবিদ্বেষী একেবারেই নই, তাঁর অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনও অস্বীকার করি না, তবে তাঁর সব লেখাই যে আমার ভালো লাগে তা বলতে পারি না।” তিনি রবিদ্বেষী হলে ‘মালঞ্চে’ লিখতে পারতেন না, “এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট।” রবি-বিদ্বেষী তিনি কখনও ছিলেন না, তবে এ-কথাও সত্য রবীন্দ্রনাথের সব লেখারই অন্ধ স্তাবক ছিলেন না তিনি।” (পৃঃ ১৩০)

পঞ্চম দশকের প্রেক্ষিতে গল্পগুচ্ছ ॥ অমলেন্দু চক্রবর্তী

এক

আজ—বিশ শতকের পঞ্চম দশকও যখন কালের নিয়মে বিগত—বাংলাদেশের মাটিতে নিজের বিশ্বাস আর উপলব্ধিকে ছোটগল্পের ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে একালের একটি যুবক কি ভাববেন? শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার সীমারেখা আজ অস্বীকৃত। একমাস আগে প্যারিস বা মস্কো শহরে যে উপন্যাস চাঞ্চল্য তুলেছে, কলকাতায় তার তরঙ্গ তুলতে দ্রাঘিমা-অক্ষাংশের পরোয়া করে না। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের মহারথী, অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের পূর্বজদের ঐতিহ্য—নিজের অপরিণত মনকে ক্ষুরধার করতে তাকে ভাবতে হয়—অনুসৃতির লক্ষ্য কোন্ দিকে? কোথায় আশ্রয়? যুবক এলিয়টকেও এমনি এক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল একদিন, এবং বার্ধক্যে পৌঁছে তিনি বিনা-দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন—ইংরেজি ভাষার কবি হলেও তাঁর প্রাথমিক ঋণ ফরাসী কবিদের কাছে। বাংলাদেশের অধুনা তরুণ ছোটগল্প লেখকেরা কি বলবেন এ-কথা?

এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু বর্তমানে এটা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেক বাঁক ঘুরে এবং অনেক বন্দর স্পর্শ করে বাংলা ছোটগল্পের ধারা আজ এই পঞ্চাশের তরুণদের হাতে নতুন দিকে অগ্রসর হতে প্রয়াসী। মূল্যবোধের সমতার জন্যই বিদেশী ছোটগল্পের মতো বুদ্ধিনির্ভরতা আজ তরুণদের অবলম্বন হতে চলেছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এ-প্রভাব শুধুমাত্র আঙ্গিক বা গঠনরীতির ক্ষেত্র পর্যন্তই প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বক্তব্য আর বিষয় সামগ্রীর চিরকালীন পটভূমি তার স্বদেশ আর দেশের মানুষ। এই একই দেশ—যে দেশের কথা ইতিপূর্বে অসংখ্যবার, এত অসংখ্য গল্পে-উপন্যাসে নাটকে-কবিতায় মূর্তি পেয়েছে তারই কথা নতুন ভাবে নতুন করে বলতে হবে। বিবর্তিত সমাজ-চেতনা এ দায়িত্ব দিয়েছে, নতুন করে দেখবার দৃষ্টি দিয়েছে। নিজের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনেই তখন একবার তাকাতে হয় পিছনের দিকে, অতীতকে যাচাই করে দেখতে হয়—কতদূর এগোলাম।

'গল্পগুচ্ছ'ই বাংলা ছোটগল্পের জন্ম-ঘোষণা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই দাবি জানিয়ে বলেছেন—'গল্পগুচ্ছে বাংলায় ছোটগল্প আমিই আরম্ভ করেছিলুম।...গরিবের ঘরে তো অনেকেই জন্মেছে কিন্তু তারা দেখেনি—কখনও আমার মতো করে তারা দেখেনি। ছোটগল্প, বাংলার পল্লীর গল্প এর আগে হয়নি।' এ-দাবি অস্বীকার করবেন না কেউ। কেননা, তাঁর এ দাবি ইতিহাসের স্বীকৃতি।

কিন্তু পরে হয়েছে। শুধু পল্লীতে নয়, শহরে, কারখানায়, আদিবাসী অঞ্চলে, সর্বত্র তার পরিসর বিস্তৃত। এক ত্রিশের যুগই বাংলা ছোটগল্পের সীমানাকে দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই পঞ্চাশের তরুণের কাছে রবীন্দ্রনাথ পিতামহ, তার নিকটবর্তী পূর্বপুরুষ আরও অনেক প্রতিভা। এই দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও 'গল্পগুচ্ছ' তার প্রাণের প্রাচুর্যে নিঃস্ব নয়। সেখানে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যার জন্য বাংলা-দেশের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ব্যাপক পঠিত। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—আজকের তরুণ লেখকের কাছে 'গল্পগুচ্ছের' নব-মূল্যায়ন কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?

দুই

'এবার ফিরাও মোরে' বলে রবীন্দ্রনাথ একদিন সংসারের তীরে ফিরতে চেয়েছিলেন। সেটা তাঁর জীবনে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো নয়, আন্তরিক উপলব্ধি। কিন্তু বিস্মৃত হলে চলবে না যে, সেটা রোমান্টিক কবিরই বেদনাসঞ্জাত আর্তি। রবীন্দ্রনাথ নাগরিক, বিশুদ্ধ শিল্পে বিশ্বাসী। বস্তুতান্ত্রিক-চেতনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি সীমা আছে। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও যদি অনভিজাত জনসাধারণ, অসংখ্য হরিপদ কেরানী আর সাধারণ মেয়ে মালতী ব্যাপকভাবে আশ্রয় পেয়ে থাকে তবে তারা একমাত্র গল্পগুচ্ছেই দৃশ্যমান। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী। এ-ধারণা অসত্য নয় কিন্তু সীমিত অর্থে বিচার্য। 'পচা-ডোবা' আর 'পঙ্কিল পল্বলে' অমিল নেই কোনোদিনই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে জানতেন 'পঙ্কিল পল্বল' হিসেবেই।

এ-দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেজাজের আশ্চর্য সঙ্গতি আছে অ্যাণ্টন শেকভের। রিয়ালিজমের নামে বিশুদ্ধ শিল্পের পবিত্রতাকে তাঁরা দুজনই হারাতে চাননি। অথচ লেখক জীবনের মূল আদর্শ হিসেবে শেকভের বাণী ছিল—Be objective। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অনুসৃত রীতিই মানুষের জীবনভাষ্য অবিকৃতভাবে প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ঋদ্ধিমান। সেজন্য বাস্তবতার খাতিরে নিজস্ব শিল্পরুচিকে আঘাত করা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—'নিজের জমিদারিতে একদিন আমি তাদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করেছি। আমি দূরে থাকিনি, থাকতে পারিনি। কারণ আমি একটা পরিপূর্ণতাকে ভালবেসেছিলুম। এই দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা, মলিনতা—দেখা যায় না; তা আমার কবিত্বকে আঘাত করেছিল। আমাকে নামতে হলো অবশেষে আমার যা কিছু সম্বল সামর্থ্য ছিল—সব নিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।" 'গল্পগুচ্ছের' বাস্তবতার মাপকাঠি এখানেই। অনুজ গোর্কির মতো 'লোঅর ডেপ্‌থ'-এ নামতে পারেননি অ্যাণ্টন শেকভ কিন্তু 'কোরাস গার্ল', 'ডেথ্ অব এ ক্লার্ক'-এর মতো গল্প লিখেছেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাসাহিত্যে যে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' পীড়িত মানুষের কথা ব্যক্ত হলো রবীন্দ্রনাথ তা বলতে পারেননি। কারণ তা অসম্ভব। তাই অনুজদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা বিচার্য নয়, পূর্বজদের তুলনায় তার আপেক্ষিক মর্যাদা। নইলে আমাদের কাছে (আমরা, যারা বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকে তারুণ্যকে পেয়েছি) গল্পগুচ্ছের আবেদন 'নষ্ট শশা পচা চালকুমড়ার স্বাদ' দিতে হয়তো পারে না তার কারণ চরম অবক্ষয়ের মুখে আমরা জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রিশ-চল্লিশের অনেক লেখককে পেয়েছি। তাই আমাদের কাছে গল্পগুচ্ছের বাস্তবতা সীমিত অর্থে বিচার্য হলেও, ঐতিহাসিক দিক থেকে স্বীকার করতেই হবে গল্পগুচ্ছের সঞ্চরমান নরনারীর পদধ্বনি রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অশ্রুত।*

'গল্পগুচ্ছের সাধারণ মানুষ সহৃদয় কবির বুকে আলোড়ন তুলেছে, কবি তাদের দৈনন্দিন দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন কিন্তু পাপ দেখেননি, দেখতে পাননি একজনের অন্যায় অবিচার অন্যের উপর কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মপ্রাণ টলস্টয়ও একটি 'নেকল্যুডভ' সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি। অবশেষে বাইবেলের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল 'রেসারেকশানে'র নায়ক কিন্তু পাপের

* 'গল্পগুচ্ছে'র বাস্তবতা আমাদের কাছে কেন এত প্রচ্ছন্ন তা তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'গল্পগুচ্ছে'র ভাষা প্রসঙ্গে আলোচ্য।

পথ ধরেই সেখানে পৌছতে হয়েছে তাঁকে। একটি গল্পে কোনো এক চরিত্রভ্রষ্টা নারীর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পাঠকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে পতিতাকে তৈরি করেছেন মমতাময়ী মাতা। তারপর গল্প ক্ষীরোদাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হলো না, মোহিতমোহনকে কেন্দ্র করেই তার বিস্তার। পুরুষশাসিত সমাজের একটি কুলাঙ্গারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেই লেখক ক্ষান্ত। কিন্তু যে পাপবোধ বা অনুশোচনা থেকে অপরাধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, মানবচরিত্রের জটিলতা দ্বিগুণ হয় লেখক সেদিকে যেতে নারাজ। বেশ পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতার মধ্যেই এ গল্পের শেষ। এ গল্পের বাস্তবতার সীমা নির্যাতিত এবং প্রবঞ্চিত ক্ষীরোদার প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধের ওপারে যেতে পারেনি। দুখিরাম নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছে তার স্ত্রীকে কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা থেকে দুখিরামকে রেহাই দিতে লেখক নিজেই যেন অস্থির। চন্দরার আত্মত্যাগের মহত্ত্ব গল্পটিকে যেখানে পৌছে দেয়, স্ত্রী হত্যার পাপটুকু কোথায় কোনো অক্ষরগুলিতে লুকিয়ে থাকে গল্পপাঠের পর পাঠক তা বিস্মৃত। একটি গল্পের নায়ক ভাবতে পারে—'এ-সব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখির গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।' (প্রতিবেশিনী) রবীন্দ্রনাথ তা চাননি। রক্ষণশীল সমাজের অসংখ্য নিষেধ সত্ত্বেও একটি বাল-বিধবাকে যে একটি যুবক ভালবাসতে পারে, নিষ্ঠুর সামাজিক শাসনের চাপে বিন্দু-নিরুপমার মতো অসহায় মেয়েদের যে জীবনের অপচয় ঘটে--এই উপলব্ধি আর এই বেদনাবোধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতার সীমারেখা।

এর কারণ ছিল। জীবনের জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। মনস্তত্ত্বের গভীরতম অন্তঃপুরে মানুষের যে বিচিত্র স্বরূপ তার আবিষ্কারই বঙ্কিমচন্দ্র বা অন্যান্য পূর্বসাধকদের সঙ্গে তাঁর অন্যতম স্বাতন্ত্র্য লক্ষণ। কিন্তু জীবনের ক্রূরতা-কুটিলতা-নগ্নতাকে তিনি পরিহার করেছেন সজ্ঞানে। উদার-প্রসারিত প্রকৃতির দৃশ্য-পটে মানুষকে দেখেছেন তিনি। নদী-মাটি আকাশের নিত্যসহচর যে মানুষ তারা কবির চোখে শিশুর মতো নিষ্পাপ, সহজ, সুন্দর। 'গল্পগুচ্ছে'র মনোযোগী পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত অধিকাংশ গল্পেরই নায়ক-নায়িকা শিশু বা কিশোর অথবা কোনো একটি শিশুকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর নির্মাণ। 'অতিথি'র তারাপদ, 'আপদ' গল্পের নীলকান্ত, 'সমাপ্তির' মৃন্ময়ী, অথবা শুভা, ফটিক গিরিবালা এবং আরও অনেকে। কবির ভাষায় এরা সবাই সেই 'দালিয়া প্রকৃতি-সাম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে।' যেখানে বয়স্কদের নিয়ে কাহিনীর বুনন সেখানেও কোনো একটি শিশুকে কেন্দ্র করেই সমস্যার সৃষ্টি। রাইচরণের বেদনা, শশিকলার যন্ত্রণা (প্রসঙ্গত কাবুলিওয়ালার হৃদয়ার্তি) তার উদাহরণ। প্রকৃতি-লালিত মানুষের সারল্যকে প্রকাশ করার উপযোগী উপকরণ—শিশু। তাই রোমান্টিক কবির চোখে বয়স্করাও অনেক ক্ষেত্রে শৈশবের গণ্ডি পেরোতে অক্ষম। রামকানাই, ছিদাম-দুখিরাম, বংশীবদন—বয়সের বিচারে এরা সকলেই হয়তো উত্তর-তিরিশ কিংবা তারও চেয়ে বেশি কিন্তু মনের বয়সে অনুত্তীর্ণ কিশোর, আচরণে অসহায়। এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসাধক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মূলত দুটিই চরিত্র—অপু আর দুর্গা। অন্যান্য গল্পে-উপন্যাসে নানাভাবে নানাবেশে বিভিন্ন বয়সে তাদেরই অনুবর্তন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'রাসমণির ছেলে' অনেক সময় সেই অপু আর হরিহর সর্বজয়াকেই মনে করিয়ে দেয়। কালীপদ সেই কিশোর, নিদারুণ দারিদ্র্যের অভিশাপেও যে পরাভবের কাছে আনতবিমুখ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'গল্পগুচ্ছে' প্রকৃতির ভূমিকা কতখানি। 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ'কে মিলিয়ে দেখা আমাদের সমালোচকদের স্বাভাবিক প্রবণতা। এ-তুলনামূলক বিচারের যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। প্রাথমিক-ভাবে প্রকৃতির কাছে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের কুশীলবকে পেয়েছিলেন এ-কথা ঠিক। সেই প্রকৃতির লীলাভূমি পল্লীবাংলা। কিন্তু গল্পগুচ্ছের শেষ পর্যন্ত কি তিনি সেখানে থাকতে পেরেছিলেন? শেষদিকে, বিশেষত গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে তিনি যে নগরমুখীন হয়ে উঠেছিলেন এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া এ-প্রশ্নও তো মনে জাগা স্বাভাবিক, গ্রাম-প্রকৃতি তাঁকে এতটা আচ্ছন্ন করলেও তিনি গ্রামীণ পরিবেশে উপন্যাস লিখলেন না কেন? উপন্যাসে কেন তিনি এত বেশি নাগরিক? মূলত গল্পগুচ্ছের ক্রমপরিণতির ধারাই এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

(রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের সূচনা ঘটেছিল তাঁর কবিসত্তারই অঙ্কুর থেকে। প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি গ্রামীণ জীবনের হাসি-কান্না-উল্লাস-বেদনায় অনেক অসঙ্গতি অনেক বিরূপতা লক্ষ্য করেছেন। তখনই তাঁর বিষণ্ণ রোমান্টিক মন বারবার মুক্তির পথ খুঁজেছে। 'গল্পগুচ্ছে'র প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই মুক্তিপথের (Romantic escape) নিশানা: চিরন্তন শিশুমনকে আশ্রয় করে যেখানে আখ্যান নির্মিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় কবি এক 'মেটাফিজিক্যাল' স্তরে উত্তীর্ণ হতে প্রয়াসী এবং দেশ-কালের সীমানা ডিঙিয়ে কাহিনী বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মসমর্পিত—মাটির বন্ধন ছেড়ে আকাশের কিনারা খুঁজতে উন্মুখ। রতনের ছোট বুকে দাদাবাবুর বিরহ বেদনা কেন এত গভীর এবং সেই অবোধ বালিকার দুঃখে প্রবাসী মানুষকেও কেন এ-উপলব্ধিতে পৌঁছতে হয় –'একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।' যে কারণে রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার পরিবেশ শহর হলেও হৃদয়গত পটভূমি গ্রামীণ, সে কারণেই 'ছুটি' গল্পের ভিত্তি প্রশান্ত পল্লী। অন্তিমমুহূর্তে ফটিক যখন আর্তকণ্ঠে বলে—'এখন আমার ছুটি হয়েছে মা। এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি,' তখন কি মনে হয় সে-বাড়ির ঠিকানা এ পৃথিবীর কোথাও। নীলকান্তকে বাঁধতে চেয়েছিলেন কিরণময়ী কিন্তু একটা শৌখিন দোয়াতদানির চেয়ে বড়ো কিছু যে আছে পৃথিবীতে সে-কথা না বুঝে সবাই (শুধু কিরণময়ী ছাড়া) ভুল বুঝল কিশোরের অভিমান। অন্নপূর্ণাও তারাপদকে চারুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে নিবিড় করে বুকে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। নীলকান্ত, তারাপদ—পথের ছেলে পথেই ফিরে গেল। তাই তারাপদ 'স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপ্রকৃতির নিকট চলিয়া গিয়াছে।' এমন কিছু গল্প আছে যার নায়ক শিশু না হলেও প্রকৃতিতে মুক্তিসন্ধানী। যেমন সেই মাস্টারমশাই—গ্যারিবল্ডি আর উজ্জ্বল ভারতসন্তান হবার আকাঙ্ক্ষায় একদিন যিনি প্রেমকেও বাতিল করেছিলেন। যখন সেই প্রেমের অনুভূতি নতুন করে উদ্দীপিত তখন তার সময় নেই। কেননা, সুরবালা তখন পরস্ত্রী। পার্থিব প্রেমের আকুলতা তিনি দমন করলেন আরও একবার। এবার আদর্শের খাতিরে নয়, উন্মত্ত প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনো এক অনন্ত মুহূর্তে। তখন আর সুরবালাকে হারাবার বেদনা নেই কারণ তার চেয়েও মহত্তর উপলব্ধি তাকে জীবনের স্বাদ এনে দিয়েছে। তখন তিনি অনায়াসে ভাবতে পারেন—'স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।' এ-সব গল্পে প্রকৃতির অধিনায়কত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। সমাজ সংসার জীবনের কলরব এখানে মিথ্যা। বসন্তের মৃদু বাতাসের

মতোই মনের উপর স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে যায়। কিন্তু এ-গল্পগুলোই 'গল্পগুচ্ছে'র একমাত্র পরিচয় নয়। এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রকৃতি নিয়ে রোমান্টিক ব্যাকুলতা এবং সমাজ-চেতনাসমৃদ্ধ বাস্তবতার কোনো সমন্বয় 'গল্পগুচ্ছে' ঘটেছে কিনা? সূক্ষ্ম বিচারে এ-দুটি চেতনা আপাতবিরোধী সন্দেহ নেই। 'গল্পগুচ্ছে'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা প্রকৃতিতন্ময় হলেও পাশাপাশি তিনি এ-সত্যও অনুভব করেছেন যে, কথাসাহিত্যে রক্তমাংসসৃজিত মানুষের জীবনভাষ্য। প্রকৃতি তখন আরও ঘনিষ্ঠ এবং আরও গভীরতর হয়ে প্রকাশিত। যেখানে নৈসর্গিক দৃশ্যের উপর চোখ রেখে কবি মানুষকে দেখেননি বরং মানুষের দিকে তাকাতে গিয়ে পশ্চাতপটে আকাশ দেখেছেন, দেখেছেন নদী-বন-উপবন—প্রকৃতি তখন আবহমাত্র, পাদপ্রদীপের আলোয় মানুষই নায়ক। তখনই দেখা যায় উল্লিখিত গল্পগুলির মতো প্রকৃতিসর্বস্বতা এই গল্পগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিরবদ্ধ নয়, জীবনের নানা ব্যর্থতা, গ্লানি, কান্না, হতাশা সম্বন্ধে লেখক সম্পূর্ণ সচেতন। এই সমাজ-সচেতনা এমন পর্যায়ে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে, যেখানে তার নায়িকা আত্মহত্যা করে। এ-পলায়ন প্রকৃতিতে আশ্রয় নয়, জীবনের অবাঞ্ছিত পরিণতি। এ-ক্ষেত্রে কাদম্বিনীর মৃত্যুর দৃশ্য স্মরণ করা যেতে পারে। এছাড়া 'দেনা পাওনা,' 'ত্যাগ', 'অনধিকার প্রবেশ', 'দিদি', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' 'উলখড়ের বিপদ' এবং পল্লীবাংলার পটভূমিকায় রচিত অন্যান্য অনেক গল্পে লেখককে বাস্তবের রূঢ়তা স্বীকার করে নিতে হয়েছে। এসব গল্পে প্রকৃতির যদি কোনো স্থান থাকে তবে তা বাইরের দৃশ্যপটে নয়, মানুষের আভ্যন্তরিক স্বরূপে বিধৃত। মেঘ ও রৌদ্র জাতীয় গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈধব্যের রিক্ততা-চিহ্ন নিয়ে গিরিবালা আবার যেদিন শশিভূষণকে আমন্ত্রণ জানাল সেদিন শশিভূষণের কাছে 'সেদিনকার সেই সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সঙ্গীতময় জ্যোতির্ময় অপূর্বরূপ ধারণ করিল' কিন্তু এই সমস্যাবহুল গল্পে 'বিশ্বহৃদয়ের অনির্বচনীয় দুঃখ' সত্ত্বেও 'একরাত্রি'র নায়কের মতো তিনি দুঃখকে অতিক্রম করে আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হতে পারলেন না। 'এই বর্ষাম্লান প্রভাতের' আবহাওয়া তাকে আরও ব্যথিত, বিষণ্ণ করে তুলল এবং অবশেষে চোখের জলে মুক্তি পেলেন। স্পষ্টত বোঝা যায়, কোনো জটিল সমস্যাকে স্বীকার করে গল্প লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ তার নায়ককে বিশ্বপ্রকৃতির দ্বারে নিয়ে গিয়েও পার্থিব দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারেননি। প্রকৃতি আর মানুষ এখানে একাত্ম। বিভিন্ন প্রতীকে-ইঙ্গিত-আভাসে প্রকৃতি গল্পের মধ্যে আশ্রিত, কখনও মধ্যমণির আসন তার হয়নি। বরং এ-গল্পগুলি লেখকের সামাজিক ইতিচেতনারই পরিচয়বহ। উত্তরকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আর 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে পরস্পর-সম্পৃক্ত মানুষ-প্রকৃতি যেভাবে মূর্ত, সীমিত-অর্থে গল্পগুচ্ছের এ-পর্যায়ের গল্পে একই ভাবে প্রকৃতি-মানুষ শরিকানা নিয়ে নেই, একান্নবর্তী।

প্রকৃতি থেকে সরে এসে একসময় যখন মানুষই 'গল্পগুচ্ছে'র প্রাণকেন্দ্রে অধীশ্বর হয়ে উঠল তখন পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার নগরের দিকে ফিরলেন। পল্লী বাংলার পরিবেশই যদি তাঁর ছোট গল্প রচনার প্রেরণা হয় তবে এ-প্রত্যাবর্তন কেন? একদা গ্রাম-বাংলার মাঠে-প্রান্তরে, নদীর উপকূলে তিনি যে একক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছেন তা থেকে নতুন শিল্প-মাধ্যম খুঁজে পেলেন। কিন্তু ক্রমপরিণতির অভিজ্ঞতায় দেখলেন, সে মানুষ শুধু গ্রামে নয়, শহরেও বিচরণশীল।

গ্রামকে পরিহার করে যখনই শহর জীবনের পরিবেশে কাহিনী রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন তখনই (কাবুলি-

ওয়ালা ব্যতিক্রম) কোথাও তিনি প্রচলিত সমাজনীতির তীব্র সমালোচক, কোথাও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ভ্রূ-কুঞ্চিত। সেখানে তাঁর সমাজ-সচেতনা আরও বেশি তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং এ-কথাও বলা চলে এখানে নিসর্গপ্রভাব প্রায় অনুল্লেখ্য। নাগরিক জীবনে হাঁফ-ধরা মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি অবশ্য তাঁর চশমা বদলে নেননি। যে দৃষ্টিতে গ্রামের পরিবেশে মানুষের বিচিত্র জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন, শহরের চার-দেয়ালে ঘেরা পরিসরেও তিনি সেই পীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনায় আকুল। 'কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের গলিতে ফিরব না।…সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।'—মৃণালের এই অভিযোগ হৃদয়হীন সমাজের প্রতিই তীব্র আঘাত। 'মাস্টারমশাই' হরলালের করুণ পরিণতি কি শুধু একটি ব্যক্তির ট্র্যাজেডি, বেণু এবং সতীশকে যে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সে সমাজের চেহারা দেখে আমরা আতঙ্কিত হই কিনা, হেমাঙ্গিনীর অপরাধ কি তার নিজের অপরাধ, সমাজবিধানের কোন্ দোষে বিবাহিত জীবনে হৈমন্তী অপমানিত ? অথবা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কৃত্রিমতায় আত্মতুষ্ট সেই নবেন্দুশেখর, অনাথবন্ধু, স্বাদেশিকতার নামে অর্থপূর্ণ আদর্শবোধের প্রচারক অমিয়া এবং তার নব্য ভাইফোঁটার দল, কিংবা কলিকা লেখকের বঙ্কিম-কটাক্ষ থেকে কেউই রেহাই পাননি।

'গল্পগুচ্ছে'র পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাবর্তন অন্য একদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথা-সাহিত্যের একদিকে তিনি যেমন পল্লীবাংলার প্রাত্যহিক জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করলেন, অন্যদিকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর সেদিকে ফিরলেন না। অনভিজাত সাধারণ মানুষ তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেল না। 'চতুরঙ্গ' বা 'শেষের কবিতায়' প্রকৃতির কিছুটা ভূমিকা হয়তো আছে কিন্তু সে প্রকৃতি গ্রামীণ প্রকৃতি নয়। সামগ্রিকভাবে (উল্লিখিত উপন্যাস দুটি সহ) উপন্যাসে তিনি নাগরিক। 'গল্পগুচ্ছে'র সচেতন পাঠকের চোখে এ-বৈষম্য ধরা পড়া স্বাভাবিক। গ্রাম এবং পল্লীজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন উত্তরণের মধ্য দিয়ে 'গল্পগুচ্ছে'র শেষ অধ্যায়ে তিনি যেখানে এসে পৌঁচেছেন, সেখানে মেজাজের দিক থেকে আমরা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের নিকটবর্তী হই (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য—'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' আর 'রাজর্ষি' অনেক পূর্ববর্তী রচনা)। তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুচ্ছে তিনি মূলত নাগরিক। পাঠকের সতর্ক দৃষ্টি এ-প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করবে যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসের পূর্বাভাস 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্পের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। 'নামঞ্জুর' গল্প আর 'সংস্কার' গল্পের সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের একটা নিকট-সাদৃশ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। দুটি গল্পের উত্তম পুরুষ নায়কই যেন নিখিলেশের জবানিতে কথা বলছে। 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' উপন্যাসের বক্তব্য 'মধ্যবর্তিনী' 'দৃষ্টিদান' গল্পে অপ্রচ্ছন্ন। প্রসঙ্গত 'চোখের বালি'র সঙ্গে 'নষ্টনীড়ে'র দূর-আত্মীয়তাও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে, 'মহুয়া'র কবিতায় প্রেম বা নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন এবং তার পূর্ব-লক্ষণও 'গল্পগুচ্ছে' প্রতিভাত।

অসংখ্য প্রেমের গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাল্য বিবাহ যে-যুগে স্বাভাবিক সমাজ বিধি সেযুগে অবিবাহিত যুবক-যুবতীর প্রেম নিয়ে কাহিনী রচনা সঙ্গত কারণেই আয়াসসাধ্য। শুধুমাত্র এ-জন্যই 'গল্পগুচ্ছে' এ গল্পগুলির প্রাধান্য নয়, তার অন্য গুরুত্ব আছে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমকে একটি বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন তিনি। ইতিপূর্বে এমন করে প্রেমের সমস্যাকে লক্ষ্য করেননি কেউ। এর অর্থ এই নয়

যে, পূর্ববর্তীদের রচনায় প্রেম অনুপস্থিত। অন্যান্যদের কথা বাদ দিলেও শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই প্রেমের প্রসঙ্গ প্রচুর। তবু পার্থক্য আছে। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর স্বাভাবিক প্রেমের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলতে পারেননি। কোথাও সেটা সামাজিক, কোথাও ধর্মীয় প্রতিবন্ধক। একটি নৈতিক-চেতনার রক্তচক্ষু প্রতি মুহূর্তে তাঁকে শাসন করেছে। নেতিবাচক পন্থায় তাঁকে প্রমাণ করতে হয়েছে কোনটা সামাজিক সত্য, কোনটা ন্যায়। তাই আয়েষা, শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, শ্রী—এদের কেন্দ্র করে উপন্যাসে পাপ দানা বেঁধে উঠেছে প্রথমে এবং ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের মতো অপরাধীকে চরম দণ্ড দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অন্তরালে চোখের জল ফেলেছেন। নারীর দিকে তাঁকে তাকাতে হয়েছে বাইরের দিক থেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই প্রথম নারীর আন্তর্লৌকিক জগৎ থেকে বাইরের সমাজের দিকে তাকিয়েছেন। একই অবৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে যেখানে রোহিণী-কুন্দনন্দিনী নিষ্ঠুর সমাজ শাসনের শিকার, অন্যদিকে চারুলতা, অনিলা, কল্যাণী অবিচারের প্রতিবাদে সক্রিয়। নারীর হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্থলে প্রবেশ করে, মনস্তত্ত্বের অলিগলি ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন সেখানে আগুন আছে। যে যুগে সুদূর নরওয়েতে 'ডলস্ হাউস' লেখা হয়, সে-যুগে প্রায় সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে 'নষ্টনীড়ে'র আবির্ভাব সামাজিক তাৎপর্য নিয়েই উল্লেখযোগ্য। ঘটনা-সাম্য বা চরিত্র-সাম্য না থাকলেও, নারীর অধিকারগত প্রশ্নে চারু বা অনিলার অকথিত ভাষাই যেন নোরার মুখে শুনতে পাই। দেবর ও ভ্রাতৃবধূর প্রেম—সমাজের চোখে নীতিবিরুদ্ধ ঠেকলেও চারুলতার হৃদয়ার্তিকে রবীন্দ্রনাথের আগে এমন করে কে আর অনুভব করেছেন। সতীদাহ প্রথার নৃশংসতা রোধ এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনা যে বাংলাদেশের রক্ষণশীলতার দুর্গম দুর্গে কোনো আঁচড়ই কাটতে পারেনি এবং অসংখ্য 'লেডি অব স্যালট' যে সেখানে যন্ত্রণায় অস্থির এ-উপলব্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নায়িকাদের যৌবনে স্পর্ধা দিয়েছেন। 'প্রতিবেশিনী'তে নবীন ও নায়কের প্রেম নায়িকার বৈধব্যকে স্বীকার করতে অসম্মত, 'ত্যাগ' গল্পে শেষ পর্যন্ত কুলমর্যাদার চেয়ে বড়ো হলো দাম্পত্য-সুখ, 'মাল্যদানে' কুড়ানির ভালবাসাও ধিক্কৃত নয়, 'পয়লা নম্বরে' অনিলা দুটি পুরুষকে সচকিত করল নারীত্বের মহিমায়, 'অপরিচিতায়' নারীত্বের অবমাননায় কল্যাণী বিদ্রোহিণী। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেহ নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা।' বিধাতা হয়তো দেননি কিন্তু সে-যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের নায়িকাদের অবশ্যই দিয়েছিলেন।

তিন

বারো বছর বয়সে তৈরি-করা হাতের আংটিটা বাইশ বছরের যুবকের আঙুলে বাতিল হয়ে যায়। তখন সেটা ভাঙতে হয়, নতুন করে গড়তে হয়। কিন্তু চুনি-পান্না জাতীয় কোনো মূল্যবান পাথর থাকলে তাকে ফেলে দেওয়া যায় না। অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্যেও বাহাত্তর কি বিরাশিতেও সেটা টেঁকে। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে-নিয়ম অচল নয়। পারিপার্শ্বিকতার চাপে মানুষ বদলায়, পরিবর্তিত সমাজ এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাবে সাহিত্যও একই খাতে বইতে পারে না। নতুন চিন্তা, নতুন বক্তব্য আসে। তখনই নতুন কথাকে প্রকাশ করার তাগিদে নতুন আঙ্গিক, নতুন রচনারীতি, গঠনশৈলীর উদ্ভব ঘটে। আমাদের দিনের কোনো কথাশিল্পীর কাছে যদি আজও বঙ্কিমচন্দ্র অপঠিত থাকেন তবে সেটা এ-কালের লেখকের একটি নৈতিক অপরাধ। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃতি এ-কালের লেখকের কাছে বৃহৎ এবং মহৎ কিছু সৃষ্টির সহায়ক হবে না। তবু বঙ্কিমচন্দ্রকে নাকচ করা চিরকালের

বাংলাসাহিত্যেই দুঃসাহসিকতা। 'গল্পগুচ্ছে'র ক্ষেত্রেও এটা সহজ সত্য। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট-গল্প হিসেবে তার জ্যেষ্ঠের মর্যাদা। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রভাব ছিল বলেই সেখান থেকে মুক্ত হবার একাধিক প্রয়াস দেখা গেছে বিশ শতকের বিভিন্ন-দশকে। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও কি সেটা স্বীকার্য? বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছোটগল্প যে বারবার প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে সেটা 'গল্পগুচ্ছে'র প্রভাব থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস নয়। বাংলা ছোটগল্পের অসংখ্য পথবদলের মধ্যে 'গল্পগুচ্ছে'র গুরুত্ব কমেনি। অবশ্য তার সবগুলিই যে সমানভাবে এ-কালের পাঠকদের তৃপ্তি দেয়,—তা হয় তো নয়, তবু সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আমাদের কাছে পুরাতন হলেও, অতিপুরাতন কিছু নয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে আরও অনেক গল্প লেখক ছিলেন। আখ্যান, বিষয়বস্তু গৌরব, চরিত্রচিত্রণ কোনোদিক দিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, সুরেন্দ্র মজুমদার এবং অন্যান্যরা যে অপাংক্তেয় এ-কথা বলা যায় না। তবু রবীন্দ্রনাথ আর ত্রিশের যুগের লেখকদের মধ্যে যে ব্যবধান, সেটুকু ভরে রাখলেন শুধু প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু এবং জগদীশ গুপ্ত। সব ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও জলধর সেন প্রমুখরা যে আমাদের কাছে ব্যাপকভাবে স্মরণীয় থাকতে পারলেন না তার কারণ, এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের মতো বড়ো আর্টিস্ট ছিলেন না। 'বায়ু বহে পূরবৈয়া' আর 'প্রাইভেট টিউটরে'র মতো গল্প এমন করে মুছে যাবার সামগ্রী নয় কিন্তু এজন্য দায়ী তাদের স্রষ্টারাই। 'গল্পগুচ্ছে'ও অনেক গল্প রয়েছে শুধুমাত্র রচনাগুণেই যারা নশ্বরতা পায়নি। ভাবলে অবাক হতে হয়, দেশান্তরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক ছোটগল্প সংকলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। লেখক নির্বাচনে যে বিচক্ষণতার পরিচয় আছে রচনা-নির্বাচনে কি ততখানি অজ্ঞতা প্রকাশিত নয়? বিদেশীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, দেশী সমালোচকদের মধ্যেই অনেকে এ-গল্পকে সেরা গল্প বলে মনে করেন। কিন্তু 'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার', 'মেঘ ও রৌদ্র' 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী'-র লেখকের প্রতি একি যোগ্য সম্মান? এতটা সাজানো, ঘটনা-বিন্যাসে এত পূর্বপরিকল্পনা একটি আকর্ষণীয় 'গল্প' তৈরি করতে পারে, মহৎ কিছু হতে বাধা দেয়। অপুত্রকরা আকস্মিকভাবে সন্তান লাভ হয়তো করে কিন্তু গল্পকে ভরাডুবি থেকে বাঁচানোর জন্য যদি তা ঘটে তবে একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি। জমাট কাহিনীবদ্ধ ছোটগল্প তো 'গল্পগুচ্ছে' আরও অনেক আছে—যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নষ্টনীড়', 'হালদার গোষ্ঠী' ইত্যাদি। কিন্তু 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কর্মফল', 'মহামায়া', 'ডিটেকটিভ', গল্পের ঘটনার আকস্মিকতার মতো কোনো কিছু তো সে-সব গল্পের কাঠামোকে দুর্বল করে না। এমন কথাও বলব না যে, মণিহারা গল্পের নৌকাডুবি গল্পের মানরক্ষার জন্যই ঘটেছে। আরও কিছু দুর্বলতা নির্দেশ করতে 'গুপ্তধন', 'সম্পত্তি সমর্পণ', ধরনের গল্প-গুলির নাম করা যায় কিন্তু সে অভিযোগ অর্থহীন। এসব রচনায় রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নীতিবাদী। পাঠ্যপুস্তকে তাদের গুরুত্ব যত বড়োই হোক, 'গল্পগুচ্ছে' এদের ভূমিকা খুব ব্যাপক নয়। তা ছাড়া এগুলো উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুলিখিত—এ-কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই।

শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'রস' প্রবন্ধটি শুরু করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পটির উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি গল্পটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আসলে গল্পটি কি তাই? আটাশ বছরের অনিন্দ্যসুন্দরী এবং পূর্ণযুবতী তাঁর বিকট-বীভৎস কঙ্কাল মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভাবছে—রূপের যৌবনের শূন্যতা। এটাই এ-গল্পের প্রতিপাদ্য। কিন্তু আসল গল্পটি পড়লে দেখা যাবে যে, স্মৃতিমন্থনের উপকাহিনীতে গল্পের শোচনীয় কেন্দ্রচ্যুতি। একটি মিষ্টি প্রেমের আখ্যান প্রাধান্য পেয়ে গল্পের প্রতিপাদ্যকেই বানচাল করেছে।

'গল্পগুচ্ছে'র আরও কিছু গল্প সম্বন্ধে এ-ধরনের প্রশ্ন জাগে। অবশ্য যে গল্পগুলি এ-সংকলনের ঐশ্বর্য তাদের গঠনগত দৃঢ়বদ্ধতা এবং ত্রুটিহীন রচনারীতি আমাদের মুগ্ধ করে। আর আলোচ্য গল্পগুলির ত্রুটিগুলিও এমন 'একটা আবরণে আচ্ছন্ন যার ফলে তা সহজভাবে ধরা পড়ে না। সূক্ষ্মবিচারের প্রয়োজন হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অনেক বড়ো 'আর্টিস্ট'। মহৎ গল্প তিনি লিখেছেন—সেটা স্বীকৃত সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি ত্রুটিহীন ছিলেন না। যে স্বাভাবিক সম্পদ তাঁর ছিল, তার প্রভাবে পাঠকের মনকে তিনি অন্যদিক থেকে তৃপ্ত রেখেছেন।

'গল্পগুচ্ছে'র প্রধানতম অঙ্গভূষণ তার ভাষার কারুশিল্প। এ-ভাষা কবির হাতের ভাষা। সাম্প্রতিককালে কিছু বিদগ্ধজনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বলতে কুণ্ঠা নেই যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের (বিশেষত প্রথম দিককার) ভাষা গীতিধর্মী। যে-সব গল্পে তিনি প্রকৃতির রূপমুগ্ধ সেখানে তার ভাষা 'গোরা' বা 'চোখের বালি'র মতো আটপৌরে নয়। বরং সমসাময়িক রচনা 'ছিন্নপত্রের' মতো লাস্যময়ী। যেমন—

'কিন্তু চন্দ্র বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টুমি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল ছল খল খল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।'

এবং

'মাথাটা জানালার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহ হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল ছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'।' (ছিন্নপত্র, পৃষ্ঠা ৬৮)

লক্ষণীয়, আপাতভাবে সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার পার্থক্য থাকলেও অন্বয়গত বাঁধুনিতে এবং মেজাজের সমতায় উদ্ধৃত দুটি দূরাত্মীয় নয়। এতে 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলির চরিত্রহানি ঘটেছে কিনা সে বিচারের প্রশ্ন আসে। প্রকৃতি-আশ্রিত গল্পগুলির ক্ষেত্রে এ-ভাষা হয়তো গল্পকে প্রাণশক্তি দিয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে যত বেশি মানুষের এবং রূঢ়তার নিকটবর্তী হয়েছেন ভাষার দিক থেকে ততখানি আবেকবর্জিত হতে পারেননি। 'পোস্টমাস্টার' আর 'পণরক্ষার' মধ্যে 'দেনা-পাওনা' আর 'হৈমন্তী'র মধ্যে ভাষা-চরিত্রের ব্যবধান আরও বিস্তর হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা যে আমাদের কাছে মাটি-মানুষের স্পর্শ এনে দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে ভাষার বাধাও তার অন্যতম কারণ। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের জন্য যে ভাষা প্রয়োজন, বুদ্ধদেব বসুর ভাষা সেখানে অচল। বিপরীত ক্ষেত্রেও কথাটা সমান সত্য।

জানি, এ-সিদ্ধান্ত প্রতিবাদের সম্মুখীন হবে। প্রশ্ন উঠবে, ছোটগল্প আর কবিতার সমগোত্রীয়তার কথা যে বলা হয় তার অর্থ কি? কিন্তু তাতে কবিতার ভাষায় গল্পকে রূপ দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন, কবিতার সুরকে প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভাষায় চিত্রিত করার উপদেশ দিয়ে টি, এস, এলিয়ট কবিতাকে গদ্য-ঘনিষ্ঠ হয়েও কবিতা হতেই বলেছেন। বক্তব্য এবং বস্তুঘনতার জন্যই আজ কবিতা তার তথাকথিত কাব্যত্ব হারাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের ছোটগল্প যেখানে মানুষের 'সাবজেক্টিভ জগতে অন্বেষণ প্রয়াসী, সেখানেই সে কবিতার সহোদর। বিষয়বস্তুভেদে সে আদৌ তা নয়—রীতিমতো কাষ্ঠগদ্য। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বাস্তববাদী হতে চেয়েছেন সেখানেই তাঁর গদ্যের চরিত্রবদলের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া হাল-আমলের গল্পের

সমস্যা গল্পগুচ্ছের সমস্যা নয়। যেহেতু কথাসাহিত্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য তাঁর দিনে আরও বেশি সুস্পষ্ট। অথচ এই গল্পই এতকাল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পাঠককে মুহূর্তের ক্লান্তিও দেয়নি: হয়তো কোনো গল্প একাধিকবার পড়ার প্রেরণাও জুগিয়েছে। জনৈক সমালোচক 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'নিশীথে' 'কঙ্কাল' গল্পগুলিকে গল্পগুচ্ছের শ্রেষ্ঠগল্প বলে অভিহিত করেছেন। এসব গল্পে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টির নিপুণতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার নক্ষত্র ছুঁয়েছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই তো দেখা যাবে যে, গল্পগুলি মূলত কয়েকটি সাধারণ রোমান্টিক গল্প। তবে কেন এরা এত মুগ্ধ করে? নিঃসন্দেহে ভাষা-ঐশ্বর্য, যে ভাষা অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তোলে। এটা যে ভাষাশিল্পীর প্রভূত ক্ষমতা সন্দেহ নেই এবং সেখানে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাতেও কেউ কুণ্ঠিত নই। যেখানেই তিনি স্বভাবজ খাঁটি রোমান্টিক সেখানেই তাঁর গৃহীত ভাষা দীপ্যমান, দ্যুতিতে ভাস্বর।

চার

প্রতি যুগের আধুনিকতাই তার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এ-কথা যেমন সত্য রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে, তেমন সত্য ত্রিশের যুগের ক্ষেত্রেও। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণতিতে যে ব্যাপক অবক্ষয় সে যুগের তরুণদের চেতনায় হতাশা আর বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিল তারই স্বরূপ ধরা পড়ে তাঁদের রচনায়, জীবনের তিক্ততা বিশ্লেষণে, দ্বিধাহীন নাস্তিকতা প্রচারে। এই জ্বালা-ধরা তারুণ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মার যোগ ছিল না। শুধুমাত্র বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোনো কোনো অংশে প্রেমেন্দ্র মিত্র আর বুদ্ধদেব বসু ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁর নৈকট্য যোজন-ব্যবধানে। 'পটলডাঙার পাঁচালি' বাংলা সাহিত্যের কোনো অনবদ্য সৃষ্টি না হলেও ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয়। এবং সমকালীন আরও অসংখ্য রচনা বাংলা কবিতা-সাহিত্যের যে পথনির্দেশ জানাল চল্লিশের লেখকরা তারই অনুসারী। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক সবদিক দিয়েই ঘটনাবহুল এই দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা এবং সামগ্রিক ভাঙনের মুখে সামাজিক অস্তিত্ব। এত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চল্লিশের লেখকরা দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন। তাঁদের রচনার মহত্ত্ব বিচার না হয় পরে করা যাবে, আপাতত বলা যায়, যুগ চেতনার প্রতি তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেননি কোনোদিন।

এবং ইতিহাসের নিয়মেই পঞ্চাশের লেখকরা তাঁদের উত্তরাধিকার পেয়েছেন ত্রিশ আর চল্লিশের কাছে। এ-কালের অতি তরুণ ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের রচনা পড়লে মনে হতে পারে—এ-লেখক বোধহয় গল্পগুচ্ছের সঙ্গে কোনোদিনই পরিচিত নন। এ ধারণা সত্য হলে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কিন্তু গল্পগুচ্ছের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সত্ত্বেও যখন এ-কালের কোনো লেখক পাঠকের মন থেকে এ-ধারণা মুছে ফেলতে ব্যর্থ হন তখনও কি তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে? কাঠগড়ার প্রশ্ন নয়। বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার।

গোগোল-অ্যালেন পোর মতো বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জন্মদাতৃ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সম্মান। তাঁদের মতো রবীন্দ্রনাথও প্রথম এমন মানুষ এবং জীবন আবিষ্কার করলেন যে মানুষ একান্ত নিভৃতে নিজের আঘাতে নিজেই পীড়িত, বাইরের সমাজনীতির চাপে এবং ভিতরের অসংখ্য অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত (Exploration of man)। সেই নতুন মানুষই হল তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। প্রাথমিক সূচনাতেই তিনি এমন

কিছু করলেন যাকে বলতে পারি—'বিদ্রোহ', এমন কিছু ছোটগল্প লিখলেন বহুকথিত হলেও যার সম্বন্ধে আবার বলা যায়—'বিশ্বসাহিত্যে মহার্ঘ'। ছোটগল্পের ভিত্তি পাকা হবার পরও ত্রিশের লেখকরা যে আরও একবার সাহিত্যের আবহাওয়া আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন তারও অন্যতম কারণ—'নতুন মানুষ আবিষ্কার'। সে মানুষ কারখানার ক্লান্ত মজুর, সাঁওতাল-এলাকার অজ্ঞাত আদিবাসী, গ্রামের পীড়িত চাষী, নোংরা বস্তির নরনারী, আপিসের আশাহত কেরানী।

মানুষ এবং জীবন সম্বন্ধে 'সবকিছু জানা হয়ে গেছে'—এ-জাতীয় অসতর্ক উক্তি যেমন পঞ্চাশের লেখকদের স্পর্ধা, অন্যদিক থেকে এ-কথাও একান্ত সত্য যে, অপরিচিত মানুষ আর তাঁদের কাছে নেই। মানুষ হিসেবে কোনো অস্তিত্বকে তাঁরা আর আবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত নন, তাঁদের অন্বেষণ পরিচিত মানুষের মধ্যেই। অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞাতকে আবিষ্কার আর আলোর নিচে ধরা-ছোঁয়া বস্তুর মধ্যেই স্বরূপ বা সত্যের অনুসন্ধান—দুই এক নয়। প্রথমটি 'অবজেকটিভ', দ্বিতীয়টি পুরোপুরি 'সাবজেকটিভ'।

আঙ্গিকের দিক থেকে পঞ্চাশের লেখক তাই একান্তভাবেই স্বতন্ত্র। 'তথাকথিত' আখ্যানবস্তুকে তাঁরা যে পরিহার করেন এর অর্থ এই নয় যে, কাহিনীসৃষ্টিতে তাঁরা অক্ষম। বরং এটাই সত্য যে, কাহিনীটা তাঁদের কাছে খুব বড়ো কথা নয়। ধরা যাক, একটি মানুষ ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদছে। ক্ষুধার কারণটা সামাজিক, কিন্তু অনুভূতিটা একান্তভাবে ব্যক্তির একার। এই কান্নাই যদি আধুনিক কোনো গল্পের বিষয়-সামগ্রী হয় তবে সে মানুষ একান্ত নিভৃতে শুধু ছটি বরগা আর একটি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তার আত্মচিন্তার মধ্যেই গল্পের শেষ করতে পারে। মানুষটি নয়, ভিতরের মানুষটি (Inner man) আধুনিক গল্পের অবলম্বন। বাইরের চোখের-জলকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া নয়, গভীরতম সত্যই (Fundamontal Truth) আজকের ছোটগল্পের অন্বিষ্ট।

এ গেল তত্ত্বের কথা। কোনোরকম ঘটনা দিয়ে গল্প বলতে আমাদের অতি তরুণ লেখকরা নারাজ। কিন্তু তত্ত্ব হিসেবে তার সার্থকতা বিচার তত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্রে। পঞ্চাশের লেখকরা যে সেদিক থেকে খুব সফলতা অর্জন করেছেন—এ-রকম ঘোষণা জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধকে আরও বেশি বিতর্কের মধ্যে টেনে না নেওয়াই ভালো। তবে এ-কথা ঠিক, চেষ্টা চলছে। বহু ব্যর্থতার পর বাংলা ছোটগল্প হয়তো পঞ্চাশের ধ্যান-ধারণার উপরই স্থির-প্রতিষ্ঠ হবে। সেদিন হয়তো 'গল্পগুচ্ছে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্টত প্রতিভাত হবে না। তবু পাঠক থাকবে। যেমন এখনও আছে। আধুনিক ছোটগল্প (ত্রিশের যুগ থেকে) নানাভাবে নানা পথে বাঁক ঘোরার পরও 'গল্পগুচ্ছ' তার পাঠক হারায়নি। এই পাঠক আমাদের লেখকরা ক-জন পেয়েছেন ?

মার্কসবাদী রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাস ॥ সুবীর রায়চৌধুরী

প্রাক্-পরিচয় পর্ব

মার্কসবাদী রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাস শুরু করবার আগে বিপিনচন্দ্র পাল এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করতে হয়। নানা কারণে এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। পরবর্তীকালীন একাধিক মার্কসবাদীর লেখায় তাঁদের মতামতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। রাধাকমলের প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হবার পর যাঁরা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ। রাধাকমলের "লোকশিক্ষক বা জননায়ক (১৩২১)" প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রে' লেখেন "কাব্যের বাস্তবতা"। রাধাকমল 'সাহিত্যে বাস্তবতা'য় তার প্রত্যুত্তর দেন। প্রমথ চৌধুরীর বহুপঠিত "বস্তুতান্ত্রিকতা বস্তু কি?" এই প্রবন্ধ-প্রসঙ্গেই রচিত। রাধাকমল তারও উত্তর দেন "সাহিত্য ও স্বদেশ" প্রবন্ধটিতে। বিপিনচন্দ্র ও রাধাকমলের বক্তব্যের বিশদ আলোচনার পূর্বে মনে রাখা দরকার তৎকালীন রবীন্দ্র-বিরোধিতার সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাঁরা রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে দুর্নীতি বা অস্পষ্টতার অভিযোগ করেননি, সনাতন হিন্দুয়ানিকে আক্রমণ করেছেন, তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য অপাঠ্য, এমন কথাও বলেননি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী হয়েও তাঁরা কবি-প্রতিভার কয়েকটি অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেই সে-কথা ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক পাঠকের কাছে রাধাকমলের অভিযোগ যতোটা তীব্র, যুক্তি ততোটা তীক্ষ্ণ মনে হবে না। মূল সমস্যার উদ্‌যাপনে বিপিনচন্দ্রের চিন্তাধারাও যান্ত্রিক ও সংকীর্ণ ভাবা অসঙ্গত নয়। তবু এ-কথা মানতেই হবে যে, রবীন্দ্র-সমালোচনায় তাঁরা একটি বিশেষ বিচার-পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সে-যুগের রবীন্দ্র-বিরোধিতায় বিরল।

বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের মোটামুটি বক্তব্য হলো এই: "যে ঐকান্তিকী অন্তর্মুখিনতা ও রসানুভূতি" রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, তা তাঁর দুর্বলতারও অন্যতম কারণ। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ খুব সীমাবদ্ধ বলে, তিনি "আশৈশব এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিয়াছেন।" বিপিনচন্দ্র এই "subjective individualism"-এর উৎস খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। তাঁর মতে, "এ-বস্তু তাঁর পৈত্রিক ও সাম্প্রদায়িক"। রবীন্দ্রনাথ ধনীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার ওপর পিরালী বলে সমাজচ্যুত হওয়ায় তাঁদের পরিবেশ আরো সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। "তাঁহার আপনার পরিবারের দু-চারটি মানুষের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। এই গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরে রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন।" কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্য আমাদের আকর্ষণ করে, কেননা রবীন্দ্র-প্রতিভা "মায়িক"। "উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে বস্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্যে যেমন, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও তেমন অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার

অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দু-চারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।"

রাধাকমল "লোকশিক্ষক বা জননায়ক" প্রবন্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে (সে-যুগের) আধুনিক সাহিত্য লোকশিক্ষার দায়িত্ব নেয়নি এবং গণমানসের সঙ্গেও তার যোগ সুদূর। এর কারণ-স্বরূপ তিনি বলেন, "মধ্যবিত্ত সমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। তাই সাহিত্য সমাজের মর্মস্থলের ভিতর নিবিড় আনন্দ-সঞ্চার করিতে পারে নাই, সাহিত্যের বাণী সমাজের মর্মস্থলকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। * * * যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঙালীর যুগ-যুগান্তরের সাধনা নিহিত, যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভবিষ্যৎ বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সূচিত হইয়াছে, সে সাহিত্য কি বাঙালীর অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের এতো নিকটতম হইলেও এতো দূরে কেন?

"ইহা রবীন্দ্রনাথের দোষ নহে, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্য। আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ খুব বেশি হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ প্রকৃত জাতি তো কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত উকিল, ব্যারিস্টার, মাস্টার, কেরানী, সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটিরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতি, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।"

এরপর রাধাকমল "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির "ওরে তুই ওঠ আজি" অংশ থেকে "তবে ধন্য মোর গান শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ" পর্যন্ত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে "বিশ্বাসের ছবি" আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের সাহিত্যের।"

এর উত্তরে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি "সাহিত্যের পথে" গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-রাধাকমল-প্রমথ চৌধুরীর বাস্তবতা-বিতর্কের বিশদ আলোচনা আপাতত নিরর্থক। রাধাকমলের মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বিপিনচন্দ্রের 'চরিতচিত্র—রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে এবং রাধাকমল প্রমুখের প্রবন্ধ রচনার কাল ১৩২১ সাল। তার সতেরো বছর পরে ১৩৩৮ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় "পরিচয়" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-সমালোচনার সূত্রপাত হয় এই পত্রিকায়। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এবং নিয়মিত লেখকের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মার্কসবাদী, যেমন নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণ-কুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুধা চক্রবর্তী। কিন্তু ১৩২১-১৩৩৮ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিপিনচন্দ্র-রাধাকমলের মতের অনুবর্তন বা মার্কসবাদী বিচার-পদ্ধতির প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। এর কারণ সম্ভবত দুটো হতে পারে। এক, "কল্লোল (১৩৩০)" প্রভৃতি পত্রিকার আত্মপ্রকাশের পর ও "শনিবারের চিঠি"র "ঐতিহাসিক আবির্ভাবের" ফলে বাঙলা সাহিত্য শ্লীলতা-অশ্লীলতার দ্বন্দ্বে এমন মুখর হয়ে উঠলো যে সাময়িকভাবে অন্য আলোচনার প্রসঙ্গই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর নয়তো রবীন্দ্র

সমালোচনা সাহিত্যে এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় "রবীন্দ্র যুগ অতিক্রান্ত" "রবীন্দ্র-সাহিত্য আধুনিক নয়" ইত্যাদি "আন্দোলনে"র মধ্যে ঐসব প্রশ্ন একেবারে গৌণ হয়ে গেছে।

"প্রগতিশীল" সমালোচকেরা যখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়নে উৎসাহী হলেন তখন তাঁদের সামনে নানা সমস্যা দেখা দিলো। প্রথমত, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে মার্কসবাদের যে-রকম সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সাহিত্য-শিল্পে প্রায় কিছুই নেই। তাহলে সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রয়োগ কিভাবে হবে? যে শিল্প সাহিত্য রাজনৈতিক আন্দোলন বা ভাবী সমাজগঠনের অনুকূল সেগুলিই শুধু গ্রহণীয়? আর আন্দোলনের সহায়ক হলেও তার সাহিত্য-শিল্প মূল্য যদি গৌণ হয় তবে? রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা 'ইত্যাদির' ইঙ্গিত না থাকলেও তাঁর মতো বিরাট প্রতিভাকে কি অস্বীকার করা সম্ভব? লেনিন টলস্টয় প্রসঙ্গে আলোচনায় টলস্টয়ের মধ্যে যেরকম প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয়বিধ ভাবেরই সমাবেশ দেখেছেন, আমাদের দেশের সমালোচকগণের অধিকাংশই সে-রকম কোনো সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পাননি। ফলে কারো আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিকই প্রধান। তিনি ধনীর দুলাল, জমিদার-নন্দন, সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে বাস করতেন, তাই তাঁর কাব্যে সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ নেই, তাঁর রচনায় সমাজবাদ-সাম্যবাদের আভাস নেই, সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিহার্য। অন্যদিকে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাট প্রভাবকে অস্বীকার করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তারা অত্যুৎসাহে বিভিন্ন গল্প কবিতা উপন্যাসের মধ্যে প্রগতির উপাদান খুঁজেছেন। এরকম প্রচেষ্টা মাঝে-মাঝে কিরকম হাস্যকর হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "অমল ধবল পালে"র মার্কসবাদী ব্যাখ্যা—"তরুণী হলো ship of state—'অমল ধবল পাল' হলো গিয়ে আমাদের political consciousness, feudal যুগেরই পাল তোলা জাহাজ; তারই 'মন্দ মধুর হাওয়া', কিনা moderate, liberal movement এই দাঁড়ালো; 'দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু'—খুব খাঁটি কথা—কে বুঝবে বলুন যে কার্ল মার্কস না পড়েছে?" এই প্রসঙ্গে উক্ত লেখকের "সাহিত্যে প্রগতি" গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

মার্কসবাদী সমালোচনার নামে যেমন অনেক হাস্যকর এবং অপরিণত উক্তি করা হয়েছে, তেমনি মার্কস-বিরোধী আলোচনাতেও অনেক বালভাষণ লক্ষ্য করা যায়। "রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ জীবন নেই"—এই অভিযোগের উত্তরে অনেকে তালিকা তৈরি করেছেন '"কেরানী" কথাটা রবীন্দ্রনাথ কতোবার ব্যবহার করেছিলেন। আবার রবীন্দ্র-সাহিত্যকে যাঁরা প্রগতিবাদী বলেছেন, তাঁদেরকেও তীব্র অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে বক্তব্য ছিলো, রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবাদী দাবি করা একধরনের সুবিধাবাদ। ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন: "মার্কসবাদী"রা "চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল," "আমার সুরের অপূর্ণতা," "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন" প্রভৃতি কয়েকটি উক্তিকে প্রামাণ্য ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাদের বিশেষার্থে "প্রগতির" সন্ধান করিয়া বেড়ান। * * * জীবনের সমস্ত বৈষয়িক প্রয়োজনকে ক্ষুদ্র জানাইয়া রবীন্দ্রসাধনা মানুষের অন্তরতম সৃজনীপ্রেরণাকে যতোখানি গরীয়ান করিয়া প্রচার করিয়াছে, আধুনিক বিশ্বচিন্তার ক্ষেত্রে তাহার সমতুল্যতা আছে কিনা জানি না। কিন্তু থাকুক আর নাই থাকুক, জিজ্ঞাস্য এই যে মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা যদি নিতান্ত ফ্যাসিবাদ না হইল, তবে Spengler ফ্যাসিবাদী হইলেন কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের উপর আমরা নিজের মন্তব্য প্রয়োগ করিতেছি না, মার্কসবাদীদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে একটা বোঝাপড়া করিবার

চেষ্টা দেখিতে পাই তাহারই প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছি। সব চাইতে বড়ো কথা, সাম্প্রতিক জগতে চিন্তা-মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো উগ্র ব্যক্তিবাদী আর কেউ আছেন নাকি বলা শক্ত; * * * অথচ বাঙলা সাহিত্যের হালে আমদানী মার্কসবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথও পাইলেন "প্রগতি"র সম্মতি-টিকা। Dialectics-এর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতায় ধৈর্যরক্ষা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাই অতো কথা লিখিলাম (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০)।" এ-বাদানুবাদ প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তখন দেখতে পাবো উক্ত লেখক কর্তৃক হুমায়ুন কবীরও "মার্কসবাদী" প্রমাণিত হয়েছেন।

পরিচয় (প্রথম) পর্ব

'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ নানা কারণে দুঃসাহসিক। সে-যুগে প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা না নিয়ে আত্মপ্রকাশ করা প্রায় বৈপ্লবিক ঘটনা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছিলেন জগদীশ গুপ্তের "লঘু গুরু"। সে যাই হোক, "পরিচয়ে" মার্কসবাদী বিতর্ক শুরু হয় অনেক পরে। ১৩৪৮ সালের রবীন্দ্র-সংখ্যায় বসুধা চক্রবর্তীর "মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ এবং বিনয় ঘোষের "নতুন সাহিত্য সমালোচনা (১৯৪০)" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনার প্রতিবাদে অমল হোম "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" লেখেন। 'পরিচয়ে'র পরবর্তী রবীন্দ্র-সংখ্যায় অমিত সেনের "রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো। লেনিনের টলস্টয় সম্পর্কিত আলোচনার মতো অমিত সেনের এই প্রবন্ধটিও মার্কসীয় রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চায় বিশেষ মূল্যবান। এর আগে (এবং বোধহয় পরেও) এরকম সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কসীয় বিচারপদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ চোখে পড়ে না। অমিত সেন ছাড়া প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্র-বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পুলকেশ দে-সরকার প্রমুখগণ। প্রায় একই সময়ে 'চতুরঙ্গে' অচ্যুত গোস্বামী বাঙলা উপন্যাস-বিষয়ক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন। আমি শুনেছি যে এই প্রবন্ধ পাঠ করেই রবীন্দ্রনাথ নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা পরে "সাহিত্য বিচার" নামে "সাহিত্যের স্বরূপ" গ্রন্থের অন্তর্ভূ‍ক্ত হয়েছে।

বসুধা চক্রবর্তীর বক্তব্য হলো এই: "মার্কসবাদী দেখতে চায় কবি-সাহিত্যিকের মানসলোকের উৎপত্তি হয়েছে সমাজনীতি সম্বন্ধে কোন্ পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ঐশী ইচ্ছার বন্ধন থেকে কি মানুষকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছেন, সকল মানুষের অন্তর্মূল্য সমান বলে কি তিনি স্বীকার করেন—সাম্যবাদী সমাজে কি তিনি বিশ্বাসী?

"পূর্বেই বলেছি, মন তাঁর গতিধর্মী: কিন্তু সে কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানায় এসে ঠেকলো? তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব যার দ্বারা মানুষ অশান্তি জর্জরিত হলো—তাকে কি তিনি কেবল ধর্মের প্রলেপ দিয়ে মুছে ফেলতে চান? ধর্মের সংহতিকারী শক্তি কি আর আছে, রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে আর কোনো আমূল পরিবর্তন কি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় নয়? দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে মানুষের স্বীকৃতি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ জগৎ সৃষ্টি করেছে। দেখলুম শুধু উদার অনুকম্পা। যে মানুষ আজ বুঝেছে যে এ জগৎ তারই আপন হাতের সৃষ্টি, সে নেবে অধিকার—অনুকম্পাকে সে-অপমান জ্ঞান করে। রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী; কিন্তু সমাজতন্ত্র থেকে বুর্জোয়াতন্ত্রের গতিমুখে ধনশক্তি প্রতিভূদের নায়কতায় রাষ্ট্র ও সমাজবিধানেই কি ইতিহাসের পথে তাঁর দৃষ্টি থেমে গেলো?" কিন্তু তাহলেও বসুধা

চক্রবর্তী মনে করেন, "দেশের জীবন যে গণশক্তিতে কেন্দ্রায়িত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি তার স্বীকৃতি আমরা গাই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানে রবীন্দ্রনাথের বহুবার প্রচারিত বিশ্বাসে। সে নয় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, নয় মানুষের বৈপ্লবিক পথ কেটে চলার মনোভাব। তবু তো পাই এতে পথের ইঙ্গিত, যে পথের কোনো সীমানির্দেশ রবীন্দ্রনাথ করেননি, কোনো সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করেন না, গণজাগরণের বিরোধিতা কখনো তাঁর দ্বারা হতে দেখা যায়নি, প্রতিক্রিয়াশীল তিনি নন।" * * *

বিনয় ঘোষের প্রধানত আলোচ্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক মতামত। তাঁর ভাষায় বলা যেতে পারে, "সর্বসাধারণ নামক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তির" মনোরঞ্জনের জন্যে যে কাব্য বা সঙ্গীত কবির অন্তর থেকে স্বতঃই উৎসারিত হতো, তাকে প্রকৃত কাব্য বা সাহিত্যের 'রাজসভা' থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং 'নিম্নসাহিত্য' বলে তাকে সার্বভৌমিকের সম্মান দিতে সম্মত হননি। * * * রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশোপনিষদের জয় হয়েছে, মানুষের বা মরজগতের জয় হয়নি বলেই তাঁর "এবার ফিরাও মোরে" আহ্বান দিগ্‌ভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরানি বলে মনে হয়, তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" পড়বার পর রুশ-ফিনিশ যুদ্ধে সোভিয়েটের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ এবং পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠ শান্তিবাদী" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের কাছে শান্তির জন্য আবেদন পড়ে মনে হয় বিচিত্র।"

উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রতিবাদে অমল হোম "কেরানী রবীন্দ্রনাথে" বলেন: "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" মানে এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কেরানীরূপে কোনোদিন কলকাতায় কোনো সওদাগরী হৌসে চাকরি করেছেন। তা যে তিনি করেননি সে তো আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু এটাও জেনে রাখা ভালো যে, ধরুন যদি তিনি এই কর্পোরেশনেই কাজ করতেন, তবে সে-কাজ তিনি ভালো করে, নিখুঁত করেই করতেন, আমাদের রামময়-সাহেবের মতো কুড়ি টাকায় চাকরিতে ঢুকে, হাজার টাকা মাইনের সেক্রেটারিগিরি তিনি অনায়াসেই করে যেতে পারতেন;—চাই কি হয়তো আমাদের বড়ো সাহেবের চেয়ারেও বসতেন।" এই কথা বলার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ" এবং কাব্য থেকে সাধারণ জীবনের কথা কোথায় আছে তার তালিকা দিয়েছেন। "প্রেমের অভিষেকে কেরানী" শীর্ষক সংযোজনীতে তিনি 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী পরিচয় রবীন্দ্র-সংখ্যায় অমিত সেনের (সুশোভন সরকার) "রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি" প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি "নতুন সাহিত্যে"র বর্তমান সংখ্যায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হওয়ায় উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধটিতে গোঁড়া মার্কসবাদী এবং মার্কসবিরোধী উভয়েরই সমালোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা প্রগতিবাদী বলে দাবি করতেন তাঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল 'এবার ফিরাও মোরে', 'ওরা কাজ করে' ইত্যাদি কবিতা। অমিত সেন কবিতাগুলির আলোচনা করে দেখিয়েছেন তাঁদের অভিনব ব্যাখ্যা কবির অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া "এই জাতীয় সমস্ত লেখা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ত্ব খর্ব নয় না, এমন কি এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনার মধ্যে গণ্য নাও হতে পারে।" কয়েক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করেও তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করলে আজকের দিনের বাঙলা সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না, তার প্রাণ পর্যন্ত বাদ পড়ে। * * * অনেকের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের সংস্কৃতি পুরাতনকে একেবারে বাদ দিয়ে গড়ে উঠবে। এ বিশ্বাস ডায়েলেকটিকাল রূপের সঙ্গে খাপ খায় না।" কয়েকটি মতের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়ো এই কথা বলে তিনি ইংরেজ কবির প্রতিধ্বনি

করেছেন, "Others abide our question thou art free."

'পরিচয়ে'র মার্কসবিরোধী লেখকদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের একটি উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের "বাঙলার কাব্য" গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে (পরিচয়, মাঘ, ১৩৪৯) তিনি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেন যার ফলে কবীরও "মার্কসবাদী" প্রমাণিত হয়েছেন: "গত মহাযুদ্ধের সময় থেকেই আভাস ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে এলো যে মধ্যবিত্ত সৃজনীযুগের অবসান আসন্ন," সমাজ বিবর্তনের ধারায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবসান অবশ্যম্ভাবী এবং "রবীন্দ্র প্রতিভার প্রাণশক্তির কৃতিত্ব এই যে সে পরিবর্তনে তাঁর কাব্যপ্রবাহ সাড়া দিয়েছে।" আরও বলা হইয়াছে যে জীবনের শেষ দশ-বারো বৎসর কবি যে দেশের গণমানসকে আবিষ্কার করার সাধনা করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা চলে না। আমরা কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাইতে চাই। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ-গঠনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে কিংবা অবদমিত মানব-সমাজের ধূমায়িত বিপ্লবকে আশা-নিরাশার যুগ্মভাবে আবিষ্ট হইয়া কল্পসৃষ্টিতে স্থান দিলেই কি গণমানসের কিংবা শ্রেণীদর্শনের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইল? এই জড়বাদী সমাজ-বিবর্তনের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সহিত রবীন্দ্রনাথের আজন্মের কাব্য ও জীবন-সাধনার বিরোধ এতো সুস্পষ্ট যে বামপন্থী সাহিত্যিকেরা শুদ্ধ নিজেদের সাহিত্যাদর্শকে সাধারণ পাঠকের বিচারে গুরুত্ব দান করিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে যতোটা সম্ভব তাঁহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করেন। কবীর সাহেবও দেখিতেছি সেই চেষ্টাই করিয়াছেন…"

'পরিচয়ে'র পরবর্তী সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৪৯) সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল উত্তরদান প্রসঙ্গে দেখান যে, বসুধা চক্রবর্তী, অমিত সেন প্রমুখ কোনো মার্কসবাদী লেখকই কদাচ দাবি করেননি যে রবীন্দ্রনাথ মার্কসপন্থী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, হুমায়ুন কবীর "বামপন্থী" (মার্কসীয় অর্থে) লেখক নন।"

"মার্কসবাদী" অন্বেষা ও পরিচয়-প্রতিক্রিয়া *

এতোদিন পর্যন্ত মার্কসবাদী রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রেক্ষিতটি ছিলো মোটামুটি সাহিত্যিক বা শিল্পগত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রগতিশীল দিক কি কি, ভাবীসমাজে তাঁর স্থান কোথায় এ-সব কথা আলোচিত হলেও তা সাহিত্যবিচারেই কেন্দ্রীভূত ছিলো বলা যেতে পারে। কিন্তু সাম্যবাদী আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপ্তিলাভ করায় আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যায়নে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী এগিয়ে এলেন। যে সাহিত্যে শোষিত মানুষের স্বীকৃতি নেই, ভাবীসমাজের ইঙ্গিত নেই তাকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বর্জনের পক্ষপাতী। সমগ্র উনিশ শতকের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ আলোচিত হলেন এবং বলা হলো সমাজবাদ বা সাম্যবাদে রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্থান নেই। তাঁদের বক্তব্য: রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—সমগ্র ১৯শ শতকের রিক্‌থই একান্তভাবে প্রতি-বিপ্লবী বুর্জোয়ার সৃষ্টি, সুতরাং বর্জনীয়। এটাই সে-যুগের সাম্যবাদীর একমাত্র মত এ-কথা বললে নেহাতই অনৃতভাষণ হবে। এর বিপক্ষের দলও প্রবল ছিলো। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করার পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্র গুপ্ত এবং প্রকাশ রায়, বীরেন পাল, ঊর্মিলা গুহ। "মার্কসবাদী" নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বীরেন পালের "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা," চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ রায়ের "বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা," পঞ্চম সংখ্যায় ঐ নামে রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধটি প্রকাশিত

* "মার্কসবাদী"তে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই প্রত্যাহৃত। সুতরাং প্রবন্ধাবলীতে ব্যক্ত মতামতগুলি সেই বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যক্তির মত হিসেবেই গ্রহণীয়।—লেখক

হলে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তাঁদের মতামতের প্রতিবাদে (সমর্থনেও দু-একজন ছিলেন) 'পরিচয়ে' বৎসরাধিক কাল ধরে আলোচনা চলে—এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শীতাংশু মৈত্র, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোলাম কুদ্দুস, নরহরি কবিরাজ, অনিমেষ রায়। আগেই বলা হয়েছে, উক্ত প্রবন্ধ-সমূহের মূল লক্ষ্য ছিলো মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগসমস্যা বিষয়ে আলোচনা, রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। আমাদের আপাতত আলোচ্য যেহেতু রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাস, আমরা উক্ত বিষয়ের বিভিন্ন মতামতেই সীমাবদ্ধ রাখবো। এবার রবীন্দ্র গুপ্তের মতামত তাঁর ভাষায় সূত্রাকারে উপস্থাপিত করা যাক :

(১) "প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত বিচার করা দরকার, কারণ তিনি রাজনীতি নিরপেক্ষ ছিলেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশ ছিলো (মার্কসবাদী ৫নং, পৃ-১৪৬)।"

(২) "উপনিষদের মায়াবাদ হলো রবীন্দ্র-দর্শনের সারমর্ম। এই দর্শনই শ্রেণীসংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। মজুর শ্রেণীকে শ্রেণীসংগ্রাম ভুলিয়ে দেবার মতো এতো বড়ো শক্তিশালী হাতিয়ার ধনিক শ্রেণীও আবিষ্কার করতে পারেনি (ঐ পৃঃ-১৪৮)।"

(৩) প্রমথ চৌধুরী লিখিত "রায়তের কথা"-র ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গরীব কৃষককে 'কুলাকে'র ভয় দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী প্রথা সমর্থন করেছেন। টলস্টয় অন্তত কৃষক-গণতন্ত্র বা ইউটোপিয়ান সোশালিজম-এর ভক্ত ছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সামাজিক গণতন্ত্রের বিরোধী (ঐ পৃ-১৫১)।"

(৪) "ফাশিজমের বিরুদ্ধে, নোগুচির পত্রের জবাবে, 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধে তিনি ফাশিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গণমানবের জয়ের প্রতি যে আস্থা ঘোষণা করেছেন তা নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর নিকট একটি সম্পদ, এ-সম্পদ শ্রমিকশ্রেণীর অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবলী প্রতিক্রিয়াশীল (ঐ পৃ-১৫৮)।"

(৫) সুতরাং "সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গেছেন, শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের শক্তি, প্রগতি-শিবিরকে এগোতে হবে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে অস্বীকার করেই, তাঁর শেষ জীবনের নজিরটা শুধু তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে এবং মূলত প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করলে সেটা হবে নিছক সুবিধাবাদ (ঐ, পৃ-১৫৭)।" সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা শেষ পর্যন্ত মার্কস-বিরোধী ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ এবং উগ্র মার্কসবাদী রবীন্দ্র গুপ্ত এক জায়গায় এসে মিলিত হলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিশীল বললে সেটা হবে নিছক সুবিধাবাদ।'

রবীন্দ্র গুপ্তের এই প্রবন্ধ স্বভাবতই দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রায় বছরখানেক ধরে এ-নিয়ে বাদানুবাদ চলে। এ-বিষয়ে 'নতুন সাহিত্যে'র ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় অনিমেষ রায়ের 'মার্কসবাদ ও বাঙলা সাহিত্য' প্রবন্ধটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা প্রথমে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের মতামত আলোচনা করি। তিনি গোড়াতেই বলেছেন, "রবীন্দ্র গুপ্ত এই একটি প্রবন্ধে, সাহিত্য ও সমাজ-বিপ্লব সম্বন্ধে এতগুলি আলোচনাসাপেক্ষ উক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, একটি প্রবন্ধে তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নহে।" যাই হোক, আমরা শুধু তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরে আসি।

রবীন্দ্র গুপ্তের মতে, বাঙলা সাহিত্যের "শ্রেণীবিচারের একমাত্র নিরিখ হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ বা তাহার অত্যাচারের উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল কিনা। বলা বাহুল্য, এ-বিচার সাহিত্যিক

নহে, রাজনৈতিক। সেই সঙ্গে ইহাও জোর করিয়া বলা দরকার, এই খণ্ডিত মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের গুণবিচার একদেশদর্শী না হইয়া পারে না (পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫৬)।" দ্বিতীয়ত, "রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাতে কি লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারের এই মূল সূত্রগুলি মানা হইয়াছে? ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙলা দেশের সাহিত্য, এমন কি ভারতচন্দ্র ও আলাওল পর্যন্ত, ও ইংরেজি আমলের সাহিত্য রামমোহনে যার শুরু ইহাদের গুণগত পার্থক্য কি তাহাতে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে? বাঙলা সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে সাহিত্য হিসাবে ইংরেজি আমলের সাহিত্যের তুলনায় তাহার পূর্বের যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ একান্ত নিষ্প্রভ। * * * প্রশ্ন এই যে ইংরেজি আমলের বাঙলা সাহিত্যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নই কি বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন? এই অসুবিধাজনক প্রশ্ন রবীন্দ্র গুপ্তের মনে জাগিয়াছিল। তাই প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্য তিনি মধুসূদনকেও এই দলে টানিয়াছেন তাঁহার "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই প্রহসনের জোরে, যাহাতে "মেঘনাদ বধ"কেও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের তালিকা-ভুক্ত হইতে না হয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্নের অবসান হয় না।...তাহা হইলে কি বাঙালী পাঠককে শিখিতে হইবে যে, "বুড়ো শালিক" "মেঘনাদ বধ" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি, মাইকেলের অমরত্বের জন্য কেবল "বুড়ো শালিক" লিখিলেই চলিত, "মেঘনাদ বধ" লেখার প্রয়োজন ছিল না।* * * রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারেও রবীন্দ্র গুপ্তকে অনুরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক রচনা—"বৌ ঠাকুরানীর হাট"—সাহিত্যের বিচারে হয়তো যাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু "বলাকা"কেও তিনি প্রগতির শিবির হইতে ছাড়িতে রাজী নন। বাঙলা কাব্য সাহিত্যে 'বলাকা'র শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। কিন্তু 'বলাকা'র কোন্ কবিতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন? তখনকার সমসাময়িক জড়বিজ্ঞানে যে ব্রহ্মাণ্ড গতির, "কসমিক মোশন"-এর কথা প্রচারিত হইতেছিল, 'বলাকা' সেই আধুনিক ভাবধারার কাব্যময় প্রকাশ। এখানেও স্ববিরোধী না হইয়া 'বলাকা'কে প্রগতিশীল বলা চলে না (ঐ)।" পরিশেষে তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে লেনিনকে উদ্ধৃত করেছেন, "An artist truly great must have reflected in his work at least some essential aspects of the revolution."

'পরিচয়ে'র পরবর্তী সংখ্যায় সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আবেগময় ভাষায় লেখেন: "জার্মান কমিউনিস্টরা যেমন আওয়াজ তুলেছিলো 'গ্যেটে আমাদের, গ্যেটেকে আমরা ফ্যাশিস্টদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না', রবীন্দ্র-বাবুরা সেরকম আওয়াজ তুলতে তো পারেননি, "রবীন্দ্রনাথরা আমাদের; নেহেরু, গোলওয়ালকারের হাতে এদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।" তাঁরা বরং উলটো আওয়াজ তুলেছেন, "প্রগতিশিবির থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের দূর করো।"

অনিমেষ রায়ের প্রধান আপত্তি রবীন্দ্র গুপ্তের বিচার-পদ্ধতি সম্পর্কে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন:

"৫নং মার্কসবাদীতে লেনিনের রাশিয়ান বুর্জোয়া শ্রেণী ও রাশিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণটি হুবহু ভারতের ইতিহাস ও বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত তিনটি ভুল চিন্তাধারা অনুসরণ করেছেন:

(১) তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসকে বিরাট সচেতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

(২) তিনি বাঙলা সাহিত্যের এক অংশকে যে সব বুর্জোয়া গণবিপ্লব তাঁর মতে ঘটেছিল তারই প্রতিফলন

স্বরূপ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

(৩) তিনি সমগ্রভাবে বুর্জোয়া বাঙলা সংস্কৃতিকে ও সাহিত্যকে 'বিপ্লবের পরিপন্থী' বলে ব্যাখ্যা করেছেন, (নতুন সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।" পাদটীকায় তিনি স্পষ্টতর করে বলেছেন, "দেশে বুর্জোয়া বিকাশের স্তরে সাহিত্যের দুই ধারা, একটি বুর্জোয়া আপসপন্থী প্রতিবিপ্লবী এবং অন্যটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক, এই বিশ্লেষণ লেনিন কেবল রাশিয়ার বিশেষ সামাজিক অবস্থায় বিকশিত একমাত্র রাশিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধেই করেছিলেন। ইংরেজ বা ফরাসী বা মার্কিন বা জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে এ-বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হয়নি। রবীন্দ্র গুপ্ত তাঁর মেথডলজিটা কি, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেটা কতদূর বাঙলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে-সব প্রশ্নের অবতারণা করেননি।" রবীন্দ্র গুপ্তের আলোচনার যান্ত্রিকতা বিষয়ে তিনি ঈষৎ পরিহাসের সঙ্গে বলেছেন: "লেনিন রাশিয়ার ক্ষেত্রে বলেছিলেন যে শ্রমিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য হবে রাশিয়ার বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য, বাঙলার ক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বাঙলা সাহিত্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও তাঁদের তাঁবেদার জাতীয় বুর্জোয়ার চক্রান্তে এখন তা "লুপ্ত, অবজ্ঞাত"। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে বড়ো বড়ো 'গণবিপ্লব' ঘটেছিল আর তারই প্রতিফলনে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য রচিত হয়নি, এ কখনও হতে পারে? তাহলে লেনিনবাদ মিথ্যা হয়ে যায়!! নিশ্চয়ই অজ্ঞাত সব চারণ কবিরা তার চেয়েও অজ্ঞাত সব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য রচনা করে গিয়েছিলেন। আমরা সে-সব খবর জানতে পারছি না সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে। যদি সেটা কখনও আবিষ্কৃত হয় তবে তাকেই আমরা বলব সাচ্চা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য। তার অভাবে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো যাক। মাইকেল, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধুর সাহিত্যকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য বলা যাক তাঁদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও।"

গোপাল হালদার উক্ত বিতর্কসমূহে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও 'নতুন সাহিত্যে'র ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন: "বাঙালীর এই দুর্বল ঔপনিবেশিক জীবন ও ঔপনিবেশিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব। সেই অসম্পূর্ণতা তিনিও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু এদেশে ধর্মগত ও সমাজগত যে সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতার প্রধান উৎস, রবীন্দ্রনাথ সেই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা থেকে প্রায় সর্বাংশেই মুক্ত। * * * রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক বলা একটা মিথ্যা প্রচার (slander), কিন্তু বাঙালী জীবন ও বাঙালী সাহিত্যের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ 'জাতীয়' সাহিত্যে গণতান্ত্রিক সাহিত্যে পরিণত করতে পারেননি, সে-কথা তথাপি মিথ্যা নয়।

"বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্য মোটের উপর সামন্ততন্ত্রী চেতনাকে প্রশ্রয় দেয়নি, এমন কি সংকীর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদকেও প্রশ্রয় দেয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী তাঁর বক্তৃতাসমূহ (ন্যাশনালিজম) আজ হয়তো অনেকের নিকট পরিচিত নয়। তবু লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম'-এর সঙ্গে তা মিলিয়ে পড়লে হয়তো অন্যায় হবে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তথ্য বিশ্লেষণ করে লেনিন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের যে পরিণতির চিত্র তুলে ধরেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি ও কবিচেতনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সেই যুদ্ধবাদী শোভিনিস্ট রূপই পৃথিবীর সম্মুখে চিত্রিত করেন। দুই জনার পার্থক্য যে কোথায় তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। এ-পার্থক্যের জন্য রবীন্দ্র-প্রতিভা সৃষ্টি করে 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও শ্রীনিকেতন ও আবার 'রাশিয়ার চিঠি', লেনিন-প্রতিভা সৃষ্টি করে The State and Revolution ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। রবীন্দ্রনাথ উদারতন্ত্রী মানবতার কবি,

আর লেনিন বিপ্লবী মানবতার স্রষ্টা।"

পরবর্তী ধারা

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলে দীর্ঘতম বিতর্ক হলো এই। অবশ্য তার পরেও রবীন্দ্র-আলোচনার অবসান হয়নি। কিন্তু সেগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে করেছেন। যেমন "পি. পি. এইচ" প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান লিটারেচারের ৩য় সংখ্যায় ডাঙ্গে অচলায়তনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সংখ্যায় উৎপল দত্ত তার প্রতিবাদ করেন। এ-ছাড়া 'সাহিত্য পত্রে'ও নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ১৩৫৮ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের "গোরা"—বাঙলা উপন্যাস ও জাতীয় জীবন" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। অলক সেন একই পত্রিকায় "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যের মৌলরূপ (বৈশাখ, ১৩৫৯)" প্রবন্ধেও প্রাসঙ্গিক-ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করেছিলেন।

ডাঙ্গের প্রবন্ধটির অনুবাদ এই পত্রিকার অন্যত্র মুদ্রিত হওয়ায় তাঁর মতামত এখানে উদ্ধৃত না করলেও চলে। এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে উৎপল দত্ত বিভিন্ন সমালোচকদের উদ্ধৃতি সহযোগে লেখেন, শ্রী ডাঙ্গের ভাষ্য অত্যন্ত মৌলিক হলেও অগ্রহণীয় এবং রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত।

'গোরা' চরিত্রের পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব রয়েছে বলে শ্রীবৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন। এমন কি আনন্দময়ীর মধ্যেও ভগবতী দেবীর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বৌধায়নবাবু তাঁর মতের সমর্থনে দেখিয়েছেন 'গোরা'র অব্যবহিত পূর্বের রচনা 'চারিত্র্য পূজা'। সে যাই হোক, 'গোরা' বিষয়ে তাঁর মত, "বিশ্ব মানবতার অঙ্গীকার সত্ত্বেও, এই নিরবচ্ছিন্ন অমানুষিকতার কোনো সার্থক চরিত্রায়ণ, প্রকৃতপক্ষে বাঙলার সমাজের বৃহত্তর পটভূমির কোনো গভীর চেহারাই 'গোরা'য় ফোটেনি। এই জন্যেই "ভারতবর্ষের সৌরমণ্ডল" গোরার অদম্য তেজঃশক্তি সত্ত্বেও কিরকম ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—গোরার কাছেও ঠেকে: "…সেজন্যে আমার মনের ভিতর খুব একটা শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতাকে কেবলই নানা উপায়ে অঙ্গীকার করতে চেষ্টা করেছি ·।" অথচ টলস্টয়ের "যুদ্ধ ও শান্তি"র বিরাট রুশ পটভূমি, হাজারো চরিত্রের ব্যঞ্জনায় জমজমাট হয়ে ওঠে; এমন কি বিদেশী ই, এম, ফরস্টারের "A Passage to India"ও ভারতবর্ষের পটভূমির আলো আঁধারি চিত্রণে গোরার চেয়ে অর্থবহ।" অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "যে অস্ফুট প্রশ্নে 'গোরা'র সূচনা, সে প্রশ্নের উত্তরে নয়, সে প্রশ্নকে পরিত্যাগ করে, উত্তরের অভাবে তাকে এড়িয়ে গিয়ে উপন্যাসের শেষ। উপন্যাসের শিল্পকর্ম এর ফলে ব্যাহত।" গোরা-র রিয়ালিজম ও বাঙলার সমাজ জীবন প্রসঙ্গে তাঁর মত, "অধ্যাত্ম-মগ্নতায় আচ্ছন্ন টলস্টয় কিন্তু উপন্যাসের মাধ্যমেই সার্থকতায় ভাস্বর; সমাজ জীবনের শ্রমনির্ভর অন্তত একটি অংশের সঙ্গে যে সম্বন্ধপাতের আত্মীয়তা রুশ বনিয়াদে টলস্টয়ের ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না, কাজেই এই তফাত।" রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বাঙলার ঔপনিবেশিক ভদ্রজীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা "সত্য হলেও আংশিক। কারণ, ভদ্রজীবনই তো সমগ্র জীবন নয়। আর এই সমগ্রতার বোধই তো রিয়ালিজম।"

অলক সেনের প্রবন্ধটি "সাহিত্য পত্রে"র যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেটা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। তার ১৩৫৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে লেখকের জবাবসহ দুটি আলোচনা বেরিয়েছিল। অশোক মিত্র লেখকের আকস্মিক সামান্যীকরণ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে লেখেন, "শেকসপীয়র টলস্টয়ের তুলনায় বঙ্কিম নস্যাৎ এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতার পরেই বিষ্ণু দের অপূর্ব সার্থক লেখা খুব সহজ পারম্পর্যের

সিঁড়িতে ধাপে ধাপে নেমে আসে না বলাই বাহুল্য। তবে এ-ব্যাপারে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সত্যকারের পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের কাছে টয়েনবি এবং ট্রেভেলিয়ান এখনও মোহ-মুদ্গর।” এর উত্তরদান প্রসঙ্গে অলক সেনের উক্তি উল্লেখযোগ্য, “বাঙালী মধ্যবিত্তের সামাজিক সীমায় বাঙলা সাহিত্যের যে অসম্পূর্ণতার কথা আমার প্রবন্ধে ছিল তার উদ্দেশ্য বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে খর্ব করা নিশ্চয়ই নয়, আমাদের দুশো বছরের অসম্পূর্ণতার অভিজ্ঞতায় আজকের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমস্যা বুঝবার চেষ্টাতেই ঐ আলোচনার সূত্রপাত। সে আলোচনায় বিষ্ণু দের নাম ঐতিহাসিক কারণেই এসেছে, তাতে ছোটবড়ো বিচার নেই। ঐতিহাসিক দিক্‌নির্ণয়ে বিষ্ণু দের বিষয়ে মিত্র মহাশয়ের ব্যক্তিগত আপত্তি ও ‘অপূর্ব সার্থকতা’র ঠোক্করটি তাই অবান্তর। ঔপনিবেশিক রুচি ও সংস্কৃতির শ্রেণীগত পারম্পর্যে বিষ্ণু দের সাফল্য অন্বেষণ করার চেষ্টা আমি করিনি। বরঞ্চ মধ্যবিত্ত রুচির গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলুম।”

উপসংহার

এই প্রবন্ধরচনা যখন সমাপ্তপ্রায় তখন শ্রীধনঞ্জয় দাস ‘ডাক’, ‘ইস্পাত’ ইত্যাদিতে প্রকাশিত স্বদেশ বসু, সনৎ বসু প্রমুখের আলোচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যতোদুর মনে হয় রবীন্দ্র গুপ্তের ‘বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আলোচনা’র প্রথম লিখিত প্রতিবাদ স্বদেশ বসুর প্রবন্ধ। প্রগতিশীল শিবিরের বাইরের মধ্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্ত রবীন্দ্র গুপ্তের বিরুদ্ধে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। মার্কসবাদী রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাস যা সাময়িকপত্রে ছড়ানো ছিলো এখানে তার কিছুটা উদ্ধারের চেষ্টা হলো। এর মধ্যে অধিকাংশ রচনাই ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখ্য, তবু এটুকু মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। কিছুদিন আগে “New Age” পত্রিকায় সীতা বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্কিম-বিতর্কের বিষয়ে” প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বিতর্ক ব্যাপ্তি ও গুরুত্বে অনেক গভীর হলেও এ-পর্যন্ত কেউ ধারাবাহিক আলোচনার চেষ্টা করেননি। আদিত্য ওহদেদার তাঁর মূল্যবান “রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা” গ্রন্থেও মার্কসবাদী বিতর্কের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন (এখানে শুধু বসুধা চক্রবর্তী ও বিনয় ঘোষের উল্লেখ রয়েছে)। পরিশেষে আরেকটা কথা জানানো প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত বহু লেখকই তাঁর রচনা প্রত্যাহার করেছেন। এমন কি তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির মার্কসবাদেই বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু-একখানি গ্রন্থও রচিত হয়েছে যেমন, গুণময় মান্নার ‘রবীন্দ্রনাথ’, অরবিন্দ পোদ্দারের ‘রবীন্দ্রমানস’। স্থানাভাবে এগুলির পরিচয় দেয়া গেল না। অতি-সাম্প্রতিককালে রচিত প্রবন্ধাবলী আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ-ছাড়াও দু-একটি প্রবন্ধ হয়তো অনুল্লিখিত থেকে গেলো। তার কারণ সেগুলি অপাঠ্য নয়, অপঠিত।

প্রেমের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ॥ লুই শাদ্বোন্

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি ও 'গীতাঞ্জলি'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর ফ্রান্সের অধিকাংশ পাঠকই অনুবাদের অভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি আশানুরূপ দীর্ঘ মনোযোগ দিতে পারেননি। এই হিন্দু—যাঁর মধ্যে প্রাচ্য মানসের সঙ্গে ইওরোপীয় সংস্কৃতির দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে—আমাদের এই বিচ্ছিন্ন যুগে বিশ্বজনীনতার উজ্জ্বল উদাহরণ। দার্শনিক হিসেবে তাঁর "Nationalism" সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী ; এবং আমেরিকা ও জাপানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার যেটুকু প্রতিধ্বনি ফ্রান্সে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে সেটুকুই আমাদের চিন্তার যথেষ্ট খোরাক জুগিয়েছে। এই সব রচনা থেকে আধুনিক ইওরোপীয় জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি প্রাচ্য জ্ঞানীর প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়।

কবি হিসেবে ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় কেবলমাত্র তাঁর "গীতাঞ্জলি" অথবা "নিবেদিত সঙ্গীতেই" সীমাবদ্ধ যার অনবদ্য অনুবাদ করেছেন আঁদ্রে জিদ। এই বইয়ে আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার একটি দিকই দেখতে পাই—যে-দিকটিকে আধ্যাত্মিক কিংবা মিস্টিক বলা যায়। যতই মূল্যবান হোক না কেন এই দিকটিতে কবির পরিচয় আংশিক। অনেকগুলি কাব্যসংকলনে, যাদের কোনো ফরাসী অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি, কবির বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়—কাব্যের বিষয়ব্যাপ্তির জন্য এগুলি শুধু উল্লেখ্য নয়, কবির মানবিক রূপের আরো অন্তরঙ্গ সুর এতে পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আমার কাছেই একটা বই রয়েছে যার ইংরেজি সংস্করণ যুদ্ধের সময়ে সব বিক্রি হয়ে গেছে, এবং যেটি ম্যাকমিলান সম্প্রতি আবার প্রকাশ করেছেন—"The Gardener"।

এই কবিতাগুলি ফ্রান্সে 'গীতাঞ্জলি'র চেয়ে খুব কমই পরিচিত যদিও এর অধিকাংশই অনেক আগে লেখা হয়েছিল। 'প্রেম ও জীবনের কবিতা' (রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই তাদের পরিচয় দিয়েছেন)—আমাদের পাশ্চাত্ত্য সমঝদারেরা বোধ করি এগুলিকে 'গীতাঞ্জলি'র লিরিকধর্মী ও মিস্টিক কবিতাবলীর চেয়ে অধিকতর মর্মস্পর্শী ও গভীর বলে মনে করবেন—এগুলি এতই দূরসঞ্চারী ও ছন্দোময় গতিসম্পন্ন। 'গীতাঞ্জলি'র মতো 'দি গার্ডেনার'ও বাংলার অনুবাদ যা কবি নিজেই করেছেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দিয়েছেন যে এগুলি যথাযথ অনুবাদ হয়নি।

আমাদের ইওরোপীয় সংস্কৃতির—আমাদের কবিতার, আর্টের বক্তব্যের কোনো কিছুই রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত নয়। যদি এই ভারতীয় লেখক আমাদের সংস্পর্শে এসে সুরুচি-সম্পদে কিছু নাও অর্জন করে থাকেন, তবু তাঁর স্পর্শমুখরতা (sensitiveness) আমাদের ইওরোপীয় লেখকদের ভাবসম্পদ থেকে ব্যাপ্তিলাভ করেছে—অন্যান্য অনেকের মধ্যে কবিদের ক্ষেত্রে রয়েছেন কীটস, শেলী, হাইনে, ভেরলেন ইত্যাদি। তাঁদের মৃদু স্পর্শপ্রবণতা ও নির্বেদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে এই যুবক হিন্দুর প্রশান্তির স্বাভাবিক বিরোধ রয়েছে—যাঁর প্রতিকৃতি এই বইয়ের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে এবং যাতে তাঁর সুন্দর ও গম্ভীর ভাব স্পষ্টই চোখে পড়ে। বোধ করি এ-ও অসম্ভব নয় যে তিনি হুইটম্যানের মুক্তছন্দের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে অন্তত কিছুটা পরিচিত। তথাকথিত সাহিত্যিক প্রভাবের কথা সমালোচকের বিচার্য, কিন্তু দূর থেকে প্রাথমিকভাবে সেই উপাদান-গুলির আলোচনা ও বিচার করা কি ভালো নয় যেগুলি এই কবিচেতনা গঠনে সহায়তা করেছে?

শৈশব থেকেই তাঁর মন প্রাচ্য সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্পদে ভরপুর ছিল। সহস্র ধর্মের জন্ম যে-দেশে সেই দেশে লালিত হয়ে তিনি ঐশ্বরিক স্বপ্নের শোভাযাত্রা চলে যেতে দেখেছেন; নিশ্চয়ই পুরোহিতদের কাছে বহু দেবতার কথা শুনেছেন; এবং পবিত্র নদীর ধারে বসে ধ্যান করেছেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা ও তাঁর জাতির প্রায়বিস্মৃত স্মৃতিগুলি তাঁর কবিতায় এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যার দ্বারা তাঁর অপেক্ষাকৃত পার্থিব কবিতাগুলিও আচ্ছন্ন;—আর এই মিস্টিক আবহাওয়া মনুষ্য জীবন নাটকের চারপাশে প্রেম ও জীবন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সারা ভারতের সম্পদে সম্পন্ন হয়েও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইওরোপের যেটুকু মূল্যবান সম্পদ দেবার ছিল তা-ও গ্রহণ করেছেন। যদি কেউ এ-বিষয়ে চিন্তা করেন তো দেখতে পাবেন তিনি এক মিলিতরশ্মির কেন্দ্রভূমি।

এক কথায় বলতে গেলে "প্রেম ও জীবনের" এই লিরিকগুলিতে, এদের জটিলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-চরিত্রের সূক্ষ্ম ও নিবিড় পরিচয় মেলে। দার্শনিক অথবা ধর্মমূলক কবিতার চেয়ে সর্বকালীন লিরিকের মহৎ ও সরল বক্তব্যের মধ্যেই দুই বিশ্বের মাঝখানে এই কবির প্রতিমূর্তি দেখা যায়।

কাব্যসংকলন বলতে যা বোঝায় "গার্ডেনার" তা নয়। এটি এমন কতকগুলি কবিতার সমষ্টি যাদের প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম—কবিতাগুলি সাধারণত ছোট, কিন্তু একটির সঙ্গে আরেকটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং আপাত-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সিম্ফনির সংহতি নিহিত। রবীন্দ্রনাথের লিরিকের স্বর প্রধানত সঙ্গীতগুণসম্পন্ন। তার মানে এই নয় যে তাঁর মধ্যে আমরা প্রকরণগত ও বাচনিক সামঞ্জস্য দেখতে পাই, যদিও সে-গুণগুলি তাঁর মধ্যে এমন কি তাঁর অনুবাদেও সহজেই ধরা পড়ে। এগুলি যেন আরো অন্তরঙ্গ, আরো গভীর: এমন একটা প্রবাহ যার অস্তিত্ব বিষয় ও চিত্রকল্পের অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করে না, কিন্তু যেটি এক আন্তরিক উৎসাহের দ্বারা পরিচালিত, গোপন ছন্দের দ্বারা বিধৃত। এই কবিতাগুলি বাঁধাধরা ছবি নয়, কিংবা কোনো চিন্তাধারার প্রগতি প্রকাশ করে না। এগুলি গান; একটির প্রতিধ্বনি অন্যটিতে স্পন্দন জাগায়; আনন্দ, বিষাদ, প্রেম, ভালবাসা এবং অস্থৈর্য মিশে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়, একের পর এক আসে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ছন্দ মেনে, শোভন শালীনতার স্পন্দন মেনে। এগুলি বাঁশির সঙ্গীত! এগুলি লিরিকধর্মী, প্রকৃতই লিরিক, অলংকার এদের স্পর্শ করেনি যে-অলংকার আমাদের ফরাসী কবিদের এত প্রিয় ও এত মারাত্মক—আমাদের মহত্তম কবিও তা থেকে বাদ পড়েন না;—এখানে কোনো উচ্চকথন নেই, কোনো বক্তব্যের সজোর অভিঘাত নেই, ফলশ্রুতির জন্যে কোনো কঠিন প্রচেষ্টা নেই; এগুলি হাল্কা ও বায়বীয়, শুধু এক মাধুর্যে মণ্ডিত সারল্য।

বাগ্‌বিস্তারের চেয়ে দূরবর্তী এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ভাষার কারিকুরি এবং জাঁকজমক রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় দুর্লভ। ভাবের দিক থেকে যতই এগুলি নিপুণ ছায়াচ্ছন্ন ও সুচারু, ভাষার দিক থেকে ততই এগুলি সহজ, সরল এবং বাহুল্যবর্জিত। তাঁর কবিকর্মের সাঙ্গীতিক গুণ সব সময়ই মৃদু যেমন তাঁর চিত্রকল্পের ঔজ্জ্বল্য সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত: মনে হয় যেন কতকগুলি দামী পাথরকে মসলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এই দুটি গুণ—অনায়াস গতি ও সারল্য—এদের আধিক্যেই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো দোষ নিহিত। অত্যধিক অনায়াস গতি, তারল্য ও কাব্যপ্রবাহে অসংলগ্নতা—এগুলি এই কাব্যসংকলনে পৌনঃপুনিক ভাবে দেখা দিয়েছে—বোধ করি তাঁর বহু কবিতায় মিলবে। কয়েকজন ইংরেজ সমালোচক এ-ব্যাপারে তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। জগতের নারীদের স্তবারিও তাঁর কিছু উপকার করেনি। যাই হোক, 'নারাঙ্গী ফুলের' গন্ধে

ভরা 'অতর্কিত পাখি' দেখে আমরা যেন 'গার্ডেনারের' যৌবনমুখর নতুনত্ব ও মুগ্ধ সারল্যের কথা না ভুলি। সে-কথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

এই সারল্যের সঙ্গে সেই সব দৃশ্যাবলীর সামঞ্জস্য রয়েছে যার মধ্যে কবির অন্তরের নাটক অভিনীত হচ্ছে—আলোকময় ও শান্তিপূর্ণ গ্রাম, আমের মুকুলের গন্ধে ভরপুর গলি, পাখিভর্তি গাছ আর ছায়াচ্ছন্ন নদী যেখানে তরুণীরা গাগরি ভরণে আসে। রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী নন। তিনি শিল্প কিংবা আনন্দের খাতিরেও ভারতীয় গ্রামের এই সুন্দর দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দেন না—যদিও সে-গ্রামে হয়তো তাঁর যৌবনের অনেক বছর কেটেছে। কিন্তু সর্বদাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা, প্রেম এবং আত্মার স্পন্দনের মধ্যে প্রকৃতি এসে যোগ দেয়। তাঁর কাছে প্রকৃতি সেই পুরনো মায়া নয়—যার প্রকাশ অবাস্তব—যে নাকি আমাদের স্বপ্নের পরিবর্তমান তন্তু। প্রকৃতি তাঁর জীবনে এক বাস্তব সত্য।

গাছ, জল, ফুল, মৌমাছি, রাত্রি, বাতাস—এই সবই কবির কাছে এক প্রাণবন্ত শোভাযাত্রা। এগুলি প্রেমিক-প্রেমিকার এক মুখর স্রোত :

Speak to me, my love ! Tell me in words what you sang.

The night is dark. The stars are lost in clouds. The wind is sighing through the leaves.

I will let loose my hair. My blue cloak will cling round me like night. I will clasp your head to my bosom ; and there in the sweet loneliness murmur on your heart.

I will shut my eyes and listen. I will not look in your face.

When your words are ended, we will sit still and silent. Only the trees will whisper in the dark. (ভালো করে বলে যাও : মানসী)

* * * * *

Is it then true that the dew drops fall from the eyes of the night when I am seen, and the morning light is glad when it wraps my body round ? (প্রণয়প্রশ্ন : কল্পনা)

রবীন্দ্রনাথের উপমার অধিকাংশই প্রকৃতি থেকে আহরিত, তা-ও কবিকর্মের খাতিরে নয়, এর কারণ হল যে কবির আত্মা ও জগৎ-প্রবাহের মধ্যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে। সর্বাস্তিবাদ, সর্বপ্রাণবাদ—এই বড়ো বড়ো বিষয়বিবিক্ত শব্দগুলির কী প্রয়োজন, এবং এগুলো থেকে কী-ই বা বোঝা যায়? কবি জগতের ঐশ্বর্য উপভোগ করেন—কখনো কখনো মাতালের মতো—

I run as a musk deer runs in the shadow of the forest mad with its own 'perfume'. (মরিচীকা)

সর্বদাই যেন এক পেলব স্পর্শ রয়েছে। তিনি ভক্ত ব্রাহ্মণের মতো সৌম্য। এটি একটি বৃহৎ জগৎ, যেখানে সব কিছুরই নিজস্ব জায়গা আছে এবং সব কিছুরই মূল্য অপরিমেয়! সূর্যের একটি রশ্মি, তরুণীর একটু হাসি বিশ্বকে প্রোজ্জ্বল করে; একটি শিশুর বিষাদ এখানে অন্ধকার ডেকে আনে :

A blade of grass is as precious as the sunset in its glory and the stars of midnight.

এখানে বাঁচার আনন্দ এবং ফলহীনতারও আনন্দ বিদ্যমান :

Over the green and yellow rice-fields sweep the shadows of the autumn clouds followed by the swift-chasing sun. (আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা)

বিশ্বজনীন জীবনের এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কখনো কখনো ইন্দ্রিয়জ আনন্দের তীক্ষ্ণ প্রকাশের মধ্যে দেখা যায়। লা কোঁৎ দ্য লাইলের (Le Conte de Lisle) তথাকথিত 'হিন্দু' কবিতার মতো তাঁর কবিতায় 'নির্বাণের' জন্যে কোনো আকুতি নেই। 'গার্ডেনারের' ফুলের টবে এমন কোনো ফুল নেই যার গন্ধ মাতাল করে। রবীন্দ্রনাথ নিছক ধ্যানগম্ভীরও নন। কিছু কবিতায় ফ্রান্সিস দ্য আসিসির স্তোত্র-সঙ্গীতের আদল মেলে: তাঁর মিস্টিসিজম কেমন সপ্রাণ ও আনন্দোচ্ছল—মাঝে মাঝে তিক্ততাহীন বিষাদের রেশ এসে লাগছে তাতে। কবির সম্পদ এত বেশি যে তিনি যা দিতে পারেন তার পরিমাপ হয় না, তিনি অন্তহীন প্রেমও বিলোতে পারেন; সমান কোমলতার সঙ্গে তিনি শান্তি ও আনন্দকেও আহ্বান জানান; তিনি অনিবার্য ভাগ্য এবং নবায়নের মাধুর্য কী তা জানেন; তিনি জানেন –

Infinite wealth is not yours, my patient and dusky mother dust !

You wish to fill the mouths of your children, but food is scarce.

The gift of gladness that you have for us is never perfect.

The toys that you make for your children are fragile.

প্রেম, সৌন্দর্য, জ্ঞান কিছুই পূর্ণ নয়, কিছুই কখনো শেষ হয়ে যায় না। কিন্তু এই নিশ্চয়তা আমাদের যেন বিষণ্ণ না করে। ভবিষ্যতের এই সত্যিকারের ছবি আমাদের যেন বর্তমান কালে বেঁচে থাকার কথা ভুলিয়ে না দেয়। বিপরীত দিকে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই ঋষির কোনো মিলই নেই যে নাকি ধীরে ধীরে নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। এপিকিউরিয়ান কিংবা তাদের তিক্ততার সঙ্গেও তাঁর মিল নেই। কোনো পলায়ন নেই, কোনো রুক্ষতা নেই: কেবলই প্রেমভরা অপার শান্তি:

Beauty is sweet to us because she dances to the same fleeting tune with our lives.

Knowledge is precious to us, because we shall never have time to complete it.

All is done and finished in the eternal Heaven.

But earth's flowers of illusion are kept eternally fresh by death.

Brother, keep that in mind and rejoice. (শেষ: ক্ষণিকা)

এই স্বচ্ছ জ্ঞান যা কিনা বয়সের দান—যৌবনের তাণ্ডব এর ওপর কখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 'গার্ডেনারের' কবিতাবলীতে আমরা যৌবনের প্রতিধ্বনিকে প্রৌঢ় বয়সের শান্ত ও সমাহিত স্বরের সঙ্গে মিশে যেতে দেখেছি। অস্থিরতা, অজানার জন্যে আশ্চর্য আকুতি:

I am restless. I am athirst for far away things.

My soul goes out in a longing to touch the skirt of the dim distance. (আমি চঞ্চল হে)

যদিও আশাহীন, তবু সুখের জন্যে এই খোঁজাখুঁজি; "The dancing image of desire"-এর প্রতি অভিসার। আমরা এই হিন্দু কবির মধ্যে হাইনের "Sehnsucht"-এর মতো কিছু পাই, এবং সেই উৎসাহের সঙ্গে মিশেছে স্বপ্নমুখর যৌবনের স্বচ্ছদৃষ্টি। সেই সঙ্গে কিন্তু কোনো রোমান্টিক উন্মত্ততা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না: তাঁর কাব্যিক অনুভূতিতে কোনো কিছুর সজোর অভিঘাত নেই, এবং তাঁর লিরিক উদ্দীপনা সর্বদাই

সেই ভারসাম্য ও গাম্ভীর্য বজায় রাখে যা আমাদের সাহিত্যের জাতিতত্ত্ববিদদের মতে লাটিন জাতিগুলিরই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামঞ্জস্য, শালীনতা, পেলবতা—এই তিনটি শব্দেই 'গার্ডেনারের' বেশির ভাগ ও আকর্ষণীয় কবিতাগুলির গুণ বর্ণনা করা যায়। যে-প্রেমের গান কবি শোনান তার মধ্যে সেই গুণটি নেই যাকে সাধারণত আমরা বলি প্যাশন। ঐ ভাবধারা থেকেই কবিতার উদ্ভব হয়—যদি এ-কথা সত্যি হয় যে প্যাশনের কোনো কবিতা নেই। স্তঁদাল বলেছেন, "প্যাশনের বাড়াবাড়ি লিপিবদ্ধ করা মস্ত বোকামি।" সন্দেহ নেই মুসের পেলিক্যান সেই কারণে আমাদের মনে সাড়া জাগায় না। রোমান্স-লেখকের যদি অনুভূতির বাড়াবাড়ি নিয়ে অসুবিধা হয়, তা হলে সেরকম অবস্থায় কবির পক্ষে গলাবাজি না করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আসল কবিকে দেখা যায় তাঁর আকাঙ্ক্ষা, কোমলতা ও লজ্জার মেশামিশির মধ্যে, নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া ও গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যে, সুন্দর আভাসের মধ্যে, ভাবাবেগকে হাসির দ্বারা কোমল করার মধ্যে—যেগুলি প্রেমেরই গুণ, যে-প্রেম প্যাশনের চেয়েও কম সাধারণ এবং কবিতার প্রতি আরো অনুকূল।

এই প্রেমের গানই রবীন্দ্রনাথ গান। কবি কখনো প্রেমিকের কথা বলেন, কখনো প্রেমিকার। কতকগুলি কবিতা এ ওর পরে আসে, স্তোত্র-সঙ্গীতের মতো। চারণভূমির চিত্রকল্পের সঙ্গে মিলিত হয় এটি, এবং গ্রামের প্রকৃত ছবিগুলি, আর প্রকাশিত ভাবধারার নিবিড়তা—সব কটি মিলে একটি প্রাচীন সারল্য ও সুরুচির প্রকাশ করে যা খুবই আধুনিক—ঠিক যেন বর্তমানকালেরই মেষপালকের গান।

'গার্ডেনারের' কিছু প্রেমের কবিতার অত্যন্ত সাধারণ সংজ্ঞা হল এই যে সেগুলিতে ভাবাবেগ (emotion) ও ভাবের (sentiment) শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং তাদের ঘিরে একগাদা চিত্রকল্প জড়ো করা হয়েছে—যা নাকি ছন্দের গুণে সঙ্গীতপ্রসাদে প্রসন্ন এবং লিরিক উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। বক্তৃতার চেয়ে উদ্ধৃতি অনেক উপযোগী। এই একটি ছোট কবিতা যাতে একটি প্রেমে-পড়া তরুণীর লজ্জার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

When I go alone at night to my love tryst, birds do not sing, the wind does not stir, the houses on both sides of the street stand silent.

It is my own ankles that grow loud at every step and I am ashamed. (গৃহশত্রু : চিত্রা)

এবং এটিতে একজন প্রেমিকের কথা শোনা যায় যে তার আকাঙ্ক্ষা গোপন করে রাখে, প্রকাশ করে না :

Your claim is more than that of others, that is why you are silent.
With playful carelessness you avoid my gifts.
I know, I know your art,
You never will take what you would.

এই প্রেমে কিছুই আবছা-আবছা অস্পষ্ট নেই—বর্তমান সুখের আস্বাদনই এখানে প্রধান—যে-সুখ নিংড়ে নিয়ে ভোগ করা যায়। দুর্গমের পিছনে না ছুটে কবি ভালবাসার মুহূর্তের সূক্ষ্ম সুরভিতে আমোদিত :

Hands cling to hands and eyes linger on eyes : thus begins the record of our hearts.
It is the moonlit night of March ; the sweet smell of *henna* is in the air ; my flute lies on the earth neglected and your garland of flowers is unfinished.
This love between you and me is simple as a song.

এই কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে অনুভূতির এক ক্ষিপ্র স্রোত বয়ে চলে, যদিও তা বাঁধভাঙা নয়। আমরা এটা অনুমান করি, অথবা অন্ধকারে কোনো সৌরভের মতো এটা আমাদের আচ্ছন্ন করে, অথবা দূরশ্রুত গানের মতো মুগ্ধ করে। হেমন্তের উত্তপ্ত নিশ্বাস, জলের শব্দ, রাত্রিকালে মাঠের শব্দ এইসবের সঙ্গে কবির প্রেমের তীব্রতা তাঁর কারুকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

It is evening and tho time for the flowers to close their petals.

Give me leave to sit by your side, and bid my lips to do the work that can be done in silence and in the dim light of stars.

এই হিন্দু কবির মাধ্যমে প্রেমকে আমরা একটা মিষ্টি অথচ কঠিন খেলা বলে চিনতে পারি। এর আগুন সহস্র সুরুচির দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রেমিক জানে কী প্রযত্নের সঙ্গে তার ভুলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কোনো নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম স্পর্শে তাকে ধরে রাখা উচিত। কী হৃদয়গ্রাহী সূক্ষ্মতা অথচ কত সত্য!

কোনোদিন ফিরে এসে আমাদের সমাপ্তি ঘটে না। কবি পরিবর্তনকে স্বীকার করেন—যেমন ভাবে মৃত্যুকে তিনি স্বীকার করেছেন সুখের সঙ্গে। পরস্পরের মত চেয়ে বিদায় নেওয়া—বিদায়সম্ভাষণে বন্ধুত্বের স্পর্শ—তবু এই আপাতসারল্যের মধ্যে কত তিক্ততার অপনোদনের চিহ্ন, কত বিসংবাদের দুঃখের বিনাশ:

"To me there is nothing left but pain."

তবু শেষ পর্যন্ত আরো কিছু থেকে যাচ্ছে--কোমলতা এবং এই আকাঙ্ক্ষা যেন শেষ প্রহর আমাদের সুন্দর হয়, শেষ আদর যেন নিবিড় হয়।

বলা বাহুল্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের সব উপাদানের পূর্ণ পরিচয় এই অনুবাদ থেকে পাওয়া যায় না। 'গার্ডেনারের' কবিতাগুলি তাঁর কবিকৃতির অংশবিশেষ, যদিও এটি সুসমঞ্জস ও তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা।

কোনো অপরিচিত সরলতা কবিতাগুলির ঘাড়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিষয়হীনতার (abstraction) মধ্যে না গিয়ে যেটুকু দরকারী কবি সেটুকু আমাদের দেন, এবং সেকারণে তিনি আমাদের কাছে কীটস, হাইনে, ভেরলেনের মতো এত নিকট। প্রাচ্যের এই লিরিক (এ-কথায় মনে পড়ে সঙ্গীতের সঙ্গীত বলতে যা বোঝায়)—হাল্কা, কোমল, আবেগময়, এবং বর্ণিল—এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে পূর্ণ সংযম। সহস্র আভাসে এদের ঔজ্জ্বল্য আরো পরিস্ফুট হয়। বাচনিক জাঁকজমক ও ভাবাবেগের আতিশয্য এদের স্পর্শ করেনি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বদাই একটা দক্ষতা দেখা যাবে যা কেবলমাত্র কবিকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।

"প্রেম ও জীবনের কবিতা"—এদের বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কোমলতা, ইন্দ্রিয়জ আনন্দ, ভুলে-যাওয়া ভাব, বিষাদ, আকাঙ্ক্ষা, অস্থৈর্য—এই সব কটি সূত্রই এদের স্পর্শ করেছে। কিন্তু সব কটি বিষয়ের মধ্যে যে সঙ্গীতের ধ্বনি সর্বদাই বাজে, বই শেষ হলে সেই ধ্বনির রেশ আরো স্পষ্ট আরো গভীর হয়ে বাজে।

জীবন থেকে প্রেম বিচ্ছিন্ন নয়: প্রেম জীবনের শর্ত। জ্যোতির মতো যে প্রোজ্জ্বল জ্ঞানসার রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে ঘিরে আছে, তা এই প্রেম, এই একজন ও সকল জনের পরস্পর সম্পর্ক। এটা তাঁর কবিতারও সারবস্তু।

কবির আত্মার গতির সঙ্গে সমস্ত জীবন্ত বস্তুর অদ্ভুত এক অনুষঙ্গ: এই জন্যেই কি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়

সেই এক অদ্ভুত প্রতিধ্বনি ও অদ্ভুত গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়? তাঁর অনেক কবিতাতেই তো মনে হয় দূরের আলোছায়ার খেলার ওপরে একটি পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে ধীরে ধীরে। তাঁর কাছে অত্যন্ত সাধারণ কথায় কখনো কখনো আশ্চর্য ঝংকার ও অদ্ভুত সৌষম্যের পরিচয় মেলে। তাঁর কবিতার স্বচ্ছ তন্তুর ওপর ছায়া বড়ো হয় এবং প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে যায়। এই থেকেই জাদুকরের দণ্ড আমরা চিনতে পারি, তা হল কবির প্রতিভা। তাদের জাদু বলতে বোঝায় "জীবনদানের" ক্ষমতা। সেগুলি জীবনপ্রদ।

রবীন্দ্র-বাণী ॥ অমিয় চক্রবর্তী

এলে তুমি বাণী—
পত্রে পত্রে তব রুদ্রপাণি
রৌদ্রে নেয় ভরে,
বাংলার প্রাণ ফোটে বন্ধভাঙা পুষ্পের নির্ঝরে ;
শুভ্র চেরা শ্যামল চেতন
তব মুক্ত শাখার স্পন্দন
মহান যুগের স্রোতে
বৃহৎ মানব সংঘ হতে
মর্মরনি—
দিল জাগরণী ।
চমকের নেশাপূর্ণ চোখে
আজ মাঠে শস্য নেই দেখে লোকে ।
দিন গেছে ; ঘরে ক্ষুধা ; শত শত্রু ফিরে
অশক্তির নাট্যমঞ্চ ঘিরে ।
শক্তি এল সত্যের প্রত্যয়ে ।
ভোরে উঠে জনে জনে পরম বিস্ময়ে
মহাবাণী, শুভ্রপটে জেনেছে তোমায়, মর্মমাঝে
পেয়েছে সত্তার স্পর্শ ; দিনকাজে
বিদ্যালয়, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সমাজে জাগে ভাষা ।
প্রজ্বলন্ত আশা
মধ্যাহ্নে তোমার ছন্দে গ্রামে গ্রামে নবীন সংগ্রাম
করিছে প্রণাম ।

সায়াহ্নের আলো লাগে গভীর আকাশ হতে যবে
তরু, তব ধ্যানাবিষ্ট পল্লবে পল্লবে
মর্ত্য জ্যোতিষ্কের সুর মেশে,
বঙ্গদেশে ।
মানবেরে দিলে অঙ্গীকার,
অস্তিত্বের অধিকার
যেখানে সুন্দর দিনাকাশে
সত্তার সমগ্র তরু আপনা বিকাশে ॥

রবীন্দ্রনাথ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি তো ছিলাম ঘুমে
তুমি মোর শির চুমে
গঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে

চমকি উঠিনু জাগি,
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন্ অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য-তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি।

আমারে জাগায়ে দিলে
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হতে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে,
তুমি ছাড়া আর কার
এ-উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র

তোমার কবিতাগুলি পড়ে আছে শয্যার দু-পাশে পড়িতেছি নাকো!
ভাবিতেছি স্নিগ্ধমনে এগুলিরে কোন্ বর্ণ দিয়ে কেন তুমি আঁকো?
তোমার পৃথিবী বন্ধু—রাত্রি তার ভয় নাহি জানে রৌদ্রে নাহি তাপ;
ঝটিকায় পেলে শুধু শক্তির মহিমা, বজ্রে তব নাহি অভিশাপ।
সাঙ্গ করে ফিরে আসি দিবসের নির্লজ্জ সংগ্রাম, পড়ি তব লেখা—
সুমধুর স্বপ্নগুলি শুভ্রপক্ষে নামে চারিধারে, মোছে অশ্রুরেখা।
তোমার কবিতা বন্ধু, জীবনের আতপ্ত ললাটে বুলায় অঙ্গুলি।
আকাশ যে নীল বন্ধু ধরণীর মন্থনের বিষে, সে কথাও ভুলি!
পৃথিবীর যত অশ্রু—তুমি তার লয়েছ যে স্বাদ, জানি গ্লানি তার;
বিধাতার কার্পণ্যের তাই বুঝি দিতে চাহ শোধ—মমতা তোমার!
মোহের অঞ্জন তাই পরাইতে চাও, হে ব্যাকুল অমৃতসন্ধানী—
নমস্কার কে করিবে; হৃদয়ের এত কাছে আছ, লও হাতখানি॥

রবীন্দ্রনাথ ॥ জীবনানন্দ দাশ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে,
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর—'
এ-রকম কথা যেন শোনা যেত কোনো একদিন;
আজ সেই বক্তা ঢের দূর

চলে গেছে মনে হয় তবু;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হয়ে আছে বলে
ওরা ভাবে লীন হয়ে গিয়েছে অস্তিমে

সৃষ্টির প্রথম নাদ—শিব সৌন্দর্যের;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে।

ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

কোনো রাজা ও সাম্রাজ্যের চেয়ে মহৎ সাহিত্য যে বহুগুণ দীর্ঘস্থায়ী, এতেই তার অসামান্য গৌরবটি নিহিত। মানবাত্মার এই শক্তি যে কোনো গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা রাজন্যবর্গের চেয়ে অনেক বেশি টেকসই, তার সাক্ষী ইতিহাস। লুপ্ত হয়ে গেছে হোমারের রাজবংশ, কিন্তু তাঁর গীতসুধা এখনো সপ্রাণ ও উজ্জীবন্ত। রোমের বৈভব অন্তর্হিত বটে, কিন্তু ভার্জিল এখনো তীব্র ও প্রচণ্ডভাবে উপস্থিত। মানবিক সম্পর্কের অশ্রুসজলতার আভাস জাগিয়ে দিয়ে কালিদাসের স্বপ্নগুলি এখনো জীবিতের আর্তনাদের মতো আমাদের নাড়া দিয়ে যায়, কিন্তু তিনি যার ভূষণস্বরূপ ছিলেন সেই উজ্জয়িনী এখন শুধুই তাঁরই রচনার ভিতর আমাদের স্মৃতিতে জেগে ওঠে। মধ্যযুগের বড়ো বড়ো রাজন্যবর্গ বিস্মৃতিপ্রাপ্ত হলেও দান্তের গীতবিতান এখনো লালিত হচ্ছে। ইংরেজি ভাষা যতদিন থাকবে, লোকে ততদিন এলিজাবেথান যুগকে ভুলতে পারবে না—এবং তা শুধুই শেক্‌স্‌পীয়রের জন্য। আমাদের বর্তমান প্রভু ও নেতৃগণ যখন বিস্মৃতির অন্তপারে চলে যাবেন, তখনো আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও গীতিগুচ্ছে মুগ্ধ হবো। তার কারণই হলো আপাদমস্তকে ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনাকর্মের মূল্য কোনো সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংগুপ্ত নেই—বরং সমগ্র চরাচরের কাছে যার আবেদন, বিশ্বজনীনতার সেই উপাদানগুলিই তাঁর রচনাবলীকে মূল্যবান করেছে। তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রাণের সুষমা, জীবনের মাধুর্য আর সভ্যতার নৈতিক গুণ।

পরিবর্তমান এই যুগে বহু ভারতীয় তরুণের কাছেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এক উদ্দীপক সান্ত্বনা। পরাজিত আশা-আকাঙ্ক্ষার ভারী বোঝা যখন আমাদের কুব্জ ও গোলপৃষ্ঠ করে ফেলেছে, যখন বিজ্ঞান ও সংগঠনের বিপুল জয়ের সামনে আমরা মোহমানভাবে দাঁড়িয়ে আছি, যখন আমাদের মন নোঙরহীন ও দিক্‌ভ্রান্ত, তখনি তিনি আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান—আমাদের মনেপ্রাণে সঞ্চারিত করে দেন দুর্মর আশা ও সাহস। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে মাথা নত করিনি, তাই তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন; আরো বোঝালেন যে ধনসম্পদ কিংবা শক্তিমত্তাই সাফল্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। আত্মার মর্যাদা আর দুঃখবরণ ও দুঃখগ্রহণের শক্তি—এরাই হচ্ছে সভ্যতার সত্যকার কষ্টিপাথর। শক্তি, সম্পদ ও পটুতাই জীবন নয়, তারা জীবনের সংশ্লিষ্ট পদার্থ মাত্র। শুধু তাই পবিত্র ও গুরুতর যা ব্যক্তিগত—বিজ্ঞান ও সংগঠন যাকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারে না।

সৎ জীবনযাত্রা ও সামাজিক শৃঙ্খলার কেন্দ্র হিসেবে আত্মার মূল্য ও শ্রেষ্ঠতাকে যে-পরিমাণ তীব্রতার সঙ্গে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই তাঁকে ভারতীয় মনীষার দীর্ঘ-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। তাঁর ভিতরে আমরা ভারতের সেই চিরঞ্জীব কণ্ঠস্বরকেই ধ্বনিত হতে দেখি, পুরাতন হলেও যা নূতন। ভাগ্যের উত্থান পতন এবং ইতিহাসের স্রোত-পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতবর্ষ তার চিত্তের নির্যাস ও গন্ধসার বাঁচিয়ে রেখেছে। কিছুতেই এটা গুলিয়ে ফেললে চলবে না যে ধীশক্তি ও শরীর আর মানবাত্মা এক জিনিস নয়। বুদ্ধি মানস আর দেহের চেয়েও গভীরতর আরো-কিছু আছে—সত্যসুন্দর ও মঙ্গলের যা অন্তঃসার তারই সঙ্গে যে একীভূত—অর্থাৎ মূল আত্মা। তাকেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ করে মানুষের ধর্ম—তাকেই সে একটি স্পন্দমান

উপস্থিতি করে গড়ে তুলতে চায়। শক্তি, ভালবাসা ও শুদ্ধতা দ্বারা নিজেকে শিক্ষিত ও উদ্দীপিত করে সেই পরম চেতনার সঙ্গে সুষম সামঞ্জস্যে উপস্থিত হওয়াই হলো নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য; সেই চিরঞ্জীব অস্তিত্বের আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলাই হলো আমাদের নন্দন প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষ। শুধু-কেবল কারিগরি-বিদ্যার দক্ষতাকেই নয়, আত্মার এই বিশালতাকেও চর্চা করে-করে তবে অর্জন করতে হয়।

রাতের বেলায় পথে বেরিয়ে তারাভরা আকাশ দেখতে পাই আমরা; চিরকাল ধরে জেগে বসে পাহারা দিচ্ছে তারা—এত তারা দূরে যে মুহূর্তে, দেখামাত্রই, আমাদের মনের ভিতর এক বিহ্বল বিস্ময় জেগে ওঠে, যেন তাদের এই স্থিরতা ও অপরিবর্তন নির্মূল করে দিতে চাচ্ছে আমাদের--যেন তাদের বিশালতার সামনে এসে দাঁড়ালেই প্রচণ্ড এক ক্ষুদ্রতার বোধ পরাক্রান্তভাবে অধিকার করে বসে আমাদের। বন্ধ হয়ে যায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাস রোধ হয়ে আসতে চায়—আর মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব যেন প্রচণ্ড আঘাতে নাড়া খেয়ে বসে। করুণভাবে তুচ্ছতায় ও সামান্যতায় ভরে যায় আমাদের ছোটোখাটো সাধ-আহ্লাদ ও উৎকণ্ঠা। ঠিক এমনিভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায় যখন মহান কবিতা আমাদের উৎকর্ণ করে তোলে, ঠিক অমনি আকুলতা জেগে ওঠে, যখন কোনো উন্মোচিত মানবাত্মার প্রতি তাকিয়ে দেখি। এই আত্মিক চৈতন্যকেই তুঙ্গ ও ক্ষুরধার করে দেয় ধর্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য। জীবনের এই দিকটাকে এতদিন অবহেলা করেছি বলেই আমাদের সমকাল এত অস্থির ও নির্ভরের অযোগ্য, বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও বুদ্ধির জয়যাত্রা সত্ত্বেও এত জটিলতা বিশৃঙ্খলা ও অনাকার জড়তা যে আমাদের ছেয়ে আছে, তারও কারণ হলো এটাই। তিনশো বছরেরও বেশি হল একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সৃষ্টিকর্ম ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রযোজনা করেছে। দুর্ভিক্ষ প্রায় অদৃশ্য; জনসংখ্যা বর্ধিষ্ণু; এবং মারী মড়ক প্রভৃতি জীবনবিরোধী ধূসর ও কৃষ্ণকায় ঘটনাবলী প্রায় নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গেছে। যতই জগৎ জুড়ে সমাজ জীবনের প্রতি আস্থা ও নিরাপত্তার বোধ ছড়িয়ে পড়েছে, ততই সন্ধানী মনোভাব ও কৌতূহল—বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-বিদ্যার বিপুল দিগ্বিজয়ের যা আকর—জীবনের গভীরতর দিকগুলির প্রতিও ছড়িয়ে যাচ্ছে। আত্মার সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির জন্যে যা সবচেয়ে জরুরি, ভালবাসা, সৌন্দর্য ও সুখের সেই সুষমাকে ধ্বংস করে দিয়ে পাতাল থেকে উঠে এসেছে আশ্চর্য এক নূতন জগৎ—কঠিন ও পাশবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য দ্বারা যা নিয়ন্ত্রিত। সন্দেহবাদ আর অজ্ঞেয়বাদ তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছে আধুনিক মানসকে। ভীষণ এক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে—যার একদিকে হলো সন্দেহবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীগণ, যাঁরা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে অন্য-কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন—আর অন্য দিকে হলো আত্মার সেই সব সমর্থকগণ যাঁরা অস্তিবাদী, যাঁদের মূল বাণী হলো এটাই যে তীব্রতম সত্য কেবল বস্তুগ্রাহ্য জগতের পশ্চাতেই বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত দলের।

... ...

মৃত্যুর দুঃখ আর হতাশার সর্বনেশে যন্ত্রণা যখন মানুষকে আক্রমণ করে; যখন আস্থা নিহত, বিশ্বাস লুপ্ত, এবং প্রেম ধ্বংসপ্রাপ্ত; যখন জীবন বিস্বাদ ও অর্থহীনতায় ভারাতুর, তখনি মানুষ আকুলভাবে হাত বাড়িয়ে দেয় আকাশে, জানতে চায় এই কৃষ্ণমেঘের অন্তরালে কোনো উত্তরদাতার উপস্থিতি আছে কিনা, —'মহান্তম্ পুরুষম্ আদিত্যবরণম্ তমসা পরস্তৎ'—আর ঠিক তখনি তার চৈতন্যের একাকিত্বে ও নিঃসঙ্গতার পরমের সংস্পর্শে আসে সে—আসে গভীরের সান্নিধ্যে, তীব্রের স্তরে, প্রচণ্ডের আশ্লেষে। সেই জগৎ আলো

আর ভালবাসার জগৎ—যেখানে কোনো ভাষা নয়, কেবলমাত্র মৌনতাই বাঙ্ময়ে উন্মুখর। এটা হলো আনন্দের জগৎ, যা অসংখ্য আকারের ভিতর নিজেকে উন্মোচিত করে দেয়, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

... ...

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভিতরে তিনটে বৈশিষ্ট্যই বারে-বারে আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করে। (১) অন্তর্মুখী সততা ও অন্তর্জীবনের কর্ষণা দ্বারা আত্মিক চেতনার চরম ও অন্তিম মূল্য অর্জনীয়; (২) নিছকই নাস্তি বা ত্যাগের ব্যর্থ অর্থহীনতা, ও জীবনের পূর্ণ পরিণত ও পবিত্র বিকাশের প্রয়োজনীয়তা; এবং (৩) সর্বজীবের প্রতি সংবেদনার নিশ্চিত মনোভাব—এমন কি লাঞ্ছিত তুচ্ছ ও পরম আশাহীনের জন্যও বেদনাবোধের নিঃসংশয় উৎকাঙ্ক্ষা। যে-কালে এতসব পুরনো জিনিস ধ্বসে যাচ্ছে আর শত-শত নূতন বোধ জেগে উঠছে, তখন যে জীবনের এইসব সত্যকার মূল্যের প্রতি কোনো ভারতীয় চিন্তানায়ক এইভাবে গুরুত্ব আরোপ করছেন, এটা খুবই তৃপ্তিকর।

["The Great Indians" গ্রন্থের "Rabindranath Tagore" প্রবন্ধটির আংশিক অনুবাদ]

রবীন্দ্রনাথ : সংস্কারবাদী না বিপ্লবী ॥ এস. এ. ডাঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রগতিবাদী মহলে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই মত পোষণ করেন যে তিনি 'সংস্কারবাদী' এবং মেহনতী মানুষের সপক্ষে কারা আছেন সে বিচারে যদি আসতে হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে না আনলেও চলে। আবার এমন কেউ কেউ আছেন যাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে এই যে তিনি মানবতার সপক্ষে সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখক। একই লেখক সম্পর্কে এমন খোলাখুলি রকমের বিরোধী মতামত হবার কারণ কী? কারণ এই যে আমাদের সমালোচকরা সবসময়েই চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ভাবে যে-কোনো একটা পক্ষাবলম্বী করে দেখাতে। এবং তা দেখাবার জন্যে তাঁরা তাঁর লেখা থেকে শুধু সে-সমস্ত অংশই ব্যবহার করেছেন যা তাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খেয়েছে।

এমনটি যে ঘটেছে তার কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এমন সমস্ত লেখা লিখেছেন যা দিয়ে তাঁকে উপরোক্ত ধরনে যে-কোনো একটি পক্ষে ফেলা চলে। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় রয়েছে সেই সমস্ত লেখায় যেখানে তিনি কবি ও নাট্যকার, অর্থাৎ যেখানে তিনি শিল্পের রাজ্যে সৃষ্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু যে-সমস্ত লেখায় তিনি 'সামাজিক সংস্কারক' বা রাজনীতিজ্ঞ বা প্রবন্ধকার সেখানে তাঁর আবেগ ও অনুভূতি, তাঁর কল্পনা ও চিন্তাধারা সীমায়িত ও বাধাপ্রাপ্ত। কারণ এ-ক্ষেত্রে তাঁকে দল ও প্রতিষ্ঠানের কথা এবং নিজের চারপাশের মানুষজন ও বন্ধুবান্ধবের কথা ভাবতে হয় এবং তাঁর উক্তি অন্যদের কাছে কি-ভাবে গৃহীত হবে সে-বিষয়ে সবসময়ে সচেতন থাকতে হয়। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে তাঁকে হয়ে উঠতে হয় একজন দায়িত্বশীল নেতা। ফলে, স্বভাবতই তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার একজন সমালোচক মাত্র এবং এমন কিছু তিনি করতে পারেন না যাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটি টলে ওঠে।

এ-ধরনের ব্যাপার অনেক বড়ো লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। শুধু তাই নয়। প্রায়ই এমন ঘটে যে

শিল্পীকে তাঁর শিল্পের মধ্যে উপস্থাপিত কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর শিল্প-সৃষ্টির এমন এক ব্যাখ্যা দিয়ে বসেন যে, তাঁর শিল্প-দৃষ্টি ও আবেগ ও চিন্তাধারা শিল্পের মাধ্যমে যে-বিশেষ বক্তব্যটিকে প্রকাশ করেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে পড়ে তাঁর নিজেরই ব্যাখ্যা। কারণ, সত্যিকারের শিল্পী নিজের ভাবনাকে অনেক বেশি যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারেন নিজের শিল্পের মধ্যে দিয়েই, প্রাবন্ধিকের যুক্তিজাল-বিস্তারের মধ্যে দিয়ে নয়।

এই কথাটি মনে রেখে আমি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ছাত্রদের মনোযোগ তাঁর একটি রচনার দিকে আকর্ষণ করতে চাই, যেটিকে বলা চলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। রচনাটি একটি নাটক, নাম 'অচলায়তন'। আমি যতদূর জানি এই নাটকটি এখনো পর্যন্ত ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি এবং সম্ভবত এখনো পর্যন্ত মঞ্চে অভিনীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু নাটকের অভিনয় করাটা অনেক মহলেই 'ফ্যাশন' হিসেবে চালু হয়েছে কিন্তু কোনো মহলেই এখনো পর্যন্ত 'অচলায়তন' নাটকটি অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়নি। এর কারণ কি? কারণ, 'অচলায়তন' এই সমস্ত ফ্যাশনদুরস্ত মহলে 'আতঙ্ক' সৃষ্টি করবে। এঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রেমমূলক লিরিক ও নিগূঢ় প্রতীক নিয়েই গদগদ হতে ভালবাসেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিপ্লবীর মতো প্রচণ্ড ঘা দিয়েছেন সেখানে এঁদের নজর নেই।

কিন্তু প্রগতিবাদী মহলেও এই নাটকটি কেন অনাদৃত হয়ে রয়েছে তা আমি জানি না।

নাটকের পুরো গল্পটি তুলে দিতে পারলে বা নাটকের সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারলে অবাঙালী পাঠকের সুবিধে হত (আশা করি রবীন্দ্র-রচনার সর্বস্বত্বের মালিক বিশ্বভারতী এই নাটকটির অনুবাদ প্রকাশে আপত্তি করবেন না)। কিন্তু এই প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের কয়েকটি মর্মকথা নিয়ে আলোচনা তুলতে চাই, যেখানে তিনি শোষিত জনসাধারণকে সংগ্রামের পদ্ধতির কথা বলেছেন। এমন পদ্ধতি যা গ্রহণ করা চলে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে বা যে ধর্মীয় শাসন নিজেকে ও রাষ্ট্রকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও সৃজনশীল শ্রমের জীবন ও তার আনন্দের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় সেই ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে।

রবীন্দ্রনাথ এই মত পোষণ করেন যে এ-ধরনের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ব্যবস্থা ও তার পরিপোষক রাষ্ট্রকে যদি পর্যুদস্ত করতে হয় তাহলে বলপ্রয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ অন্য কোনো উপায়ে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। নতুন কিছু গড়ে তুলতে হলে আগে পুরনো ব্যবস্থাকে মাটির ভিতরকার শেকড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলা চাই। এর সঙ্গে আপস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এর মধ্যে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে আপস করা চলতে পারে। হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে এর মধ্যে পরিবর্তন আনা চলে না কারণ এর মধ্যে হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই। এর অবয়বটি তৈরি হয়েছে মৃত আইন, মৃত আচার-অনুষ্ঠান ও মৃত মানুষ দিয়ে, যা শ্রমকে ও শ্রমজীবী মানুষকে পায়ের নিচে পিষে রাখে, তরুণ ও বৃদ্ধকে শোষণ করে, এমন কি নিষ্পাপ শৈশবকে পর্যন্ত মুছে ফেলতে চায়। আর এ সবই করা হয় পবিত্রতা, ঈশ্বর, আত্মা ও প্রতিষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলার নামে।

এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা (ও তার পরিপোষক রাষ্ট্র) উঁচু দেওয়াল তুলে জনগণ থেকে নিজেদের আড়ালে রাখে ও জনগণের বিরুদ্ধে নিজেদের দাঁড় করায়। উঁচু দেওয়ালের সঙ্গে থাকে বিস্তীর্ণ দুর্গপ্রাকার, লোহার

কবাট আর লোহার মতো আইন। যে রাজা এখানে রাজত্ব করেন তিনি ও তাঁর শ্রেণী, যে ধর্ম এখানে শাসন করে সেই ধর্ম ও তার আশ্রিত ক্ষমতাসীন উচ্চবর্ণ—এঁরা কেউ-ই শ্রমজীবী মানুষকে নিজেদের চত্বরের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয় না বা শ্রমজীবী মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। শ্রমজীবী মানুষকে স্পর্শ করতেও এঁদের ঘৃণা। অর্থাৎ গোটা ব্যবস্থাটি খাড়া হয়ে রয়েছে অচ্ছুৎ-নীতির ওপরে। এখানে শুধু যে একদল মানুষকেই অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে তা নয়, অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে সমস্ত রকমের সুস্থ ও সৃজনশীল শ্রমকেও, যা মানুষকে খাদ্য যোগান দেয় আর এই সমাজকে ও এই রাষ্ট্রকে পুষ্ট করে। এখানে আছে শুধু ভয়, সবকিছু সম্পর্কে ভয়—এমন কি খোলা আকাশ ও খোলা মাঠ সম্পর্কেও। আর এই সমস্ত কিছুকে এঁরা ঠেকিয়ে রাখতে চায় আইন ও শৃঙ্খলা দিয়ে আর আচার অনুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্রসাধন দিয়ে। এমন কি একটি নির্দোষ শিশুও যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা করে তাকে খুন করা হয়। কারণ এই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেই শিশুটির মুক্তি ও স্বর্গলাভ।

যেখানে এ-ধরনের একটি সামাজিক রাজনৈতিক-ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে সেখানে আমরা কী করতে পারি? যুক্তিতর্ক তুলব? ধন্না দেব? অনশন-ধর্মঘটে নামব? কৃচ্ছ্রসাধন করব?

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে বলেছেন—না, কোনোটাই নয়! তার বদলে সংগঠন গড়ে তোলো, যে-সংগঠনে থাকবে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী—শ্রমিক, চাষী আর সমাজ থেকে বিতাড়িত মানুষ। নাটকে তিনি এই মানুষদের সংগঠিত করে তুলেছেন এবং লাঠি হাতে নিয়ে তাদের নেতৃত্ব করছেন। তারা পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং লড়াই চালিয়ে তাকে ধূলিসাৎ ও নিঃশেষ করে। তারপর শুরু হয় নতুন করে গড়ে তোলার পালা।

এমন কি আক্রমণকারীদের সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ খানিকটা বাছ বিচার করেছেন। তিনি কখনো মনে করেননি যে গরীব ও পদানত হলেই আর কোনো কথা ওঠে না; যেহেতু তারা গরীব ও যেহেতু তারা অচ্ছুৎ অতএব শুধু এই কারণেই তারা লড়াইয়ে আগুয়ান হবে ও জয়লাভ করবে। গল্পে রবীন্দ্রনাথ যাদের লড়াইয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন তারা হচ্ছে এ-রাজ্যের লোহা-শ্রমিক। এই লোহা-শ্রমিকরা এসেছে একটি উপজাতি থেকে। অস্ত্র তৈরি করা, লোহা গলানো ও চাষ করাই এদের পেশা। উপজাতীয় ঐতিহ্য এদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। লড়াই করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ এদেরই বাছাই করেছেন। এই ঘটনার মধ্যে তাঁর কোনো গভীর চিন্তা নেই এমন কথা বলা চলে না। এই উপজাতীয় শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে তোমাদের কাজ কী, তখন তারা চমৎকার একটি গান গেয়ে ওঠে। এই গান শ্রমিকের গান আর এই গানের মধ্যে দিয়ে তারা বলে—

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।

অচল ছিল সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে ঘটনা পারম্পর্য উপস্থিত করেছেন তা নির্মম ও নিষ্করুণ। নাটকে রক্তপাত হচ্ছে, দেওয়াল ও প্রাসাদ ধ্বসে পড়ছে, লোহায় মোড়া মন্দির ধূলিসাৎ হচ্ছে—কোনো কিছুতেই তিনি সংকুচিত নন। প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতা যখন আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছে তখন রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী বাহিনীর একজন সৈন্য লোকটির গর্দান নেবার প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি অবশ্য কার্যকরী হয়নি। কিন্তু এতেই রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে অনেকে শিউরে উঠবেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে 'অচলায়তন' এমন একটি নাটক যা স্বকীয়তায় বিশিষ্ট এবং যার কোনো তুলনা নেই। নাটকটি যে অনূদিত ও অভিনীত হয়নি তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

তার মানে এই নয় যে নাটকটির কোনো দুর্বলতা বা বিচ্যুতি নেই। সমালোচকদের আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা বলেছেন তাতে কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টির সত্যিকারের সারমর্মটি ফুটে ওঠেনি। কাগজের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যখন সমালোচকদের জবাব দেন তখন সেই জবাবের মধ্যে অচলায়তনের বিপ্লবী লেখক রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তিনি হয়ে ওঠেন একজন ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, এই দার্শনিকটির সংগ্রাম কেবলমাত্র অমার্জিত হৃদয়হীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে; শুভবুদ্ধি প্রণোদিত ধর্ম ও ভাববাদকে বাঁচিয়ে রাখতে এই দার্শনিকটি খুবই আগ্রহী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সৃষ্ট এই নাটকটিকে ব্যক্তিগতভাবে কী চোখে দেখেছেন তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে-ভাবে বিচার করব তার ভিত্তি হবে কাগজের লেখা তাঁর প্রবন্ধ নয়, তাঁর নিজেরই লেখা নাটক ও নাটকের তন্নিবদ্ধ বাস্তবতা। এই বিচারে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিত রকমের নির্মম বিপ্লবী গণতন্ত্রী। শ্রমিক, রাষ্ট্র, ধর্ম, জনগণের ওপরে ধর্মের অত্যাচার আর এই অত্যাচারকে পর্যুদস্ত করার উপায়, ইত্যাদি সমস্ত কিছু সম্পর্কেই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারা আছে। এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজের যে-পরিচয় দিয়েছেন তা হচ্ছে অনুন্নত দেশের একজন সত্যিকারের বিপ্লবী বুর্জোয়া-গণতন্ত্রীর। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নাটকে যে-রাজ্যের ছবি পাওয়া যায় সেটি মোগল আমলের বা প্রাচীনকালের কোনো কাল্পনিক ঐতিহাসিক রাজ্য নয়। ছবিটি এতই স্পষ্ট যে আধুনিক সমাজকে সরাসরি এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে।

[ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, ২য় সংখ্যা, ১৯৫২]

দিকভ্রান্ত দেবদূত ॥ রনজি শাহানী

মানুষ হিসেবে ও শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের স্বরূপটি যদি জানতে হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে ঘন কুয়াশা তৈরি হয়েছে তা দূর করা দরকার। নইলে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খানিকটা মোহ ছাড়া আর কিছুই আমাদের প্রাপ্য হবে না।

এক সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকরা তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন মহান

দার্শনিক, মহান গূঢ়তত্ত্বজ্ঞানী, মহান নীতিবেত্তা, মহান ধর্ম-শিক্ষক, মহান শিল্পী, মহান সমস্ত কিছু। শুধু মহান নয়, অতীব মহান। আমরা জানি একদল জীবের মানুষের-মতো মুণ্ডু আছে, আরেক দল জীবের গোরুর-মতো ধড় আছে। কিন্তু আমাদের এই অতি রূঢ় ও বাস্তব জগতে মানুষের মতো মুণ্ডু ও গোরুর মতো ধড়বিশিষ্ট জীবের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কাছে যে-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে মনে হয় তিনি সিংহের মতো ধড় ও চিলের মতো মুণ্ডুবিশিষ্ট কাল্পনিক গ্রিফিন বা আসিরীয় ষণ্ডের চেয়েও অধিকতর অভিনব। তার মানে আমাদের বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন এক অতিকায় অসুরের আবির্ভাব হয়েছে যার গুণের ফিরিস্তি দিতে হলে শেক্‌স্‌পীয়র, সেণ্ট পল, লুথার, গ্যেটে ও হেগেলকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটি মানুষকে খাড়া করতে হবে।

অবশ্য এ-অবস্থা বেশি দিন চলেনি। ইংরেজের স্বভাবই নয় কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করা। কাজেই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেও খুব বেশি দেরি হল না। তখন শোনা যেতে লাগল যে কবি-সমাজের এই ফিনিক্স-মূর্তিটি আসলে তুলোয় ঠাসা একটা পেঁচা। ইংরেজ সমালোচকদের এই হচ্ছে রীতি—এই চুমু খাওয়া, এই ঘুষি মারা—ফলে গোটা ব্যাপারটাকেই প্রেমিক-প্রেমিকার কোন্দল বলে মনে হয়। যাই হোক, মোট কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের আর সেই মর্যাদা নেই এবং নামী নামী ইংরেজ পণ্ডিতরা ভারিক্কী চালে মাথা নেড়ে রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি বাতিল করে দিয়েছেন।...

ইংলণ্ডের একটি নাম-করা সাহিত্য-সাপ্তাহিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি লেখা বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে "রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন অনন্যসাধারণ, সুললিত ও অনায়াস-পটু কবি"। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এই মন্তব্যের মধ্যে প্রশংসার দিকটা সামান্য, নিন্দের দিকটাই ভারী। এমন কি ডেস্‌মণ্ড ম্যাকার্থির মতো সমালোচকও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন ভাষায় লেখেন যাতে বোঝা যায় তাঁর মনে সব সময়েই আতঙ্ক যে এই বুঝি তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসা করে ফেলছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ যাই হোন, শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ভারতীয়—কাজেই মাত্রা বজায় রেখে অল্পস্বল্প পিঠ-চাপড়ানোটাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট।...

আরেকজন ধুরন্ধর ইংরেজ সমালোচক হচ্ছেন ই. টমসন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা "কালানুসারী"। এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। মানুষের অন্যান্য সৃষ্টির মতো কবিতা কেন "কালানুসারী" হবে না? শেক্‌স্‌পীয়র কি কালানুসারী নন? নাকি তিনি এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত যা দেশ-কাল জোটের বাইরে? আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না। অন্তত বার্নার্ড শ' পড়ার পরে আমরা অনেক আগে থেকেই জেনে বসে আছি যে এই কবন্ধ যুগে আমাদের পিতৃব্যরা আর যাই করুন না কেন আমাদের জনকদের হত্যা করে জননীদের বিয়ে করতে যাবেন না। আমরা এও জানি যে আজকের দিনে যদি আমরা টাকা ধার করি তাহলে এই কবালা লিখে দিতে হয় না যে শরীরের মাংস কেটে তা শোধ করতে হবে। এ-ধরনের ঘটনা আজকাল আর ঘটে না। আমি আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি যা থেকে বোঝা যাবে যে অমর শেক্‌স্‌পীয়রও "কালানুসারী" ছিলেন। কেন থাকবেন না? হ্যাভ্‌লক এলিস বলেছিলেন যে "কোনো একটা দলিল তখনই আমাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে যখন তা কালানুসারী হয়।" ঠিক কথা। টমসন এই কথাটি ভুলে গিয়েছেন বলে মনে হয়।

অতীতের সংরক্ষিত রূপ

'ওয়ার্থার' আমাদের ভালো লাগে কারণ তা কালানুসারী। 'মাদাম বোভারি' আমাদের ভালো লাগে কারণ তা কালানুসারী। 'জনক ও জাতক' আমাদের ভালো লাগে কারণ তা কালানুসারী।...এ-সবের মধ্যে আমরা

কালের ছবি পাই, যে-কাল গত হয়েছে। কালের ছবি বলেই কি আমরা আপত্তি করব? না, বরং তার উল্‌টো, যে সৃষ্টিশীল চেতনা থেকে কালের এই ছবি পাওয়া গিয়েছে, যাকে বলা চলে অতীতের সংরক্ষিত রূপ, যা আমাদের নাড়া দেয়, তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাই যদি হয় তাহলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই কালানুসারী হওয়াটা অপরাধ বলে গণ্য হবে কেন? কিংবা টমসন হয়তো এ-কথাই বলতে চেয়েছেন যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনাতেও এমন সারবস্তু খুবই কম যার স্থায়ী মূল্য আছে। তাই যদি হয় তবে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আমি শুধু বাড়তি কথা এটুকুই যোগ করতে চাই যে সাম্প্রতিক কালে কোনো কবি—ইয়েট্‌স্‌কে বাদ দিয়ে বলছি না—যদি এমন কিছু লিখে থাকেন যার স্থায়ী মূল্য আছে তাহলে রবীন্দ্রনাথকেও সেই দলে ধরতে হবে, তিনি কারও চেয়ে কম নন।

রবীন্দ্রনাথের দোষ-ত্রুটির দিক আমার খুব ভালোভাবেই জানা। কাজেই এ-বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। এতে তাঁর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস হবে না কিন্তু লাভ হবে এই যে আমরা ধুলোর মধ্যে থেকে সোনাটুকু বাছাই করে নিতে পারব।…

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি আছে যে তিনি মস্ত দার্শনিক। প্রথমে এ-বিষয়েই কিছুটা আলোচনা সেরে নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক-খ্যাতিটা একেবারেই ভুয়ো, তিনি এমন কি মননশীলতার পরিচয়ও দিতে পারেননি। তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে চিরাচরিত ভারতীয় রীতিতে খানিকটা দার্শনিকতা করা। সাধনা ইত্যাদি রচনায় আমরা যা পাই তা হচ্ছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মগ্রন্থ থেকে টুকরো-টাকরা আলোচনা। আবছা সৌন্দর্যের মতো এসব আলোচনা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে। আমার মনে হয়, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও এই একই কারণে বিপথ-চালিত হয়েছেন নইলে তিনি কক্ষনো 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন' নামে একটি বই লিখতেন না। এ-কথা সত্যি যে সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন "মস্ত দার্শনিক"। তবে অ্যাণ্ড্রুজ হচ্ছেন অ্যাণ্ড্রুজ, একজন ভালো মানুষ, মহৎ মানুষও বটে। কিন্তু তিনি প্রায়ই সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদকে ভুল করে মনে করতেন ঝিকিমিকি তারা। না, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই অভিযোগ করা চলে না যে তিনি মৌলিক হবার চেষ্টায় উদ্ভট হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা নতুন কোনো বিশ্বতত্ত্ব পাইনি, নতুন কোনো চিন্তাধারা নয়, যা এমনই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও এমনই সুসংহত যে আমাদের প্রীত করবে।…সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ চিন্তার নামে খেলা করেছেন আর তা করতে গিয়ে যখনই তিনি এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছেন যার পরে আর এগিয়ে যাওয়া চলে না তখনই তিনি ভাবালুতায় ঝাঁপ দিয়েছেন এবং তার ফলে তাঁর সমস্ত চিন্তা বরবাদ হয়ে গিয়েছে।

ভাসা-ভাসা জ্ঞান

এমন কি তাঁর কবিতার মধ্যেও আমরা এমন কিছু পাই না যা থেকে বলতে পারি যে ধ্যানবস্তুকে তিনি আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। কথাটার মানে এই দাঁড়ায় যে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্ম-দর্শনের কবি ছিলেন না। তাহলে 'গীতাঞ্জলি' বা 'মালিনী' সম্পর্কে আমরা কি বলব? আমার বক্তব্য এই যে এই দুটি রচনাতেও আমরা ভারতীয় জ্ঞানের ভাসা-ভাসা পরিচয় পাই মাত্র। অপরের কাঁধে পা দিয়ে তিনি বিশ্ব দর্শন করেছেন। বা, অন্য ভাষায় বলা চলে, তিনি আমাদের জন্যে উপাচার সাজিয়েছেন ভারতীয় চিন্তাশীল ও দ্রষ্টাদের রমণীয় কিন্তু বিস্মৃত মালঞ্চ থেকে টুকরো-টাকরা আহরণ করে। আর এমন কৌশলের সঙ্গে আর এমন

সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন যে আমাদের মনে হচ্ছে, আনকোরা নতুন আর চমকে ওঠার মতো গোটা একটা কিছু আমরা পাচ্ছি। আসলে উৎকর্ষ বলতে আমরা কী বুঝি? সার্জ মূর বলেছেন যে গণ্ডি সম্পর্কে সচেতন থাকা আর সেইটুকুকেই পুরোপুরি কাজে লাগানো—এই হচ্ছে উৎকর্ষ। কথাটা সত্য। কিন্তু আমরা যেন গণ্ডিবদ্ধ তৎপরতার সঙ্গে মৌলিক ক্ষমতাকে গুলিয়ে না ফেলি।

রবীন্দ্রনাথকে মরমী আখ্যা দেওয়া হয়।···কিন্তু তাঁর প্রাণচাঞ্চল্য এত বেশি ছিল যে বিজ্ঞতার নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর অনুভূতি ছিল এত সূক্ষ্ম যে মাঝে মাঝে নিঃশব্দের অনুচ্চারিত বাণী শোনাটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাই বলে তাঁকে কিছুতেই মরমী আখ্যা দেওয়া চলে না।···

নীতিবেত্তা ও ধর্ম-শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কি কিছু বলা দরকার? এ-আলোচনার কোনো শেষ নেই। কাজেই সংক্ষেপে দু-একটি মন্তব্য করছি মাত্র। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথের নীতিগত ও ধর্মগত বিশ্বাসগুলি গভীর আন্তরিকতায় প্রতিষ্ঠিত। শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্বাস নিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর মানসিকতা। কাজেই তাঁর পক্ষে এই বিশ্বাসগুলি ছিল খুবই খাঁটি এবং তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। এমন কি এ কথা বললেও ভুল বলা হবে না যে এই বিশ্বাসগুলি তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। অবশ্য বাবা ও ঠাকুর্দার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব যে একটা একাত্মতা আছে তা নয়। কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছিলেন বাবা ও ঠাকুর্দার উদার ও উদাত্ত মতাদর্শের পরিমণ্ডলে। রবীন্দ্রনাথ যে বাবা ও ঠাকুর্দাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু তবুও তাঁর মধ্যে কোথাও এমন কিছু নেই যাতে বলা চলে যে অতীতের সঙ্গে তাঁর আচমকা সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে।······

কিন্তু এত সব কথা বলার পরেও বলতে হয়, সাহিত্যের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কী? এই দর্শন, মরমীবাদ, নীতিবোধ, ধর্মগত বিশ্বাস বা এ-ধরনের আরো সব ব্যাপারের? কোনো সম্পর্কই নেই। তবুও যে আমি এতসব আলোচনা তুললাম তার কারণ হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ আমাকে তাঁর বন্ধু বলেই মনে করতেন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁকে ঘিরে সমালোচকরা যে মাকড়সার জাল বুনেছেন তা কেউ একজন এসে পরিষ্কার করুক।······

কাজেই শেষ পর্যন্ত আমার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সৃজনশীল শিল্পী। তিনি যে অনেক মহৎ ও বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন তা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু মুশ্‌কিল বাধে তখনই যখন তাঁর সাহিত্যকে সত্যিকারের যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে এবং তার সত্যিকারের তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা করতে হয়।······

একটি বা দুটি বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি একঘেয়ে, সোচ্চার ও বাঁধুনির দিক থেকে দুর্বল। জীবনের হাওয়াও সেখানে খুবই কম। সবই সত্যি। কিন্তু মাঝে মাঝে এই নাটকগুলিতেই এমন এক আলোর উদ্ভাস পাওয়া যায় যা অনেকটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। আমরা এমন এক বাস্তবতার সাক্ষাৎ পাই যা পাশ্চাত্য নাট্যকারদের স্বপ্নেরও অগোচর।······

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে সত্যিকারের সৃজনশীল হাতের ছোঁয়া পাওয়া যায় না; একমাত্র 'গোরা' বাদে, যা উপন্যাস হিসেবে অদ্ভুত সুন্দর। চরিত্রগুলিতে জীবনের সেই উল্লসিত প্রকাশ নেই, যেমনটি হতে পারে যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়া লেগে।······কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সবই বাতিলের পর্যায়ে চলে গিয়েছে এমন কথা

বলা চলে না। আমরা এমন সব চিন্তা ও অনুভূতির সাক্ষাৎ পাই যা থর-থর পদ্মপাতার ওপরে শিশির বিন্দুর মতো ঝকমক করে ওঠে। কিন্তু তবুও স্বীকার করতে হবে যে উপন্যাসগুলি এমন নয় যার মধ্যে জৈবিক সমগ্রতা আছে, জীবনের গভীর অন্তঃস্থল থেকে যা উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যেন এক গুচ্ছ ছিঁড়ে আনা ফুল যার মধ্যে আলো আর রৌদ্র ঠাসা রয়েছে।......

এবারে রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ দিকটি নিয়ে আলোচনা তোলা যেতে পারে যে-জন্যে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। আমি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কথা বলছি। কয়েকটি গল্প তো একেবারে নিখুঁত ও পুরোপুরি পাকা হাতের লেখা। ইংরেজি সাহিত্যেও এমনটি নেই। অনুভূতির পেলবতা, ভাবের ঐকতান, ভাষার যাদু, মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রাকৃতিক জগতের সামান্যতম বিশিষ্টতা সম্পর্কে সচেতনতা, এবং সৃষ্টির অন্তর্নিহিত একাত্মতা সম্পর্কে উপলব্ধি—এই সমস্ত গুণই তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্পগুলির মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে জীবনের সমারোহপূর্ণ উৎসব বলে মনে হয় যেখানে সমস্ত কিছু সতেজ ভাবে বেঁচে রয়েছে ও যথাযোগ্য অংশ নিচ্ছে। যেমন, গাঁয়ের নির্জন কুঁড়েঘর, পরপর শীতের ঠাণ্ডায় মার খাওয়া বিধবার মতো গাছ, বাগানের ফুল, এমন কি নুড়ি আর পাথর, এবং আরো কত কি।

গোড়ার দিকের একটি প্রচেষ্টা

গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের একটি প্রচেষ্টা 'ঘাটের কথা'। এটি একটি সেরা জাতের গল্প, যে কোনো সাহিত্যে। সংক্ষেপে বিবৃত করে এই গল্পের আশ্চর্য যাদুকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গল্পটির রস অনুভব করতে হলে পড়তে হবে।... ..

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পকে বলা চলে বিশ্ব-সাহিত্যে স্মরণীয় অবদান। এমন কি, আমার তো মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এই গল্পগুলির জন্যেই রবীন্দ্রনাথ খ্যাতিমান হয়ে থাকবেন। কারণ এই গল্পগুলি অনুবাদ করা চলে। পাঠকরা এমন কয়েকটি গল্পেরও সন্ধান পাবেন যা চেখভ বা মোপাসাঁর যে-কোনো গল্পের চেয়ে চমৎকার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনায় যদি আসতে হয় তাহলে আগের কথাই আমি আরেক বার বলব। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বা মালিনী আমার বিশেষ পছন্দ নয়। অবশ্যই এই দুটি কবিতার বইতেও কিছু কিছু হীরামুক্তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মোটের ওপর এখানে এমন সব জিনিসই রয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ভিক্টোরীয় ইংরেজদের মনে সাড়া জাগাতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার সন্ধান পাওয়া যাবে আরো আগেকার যুগে লেখা কড়ি ও কোমল বইয়ে। এই চমৎকার লিরিক কবিতার বইটি তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের রচনা।...এই কবিতাগুলোতে জীবনের রস কানায় কানায় ভরে উঠেছে আর তা ফুলে ফেঁপে উঠেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

তারপরে নব্বই শতকের শেষদিকে আমাদের হাতে 'মানসী' নামে আরেকটি বই এসেছে। এই কবিতাগুলি সৃজনশীল উল্লাসের চড়া সুরে বাঁধা। এখানে প্রেমের রক্তিম আলোকে ধারণ করেছে রুক্ষ ও কঠোর চিন্তা। কবির মানসিকতায় যা ছিল বিক্ষোভ তা এখানে ফেটে পড়েছে বিদ্রোহে ও বিপ্লবে।...

তারপরে রবীন্দ্রনাথ বইয়ের পর বই লিখেছেন। লিখেছেন গল্প, ছোটদের জন্যে ছড়া ও আরো অনেক কিছু। লিখেছেন বলাকার মতো লিরিক কবিতার বইও, যা টমসনের মতে "রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত হলেন। নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনি। পেলেন স্যার খেতাব। মানুষজন তাঁকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল—মধুভাণ্ডকে যেমন ছেঁকে ধরে মাছির পাল। তারপরে, তারপরে, কি আর বলব, কি যেন একটা ঘটে গেল। রবীন্দ্রনাথের ধরনধারন পাল্‌টে গেল আচমকা। এবং তার চেয়েও দুঃখের কথা, তাঁর লেখার মানও আর আগেকার মতো রইল না। তাঁর হিতৈষীরা এ-ঘটনায় খুবই মর্মাহত হলেন। অবশ্য তখনো তাঁর লেখার স্টাইল আগেকার মতোই চমৎকার কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে যেন একটা অবসাদ এসে গিয়েছে। মৌলিকত্বের দিক থেকে, আস্বাদনের তীব্রতার দিক থেকে এ যেন অনেকটা সেই ধরনের লেখা যা সাধারণত লিখে থাকেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা বা উচ্চ সম্মানে ভূষিত ক্লান্ত ইংরেজ কবিরা।

রবীন্দ্রনাথ কি "চাচা আপন বাঁচা" রীতি অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ, প্রতিভাকে খুশিমতো সাজ পরিয়ে এমন চেহারায় হাজির করছেন যা দেখে অন্যদের মনে হবে যে এমনটিই হওয়া উচিত ছিল। সত্যিই বোধ হয় তাই। নইলে যাঁর কলম থেকে এককালে এমন সব নিটোল ও পরিপূর্ণ লেখা বেরিয়েছে, যাঁর লিরিক-কাব্য ভরতপাখির মতো উঁচু আকাশে ডানা মেলেছে, যাঁর কবিতা নাইটিংগেলের চেয়েও চড়া উল্লাসে ফেটে পড়েছিল—সেই তিনি আশ্রয় করেছেন ঠাটসর্বস্ব শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর।···

এই হচ্ছে নিকৃষ্ট দিকের রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শুধু এই একটি দিক থেকেই তাঁকে বিচার করতে যাব কেন? আমরা শুধু এ-জন্যে খানিকটা খেদ জানিয়েই সরে আসব। কোথায়? সরে আসব সেইখানে যেখানে রবীন্দ্রনাথ অমর। কারণ এ কথা তো ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যতো সমালোচনাই থাকুক না কেন, সবকিছুর পরেও স্বীকার করতে হবে যে তিনি একজন মহৎ ও সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন শিল্পী। সম্ভবত, আমাদের যুগের মহত্তম ও সবচেয়ে বেশি সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন শিল্পী।

[স্টেটসম্যান, ১৭ই ফেব্রুআরি, ১৯৫২]

সূর্যাবর্ত ॥ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই, এমনকি তাঁর বাণী ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হলেও কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সাফল্য যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। অন্ততপক্ষে স্বকীয় মনীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুজ্জ্বল নয়, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত; এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ সাহিত্যের মূলধন।

অবশ্য মানুষের মর্মানুসন্ধানে বিদেশী পরকলাই সাম্প্রতিকদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনও নিশ্চয় রৈবিক উপক্রমণিকার নিয়ম মানে; এবং তাঁর শালীন মাত্রাজ্ঞান বর্তমান প্রগতিবিলাসীদের যতই অস্বাভাবিক ঠেকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদই ইদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যপদেশ। সুতরাং, অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রণীরা যে সার্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং আমরা সকলে যেহেতু সেই প্রবাহেরই বুদ্বুদ, তাই আমাদের পক্ষে তার গতি-অগতির বিচার অথবা উপকার-অপকারের আলোচনা শুধু অশোভন নয়, দুষ্করও।

কেননা, আধিদৈবিক শ্রেয়োবোধ তো দূরের কথা, আধুনিক বিজ্ঞান বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিতেও আস্থা খুইয়েছে; সমাজতত্ত্ব এখনও পুরোপুরি যন্ত্রবাদে না পৌছাক, মানুষমাত্রেই যে অভ্যাসের দাস, তাতে ভাবুকদের আর সন্দেহ নেই; এবং তথাকথিত তুলামূল্য যেকালে অনুশীলনেরই নামান্তর, তখন আজকালকার বাংলায় জন্মে রবীন্দ্রপ্রতিভার যাচাই করা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো। তাহলেও রবীন্দ্রনাথ ও উপর্যুক্ত সংস্কৃতি-ধারার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ, এবং সম্প্রতি কোনও এক বাঙালী কবি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে সমীকরণ উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষা।

সাধারণত অপাঠ্য হলেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি অন্ততপক্ষে প্রাঙ্‌মোগল যুগে; এবং প্রাদেশিকতার প্রকোপে এই অঞ্চল যদিও সর্বদা আর্যাবর্তের বহির্ভূত থেকেছে, তবু অনার্য আর অসভ্য চিরদিন ভিন্নার্থ-বাচক। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় প্রাণসামগ্রীর উৎপাদক বলতে আমার ইতিহাসবোধে বাধে; এবং যখন অলংকার নির্মাণের তাগিদে আমিও তাঁর প্রতিরূপ খুঁজি, তখন আমার মানসচক্ষে গোমুখী গিরিরাজের চিরন্তন চিত্র ভেসে আসে না, ফুটে ওঠে কোনও কাল্পনিক শৈলশৃঙ্গের অবিচ্ছিন্ন ছবি, যা হয়তো নগাধিরাজের মতোই শাশ্বত ও সমুচ্চ, কিন্তু যার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমভূমির সম্পর্ক নিতান্ত আপতিক, গঙ্গাকে যে জটার জালে জড়িয়ে রাখে না, পায়ের আঘাতে নূতন পথে চালায়।

তথাচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিলেন একা অ্যারিস্টটল্‌-এর ভগবান। তিনি ছাড়া আর সকলে পরজীবী; এবং

তাঁকে বাদ দিলে অন্য কারও পক্ষে নিছক আত্মচিন্তায় কালাতিপাত সম্ভব নয়। সেই জন্যে পরিচ্ছিন্ন পাহাড়ের নিচেও পদাশ্রিত স্রোতস্বিনীর স্বেদবিন্দু জমে, প্রতিবেশী শষ্পে তার সানুদেশ জড়ায়, এবং যে অবধি দৈবিক উৎপাত আশপাশের সমতলে ধ্বংস ছড়ায়, তাতেই ঘটে তার বৃদ্ধি। অতএব যাঁরা ভাবেন যে, রৈবিক কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব রসধারা অন্তঃসলিলা, তাঁদের অনুমান যেমন নির্ভুল, তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে যাঁরা ওয়ার্ডসওয়র্থী চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব দেখেন তাঁরাও মতিভ্রান্ত নন; এবং উভয় সিদ্ধান্তই শুধু আংশিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনও পক্ষ তাঁর সমগ্র সত্তার সাক্ষাৎ পাননি।

তবে ব্যক্তিস্বরূপ যতই অসংযুক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে অতিমর্ত্যের কোনও সম্বন্ধ নেই; এবং রৈবিক ব্যক্তিস্বরূপ যে ধাতুসমূহে গঠিত, তার প্রত্যেকটা যদিচ তন্মাত্র পদবাচ্য, তবু উপাদানের গুণে তিনি আমাদের থেকে স্বতন্ত্র নন, পানের জোরেই তিনি সাধারণ ভঙ্গুরতা কাটিয়ে উঠেছেন। ফলত, আমাদের মতো কালস্রোতের বুদ্বুদও রবীন্দ্রনাথের মূল্য-বিচারে একেবারে অপারগ নয়, শুধু অনেকখানি প্রতিবদ্ধ; এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা প্রাক্তন সাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু দার্শনিকদের মতে ভাব ও অভাব যেহেতু একই সত্যের এ-দিক আর ও-দিক, তাই আমাদের স্বভাবে যা নেই, তা জানলেই আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝব।

বলাই বাহুল্য যে, উল্লিখিত উপমাসঙ্করে বৈদান্তিক নেতিবাদের সংস্পর্শ নেই; এবং রহস্যঘনতা যেমন সকলের মতেই ব্যক্তিস্বরূপের প্রধান লক্ষণ, তেমনি সেই কৈবল্য যে সকল বিসংবাদের তীর্থসঙ্গম, এ-বিশ্বাসও অনেকের বিবেচনায় অন্যায়। সুতরাং ভনিতা বাদে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, প্রামাণ্যস্তাবক প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন বুঝেছিলেন; এবং এই আত্মনিষ্ঠা তাঁকে জাতিচ্যুত করে আন্তর্জাতিক লেখকমণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিল। পক্ষান্তরে উক্ত স্বাধিকারবোধ থাকলেই মহাকবির মর্যাদা মেলে না, তার জন্য আরও পাঁচটা গুণের সঙ্গে একটা নিরুপাধিক ঐশী ক্ষমতাও অপরিহার্য। তাছাড়া রাসীন্ থেকে ল্যাণ্ডর পর্যন্ত কাব্যরচয়িতাদের ধ্রুপদী উৎকর্ষে যার আস্থা আছে, তার কাছে পরোক্ষ অনুভূতি শুধু মহার্ঘ্য নয়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হয়তো প্রত্যক্ষকে এড়িয়েই চলে। কিন্তু অতিবুদ্ধি শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলে কূপমণ্ডুকের অনীহা প্রসংশনীয় নয়; এবং সঙ্গীতজ্ঞ না হওয়াতে আমি যদিও অবগত নই যে এই কীর্তনের জন্মভূমিতে রাগ-রাগিণীর শুচিবায়ু কতটা প্রবল তবু আমাদের কাব্যপ্রচেষ্টা যে চিরকাল বর্ণাশ্রমের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে পথ চলেছে, তাতে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে ভাষ্য প্রণয়ন হিন্দুস্থানের সনাতন অভ্যাস; এবং দূরত্ববশত বেদ বেদান্তের টীকা টিপ্পনী আর আমাদের টানে না বটে, কিন্তু যুগধর্মের তাগিদেও আপন চোখ-কানের ব্যবহার আমরা আজ অবধি শিখিনি।

তার অপ্রমাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ওয়াটসনী মনোবিজ্ঞানে যাঁরা ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, একবার ভারতবর্ষে বেড়িয়ে গেলে, নিশ্চয়ই তাঁরা মত পরিবর্তন করতেন; এবং তার পরেও হয়তো প্রথাপ্রবণ মানুষকে কলের পুতুলের পর্যায়ে ফেলা চলত না, কিন্তু বোঝা যেত যে গুরুদীক্ষা সত্যই অঘটনসংঘটনপটীয়সী, অন্তত তার ফলে জীব ও জড়ের অদ্বৈত ঘটে। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য আর প্রথার মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বৈষম্যই হয়তো বেশি; এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তি যেমন জাতির নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারে, তেমনি জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্মে। কিন্তু নাৎসী মতবাদে আস্থা খুইয়েও জাতিরূপের উপলব্ধি যদি বা সম্ভবপর হয়, তবু অন্তত রোজর বেকন-এর যুগ থেকে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎকারে দার্শনিক মাত্রেই বৈকল্য কুড়িয়েছেন।

তাহলেও প্রত্যয় হিসাবে বিশ্বমানবের মূল্য প্রায় অপরিসীম; এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমানায় তার সাক্ষ্য না মিললেও, কার্যত সোহংবাদী সুদ্ধ এই অনেকান্ত মানবজাতির স্বভাবগত সাম্যে নিঃসংশয়। সেই জন্যে পাঁচ হাজার বৎসর ধরে নির্বিকার অধিকারভেদে বেড়ে উঠেও আমরা এখনও ভাবি যে অনুরূপ অবস্থায় বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটে, এবং শিক্ষা ও প্রতিবন্ধকের তারতম্যেই বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায় না। এই কথাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে গতানুগতিক প্রথাই শ্রেণী-সংঘর্ষের জনক ও প্রাদেশিকতার উদ্যোক্তা; এবং মানুষ যেখানে তার স্বতন্ত্র সত্তা ও সহজ প্রবৃত্তি, তার নিজস্ব স্বার্থ ও প্রাক্তন পুরুষকার সংঘর্ষকীর্ণ সমাজের তত্ত্বাবধানে সঁপে দেয়নি, সেখানে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল অলীক স্বপ্নমাত্র নয়, সেখানে সদ্ভাব স্বাভাবিক ও শাসন অনাবশ্যক; সেখানে চিরাচার মৃত, কিন্তু ঐতিহ্য প্ররোহী।

কারণ, ভূপঞ্জরবিস্তার বিচারে মানুষের মধ্যে স্তরভেদ অবর্তমান; চামড়ার রঙে ভাষার প্রয়োজনে, ভৌগোলিক তাগিদে আমরা আপাতত যত বিবাদই বাধাই না, তবু আমাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকার এক ও অভিন্ন; এবং সেই বিশ্বস্ত ও বহুপরীক্ষিত অধিকর্মার উপরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভার চাপালে, আমাদের সংসারযাত্রাই অবাধে চলবে না, ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতও হয়তো নির্বিকল্পের নির্দেশে নির্দ্বন্দ্ব হবে। সম্ভবত সেই জন্যে ব্যক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বমানবের উদ্বোধন অসঙ্গত নয়, আবশ্যিক। কিন্তু ভূতত্ত্ব নূতন বিজ্ঞান; এবং এ-দেশে সভ্য মানুষের বাস অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর ধরে। উপরন্তু অন্যূন তিন হাজার বৎসর যাবৎ পরদেশী বিজেতা পরম্পরার পদান্তে পড়ে আদিম ভারতবর্ষ অনবরত স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখেছে।

এ-অবস্থায়, এই রাজনৈতিক নিগ্রহের চাপে, প্রস্তরিত প্রথার অপর্যাপ্তি কেবল প্রত্যাশিতই নয়, অনিবার্যও; এবং বাঙালী কবিকিশোরদের কাছে সত্যটা যতই অপ্রীতিকর ঠেকুক, তবু সাহিত্য যেকালে সমগ্র জীবনের ভগ্নাংশমাত্র, তখন আমাদের মজ্জাগত জাড্য সাহিত্যেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যে-জাতি একদিন কোমর বেঁধে নিরুক্তের নির্দেশমতো একটা সাধুভাষা বানিয়ে, অলংকারশাস্ত্রের উদাহরণ হিসাবে এতগুলো বিরাট কাব্য লিখে গেছে, আধুনিক বাঙালী হয়তো তাদের বংশধর নয়; কিন্তু বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃতেরই উঞ্ছজীবী, এবং খ্রীষ্টপূর্ব সংস্কৃত কবিদের মতো বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকদের উপজীব্যও উদ্বৃত্ত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এতবড়ো লেখকের এতদিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারিনি, তাঁর স্বাবলম্বনের দিকে না তাকিয়ে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অসংখ্য সাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেছে। অগত্যা বাঙালী পাঠক আজ ভুলতে বসেছে যে বাংলার ইতিহাসে "মানসী"ই অপূর্ব নয়, "গীতাঞ্জলী"তে মধ্য-যুগীয় ভক্তিসাধকদের প্রতিধ্বনিও অনুরূপ অনুভূতির আবশ্যিক অভিব্যক্তি; এবং যে কালে "বলাকা"-র পুনরাবৃত্তিতে এখনও তার কান ফাটেনি, তখন বৈবিক গদ্য-কবিতার অনর্গল অনুলিপিকেও সে শেষ পর্যন্ত কাব্য বলে মেনে নেবে। অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের সৌরমণ্ডলে ধূমকেতুর প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং স্থানীয় গ্রহপতিদের গতিবিধি আমরা এমন অভিনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য করেছি যে তাঁদের প্রত্যেক বিকীরণ আমাদের নখদর্পণে, প্রত্যেক অপচার প্রত্যাশিত। অধিকন্তু এ-বৈধতা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্ন নয়, আমাদের অর্বাচীন সাহিত্যও নিয়মাধীন।

এ-দেশে কবিযশঃপ্রার্থীরা যে-গুণের জোরে নাম কেনেন, তাঁরই অভ্যাসে তাঁদের সারাজীবন কাটে; এবং কাব্য যে রসবৈচিত্র্য ব্যতীত বাঁচে না, তা বোধ হয় তাঁদের অবিদিত। অথচ বাঙালী ভাবে সে কলা-

লক্ষ্মীর বরপুত্র; তার কাছে রূপ যেহেতু রৌপ্যের চেয়ে মহার্ঘ্য, তাই সরকারী পরীক্ষাগুলোয় মাদ্রাজীর সাফল্য তাকে টলাতে পারে না; এবং স্বদেশী বাণিজ্যে মারোয়াড়ীর একাধিপত্য সে নীরবে সয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ প্রায় সর্বত্র অহৈতুকী; এবং বাংলা অভিধানে বৈদগ্ধ্য আর ভাবালুতা যদি সমার্থবাচক না হয়, তবে আমাদের রসজ্ঞান নিশ্চয়ই কিংবদন্তীমাত্র। আমরা অন্তত পাঁচ-শ বছর ধরে কবিতা লিখছি; কিন্তু জন-তিন-চার সর্ববাদিসম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে, আমাদের ভাণ্ডারে যা বাকি থাকে, তাতে সাহিত্যামোদীর লোভ ততটা নেই, যতটা লাভ মসলা-বিক্রেতার।

আধুনিক বাঙালীর কথা জানি না; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি যাদের কলম থেকে বেরিয়েছিল, তারা কল্পনার শোচনীয় অভাবকে উদ্‌ভাবনার আতিশয্যে ঢাকা দেবার প্রয়াস পর্যন্ত পায়নি; একাদিক্রমে পূর্ববর্তীর অনুলাপ পরবর্তী পুনরুক্তির উপাদান যুগিয়েছে। ফলে আমাদের অধ্যাত্ম কবিতায় আত্মসমর্পণ বা অমৃতপিপাসা নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি; আমাদের নিসর্গকাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে কেবল কুসংস্কার ও নির্দন্ধাতিশয্য; আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগ্‌বাহুল্য। এই গেল বাংলার কবিকাহিনী; এবং যদি সাহিত্যেও ব্যবসায়িক টান-যোগানের বিধান খাটে, তবে প্রতিধ্বনিপ্রীতি বাঙালী পাঠকের তো বটেই, এমনকি বাঙালী সমালোচকদেরও মজ্জাগত।

হয়তো সেই জন্যে আমাদের বাইরন্-বিলাসী অগ্রজেরা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি বলতে দ্বিধা করেননি, এবং আমাদের রবীন্দ্রপ্রভাবিত সমসাময়িকেরা সাহিত্যের সীমা-সম্বন্ধে অতটা উন্মুখর। রবীন্দ্র প্রতিভার ঐকান্তিক মহত্ত্বে এক-আধজন আধুনিক লেখকের আস্থা বরঞ্চ এঁদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি; এবং সাহিত্যের মাত্রা না মানলেও, আত্মশক্তির পরিমিতি সকল স্রষ্টাই হাড়ে হাড়ে বোঝেন। ফলে আমাদের কাব্য রচয়িতারা কাব্য বিবেচকদের মতো কালাতীতের উপাসক নন, তাঁদের যেহেতু ইতিহাস-জ্ঞান আছে, তাই তাঁরা জানেন যে বাইরন্-এর মতো গৌণ কবির অনুকরণ যখন অত শক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্য কবির পদানুসরণ একেবারে অনর্থক।

অতএব সনাতনী বেতসীবৃত্তিকে তাঁরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন; প্রচলিত ঠাটে মানসীমূর্তির পুনর্নির্মাণ তাঁদের অনভিপ্রেত; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রযুক্ত আত্মবিজ্ঞাপনে, আত্মনিবেদনে নয়। পক্ষান্তরে সাহিত্যের মাত্রা যেমন অনিশ্চিত, তার ধর্ম তেমনই সুবিদিত; এবং স্বতঃসিদ্ধি গণিতের ভিত্তি হলেও, শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পরিণামী চিৎপ্রকর্ষ। সেই জন্যে কবিদের বেলা রোমন্থন যত না গর্হিত, স্বয়ম্ভূতি ততোধিক অভাবনীয়; এবং মার্লোর সঙ্গে শেকস্পীয়র-এর কার্য-কারণ-সম্বন্ধ মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বর্তমান। কিন্তু এই আর্য সত্যটাকে আমাদের তথাকথিত তরুণ সম্প্রদায় কাজেই স্বীকার করেন, কথায় আমল দেন না; এবং তাঁদের রচনারীতি রাবীন্দ্রিক কলরোলে অনুরণিত বটে, কিন্তু তাঁদের মনোভাবে অধমর্ণোচিত বিনয় নেই।

তাই বলে তাঁরা নিন্দনীয় নন; এখানেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই অনুকারী। বরং এ-বিষয়ে তাঁদের মৌনিতা তার চেয়ে বেশি শোভন। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখন সাধারণের সম্পত্তি, আমাদের মাতৃভাষার আজ আর কোনও পৃথক সত্তা নেই; এবং সেই জন্যে তাঁর সম্মোহ কাটাবার চেষ্টায় অনেকে যদিও বদ্ধপরিকর তবু আত্মরক্ষার উপায় তাঁদের জানা নেই। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলেও, ইচ্ছার যে অন্ত নেই, এইটাই বর্তমান বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা; এবং ঐতিহ্য ব্যতিরেকে সাহিত্যসেবা সম্ভব হোক বা না হোক,

নির্বিকার ঐতিহ্য শুধু চিরাচারের নামান্তর, যার পাষাণপুরীতে কারুকর্মীই সমাদৃত, রূপকারের যাতায়াত নেই। সুতরাং সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্বতকাম্য; এবং তার মধ্যে বিপ্লবের পরিমাণ নগণ্য বটে, কিন্তু তার বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

অর্থাৎ আধুনিকেরা যদিও প্রায়ই ভুলে যান যে ব্যক্তিস্বরূপের অভাব কোনও দিন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে না, তবু উত্তররৈবিক ছায়ানুবর্তিতায় কাকজ্যোৎস্না জাগিয়েছেন তাঁরাই, আমাদের নিরিন্দ্রিয় নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ হয়েছে তাঁদেরই নির্দেশে। তাই শুধু সাধনার বিচারে আমাদের নূতন লেখকদের আমি অত্যাধুনিক ইংরাজ কবি অডেন বা স্পেণ্ডর বা ডে লুইস্-এর সমপাঙ্‌ক্তেয় মনে করি; এবং সিদ্ধিতে, অথবা লোকমতে, এই বিদেশীরা আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থাকলেও, সে জন্যে হয়তো ভারতের ভাগ্যবিধাতাই দায়ী। হয়তো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমে সুকর; হয়তো সেখানকার আত্মনিষ্ঠ সমাজ স্বকীয়তার মূল্য দিতে জানে; হয়তো ইংরাজি সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ ফল্গুর মতো প্রেততর্পণের মরুতীর্থ নয় বলে, উর্বরতা সেখানে উৎসের চারপাশেই ধরা পড়ে না, নদীসংলগ্ন শ্মশানও সেদেশে শ্যামল।

তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রাপসারণ আর সংস্কারমুক্তি এক নয়; এবং প্রকৃত কবিমাত্রেই যদিচ প্রথম প্রকরণে অভ্যস্ত, তবু দ্বিতীয় অবস্থার অধিকারী শুধু তথাগতেরা। এ-কথা আধুনিক বাংলার একাধিক কবি হয়তো জানেন; এবং সেইজন্যে তাঁরা পুনর্বাদেরই প্রতিকূল, অনাসৃষ্টির চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত নন। উপরন্তু সে-প্রয়াস নিতান্ত নিরর্থক; এবং আমাদের বস্তুজ্ঞান তো সাধারণ্যের অন্তর্গত বটেই, এমনকি আমাদের ভাষাও সার্বজনীন, তার মারফতে আত্মোপব্ধির অভিব্যক্তি স্বতই অসম্ভব। তবে কবিরা অন্যদের চেয়ে আত্মচেতন; এবং নিজগুণে না হোক, আঠারো শতকের শেষ থেকে তাঁদের স্বকীয়তা সম্বন্ধে পশ্চিমে যে-জনশ্রুতি চলে আসছে, অন্তত তার শাসনে তাঁরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থও। অতএব তাঁদের জাতি ব্যবসায়ে আর সামবায়িক সংকল্পের প্রাদুর্ভাব নেই; তাঁরাও আজকাল স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী।

তবু কবি-জীবন কাব্যের চেয়ে ব্যাপক; এবং আমাদের ভাবে যতই মৌলিকতা থাকুক না কেন, স্বভাবে আমরা নিতান্ত নির্বিশেষ। অগত্যা বাংলা কাব্যের নব্যতন্ত্রও আগা-গোড়া নূতন নয়; এবং ইদানীন্তন কবিরা আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই কাটিয়ে উঠেছেন, পরিপ্রেক্ষিতের পরবশতা ঘোচাননি। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার হেতু নেই। কারণ কাব্য আর দর্শন বিভিন্ন বস্তু; এবং কবির সমস্ত শক্তি যেকালে রূপসন্ধানে নিয়োজিত, তখন তত্ত্বের জন্যে তিনি অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য। এ নিয়ম দান্তে থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল মহাকবির সম্পর্কে খাটে; এবং দান্তে যেমন "সুমা"-র রসানুবাদ করে খ্রীষ্টান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই উপনিষদের অনুগত বলে, হিন্দু সভ্যতারই কবি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে লোকযাত্রার লক্ষ্য বদলেছে: আজ আমাদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোয় একমাত্র পরগাছাই বোধিদ্রুম-রূপে বিরাজমান; যান-বাহনের বাহুল্যে পৃথিবীর প্রসার সঙ্কুচিত; এবং সার্বভৌম অন্নাভাবে সকল মানুষের অবস্থা সমান। কাজেই আমাদের আধুনিকেরা বৈদান্তিক বীক্ষায় নির্ভর হারিয়েছেন; তাঁদের মতে ভূমার দিকে নজর রেখে মোটর-ধাবিত রাজপথে চলা বিপজ্জনক। ফলত বর্তমান বাংলা সাহিত্য আর ভোরের কুয়াশায় আচ্ছন্ন নেই, তার পরিমণ্ডল এখন অস্তরাগে রঞ্জিত। কিন্তু এ-জন্যেও সাম্প্রতিকেরা চিন্তাশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিযোগ অগ্রাহ্য। কারণ এ-ক্ষেত্রে তাদের বৈদেশিকতা দোষাবহ বটে, কিন্তু তাদের মনুষ্যধর্ম শ্রদ্ধেয়

অবশ্য বৈদিক সভ্যতার বিধান মানলেই, মনুষ্যধর্ম নিপাতে যায় না; এবং রবীন্দ্রনাথ যদিও ভাবেন যে মানুষ অমৃতের পুত্র, তবু তিনি মনুষ্যধর্মেরই পুরোহিত। কিন্তু তাঁর পটভূমিকা নিরুপাখ্য বলেই বিশ্বমানবের চিত্রকেও তাতে বেখাপ্পা লাগে না; এবং আধুনিকেরা পরস্পরের মধ্যে খুঁটি-নাটির মিল ধরতে পেরেই আত্ম-পরের প্রভেদ ভুলেছে। অতএব কেবল সন্ধানের বিচারে সাম্প্রতিক দর্শনের জয় হয়তো অনিবার্য। অন্ততপক্ষে অধুনাতনীরা দেখে শেখার সুযোগ পায়নি; তারা সাধারণত ঠেকেই শিখেছে; এবং সেইজন্যে যেখানে সম্মানের মাত্রা সিদ্ধির উপরে নির্ভর করে না, শুধু সাধনার মুখ চায়, সেখানে তাদের পাশ্চাত্ত্য পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য নয়। তাছাড়া বর্ণসঙ্করতায় বাংলা সাহিত্য অভ্যস্ত; এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিশ্বাস যে আদর্শের দিক দিয়ে, এমনকি ভাবের হিসাব নিকাশে, তিনি খাঁটি বাঙালী নন।

বস্তুত প্রাক্‌মাইকেলী যুগেও কর্মঠবৃত্তির আদর ছিল না; এবং ভারতচন্দ্রের চরিত্র যদিও আর্যপন্থী, তবু তাঁর ভাবনায় ও ভাষায় মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং হাল আমলের বনেট-পরা সরস্বতীও দেবতা, তিনিও বরদা ও নমস্যা; এবং দর্শন দূরের কথা, প্রতীক ও কবি-প্রসিদ্ধির প্রয়োজন কাব্যে যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন অ্যাফ্রোডাইটি উর্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তবে শিল্প হেতুপ্রভব হলেও, তার ভূমিকার সমস্তটাই যদৃচ্ছালব্ধ নয়, তাতে অতিদৈবের স্থান আছে; এবং সাহিত্য প্রসঙ্গে উপযোগবাদ যেহেতু অকাট্য, তাই তার উদ্দেশ্যে ও সার্থকতায় দ্বিরুক্তি নিষিদ্ধ। ফলে আমাদের সাগর লঙ্ঘনের কৈফিয়তে শুধু কালনিষ্ঠার নাম শুনে আমার জিজ্ঞাসা বারণ মানে না, সিন্ধুপারের মায়াকাননে বন্দিনী সীতার কুশল-প্রশ্নও স্বতই মনে আসে।

এখানে আবার রবীন্দ্রনাথই আমাদের আদর্শ ও আশ্রয়; এবং কতকটা অবস্থাগতিকে আর অংশত রুসো-পরবর্তী পশ্চিমী লেখকদের দৃষ্টান্তে, তিনি আবাল্য নিজেকে ব্রাত্য রূপেই দেখে এসেছেন। কিন্তু কোনও দিন কেবল অনুকরণে তাঁর মন ওঠেনি; এমনকি স্বরচিত রীতিকে মুদ্রাদোষের স্থায়িত্ব দিতেও তাঁর রূপকারী বিবেক আপত্তি তুলেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু আত্মসচেতন পুরুষ, তিনি অচেতন নন; এবং উৎকর্ণ উন্মুখিতাই যেকালে বৈবিক জীবনযাত্রার বিশেষ গুণ, তখন তাঁর মনে পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাত সম্ভাবনীয়—অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যও যে তাঁকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেনি, এ কথা খুব জোর গলায় বলা শক্ত। তাহলেও তাঁর ঋণপরিগ্রহ দৈন্যবিরহিত ও বিলাসবর্জিত; তাতে অকর্মণ্যতার কোনও আভাস নেই; তাঁর হাত চিঠির আষ্টে-পৃষ্ঠে আন্তরিক প্রয়োজনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে গদ্যকবিতা-নামক তাঁর অধুনাতন কাব্যপ্রকরণ উল্লেখযোগ্য; এবং আমাদের বেলা এই অতিচ্ছন্দ স্বেচ্ছাচার যদিও বাক্‌সর্বস্ব ভূতের বাসা, তবু তাঁর পক্ষে সেটা সম্প্রতিবেত্তার অত্যাবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্য—পরিণামী ব্যক্তিস্বরূপের স্বাধিকার বিস্তার। তৎসত্ত্বেও তিনি নিশ্চয় গদ্যছন্দের অপপ্রয়োগ সব সময়ে বাঁচাতে পারেননি; এবং মাঝে মাঝে এই নববিধানে যে-সকল বিষয় ঢুকে পড়েছে, সে-সমস্ত হয়তো "পূরবী"-র আদিসমাজেই বেশি আরাম পেত। কারণ বংশের গুণে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিল যে জগৎ আনন্দময় এবং চূর্ণ মর্ত্যসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিদ্যমান। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও তাঁর অপসিদ্ধান্ত একেবারে অপসারিত হয়নি; এবং সুন্দরের অত্যন্ত ধ্যানে তিনি বিমুখ নন বলেই, তাঁর হাতেও গদ্যকবিতা অল্প-বিস্তর অপব্যবহৃত।

তাহলেও কুৎসিতের দৌরাত্ম্যে তাঁর সমাধি আজকাল প্রায়ই উপদ্রুত; এবং ছন্দ-মিলের সামঞ্জস্যে প্রাক্তন

অভিজ্ঞতা আর উপস্থিত অভিজ্ঞতার মহামিলন অসাধ্য জেনেই তিনি বীভৎসের সঙ্গে মাধুর্যের সন্ধি স্থাপন করতে চান গদ্যকাব্যের নৈরাজ্যে। বলাই বাহুল্য যে, এই আর্যসমাজী মনোভাবের পিছনে সনাতনী অনমনীয়তা নেই, আছে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার বিস্ময়কর স্থিতি-স্থাপকতা। তবু আমাদের খটকা থেকে যায়, সন্দেহ হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় নয় বটে, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ; এবং সেইজন্যে তিনি বোঝেননি যে প্রাচ্য মায়াবাদে দৈনন্দিন দুঃখকষ্ট অব্যাখ্যাত হলেই, সারা এসিয়া আজ অগত্যা বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। উপরন্তু এখানেও এ-তর্ক থামে না; বরঞ্চ তার পরেই প্রশ্ন ওঠে গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে তিনি যে উৎকর্ষে পৌঁচেছেন, নাটক রচনার বেলা সে-পরাকাষ্ঠা তাঁর নাগালে আসেনি কেন।

আসলে তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব ও বিরাট সিদ্ধি নিয়ে নাটক প্রণয়ন হয়তো দুষ্কর। অন্ততপক্ষে ট্র্যাজেডির লেকমাত্রেই নিরাসক্ত ও আত্মবিস্মৃত এবং অদৃষ্টবাদে আস্থা না রাখলেও, তার হয়তো চলে, কিন্তু টেরেন্‌স্‌-এর প্রতিধ্বনি করে সে আজীবন বলতে বাধ্য যে মনুষ্যত্বের অপকর্ষও তার সুপরিচিত ও আত্মনিহিত। "পরিশেষ", "পুনশ্চ" ও "বীথিকা"-র এক-আধটা কবিতার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও এ-স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথের আত্মমর্যাদাবোধে আটকায়; এবং তিনি যদিও সংস্কৃত কবিদের আবশ্যিক শুভবাদ কাটিয়ে একাধিক বিয়োগান্ত নাটক লিখেছেন, তবু মহাপুরুষেরা শুদ্ধ যে অন্ধ নিয়তির পদানত, এ কথা তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় ঠেকে। অর্থাৎ তিনি মানেন না যে শুভাশুভের বিকল্প অনিবার্য; এবং মানুষ কোন্ ছার, লাইব্‌নিৎস স্বয়ং বিশ্ব-বিধাতার মধ্যে সাধ ও সাধ্যের দ্বন্দ্ব দেখেছিলেন।

উত্তর সামরিক মানুষের পক্ষে এ-বিশ্বাসের ভাগ নেওয়া অসম্ভব; এবং বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাঙলা দেশে বৃথাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন। নচেৎ বঙ্গসাহিত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ স্বপ্নপ্রয়াণে তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দুষ্কর বটেই, এমনকি তিনিও যেকালে দুঃস্বপ্নের উপদ্রব একেবারে ঠেকাতে পারেননি, তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও, বিশ্বব্যাপ্ত বিভীষিকার সঞ্চারে চমকে উঠব।

কিন্তু চমকে ওঠাই যথেষ্ট নয়; তারপরে যে আবার ফিরে শোবে, ভবিষ্যতে পুনর্জাগরণের সুযোগ তার ভাগ্যে জুটবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রাবীন্দ্রিক গদ্যছন্দে পয়ার, ত্রিপদী, একাবলীর উপযুক্ত মধুর মনোভাব ব্যক্ত করেই আধুনিক বাঙালী কবির রক্ষা নেই, যুগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ তার অবশ্য কর্তব্য। এ-কথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।

[প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ॥ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি নাট্যকার, তিনি ঔপন্যাসিক। এ সব দিক দিয়াই তিনি বাংলা সাহিত্যের শীর্ষে, বিশ্ব-সাহিত্যের কিরীটের মণিমালিকায় তাঁর স্থান। কিন্তু তিনি আগে কবি, পরে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, তাঁর জীবনের প্রধান রস কাব্যরস—যাহা lyric কবিতার জীবন। নাটক ও উপন্যাস তাঁর জীবনের এই প্রধান রসকে বেষ্টন করিয়া তারই আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্য যেন তাঁর জীবনের এই রস-সাগরের প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। সাগরের প্রবালের মতো তাঁর উপন্যাসের কাহিনীগুলি, এই রস-সাগরেই জন্মলাভ করিয়া যেন ক্রমে একটা সূক্ষ্ম প্রবাল-বেষ্টনীর মতো তাহার একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকে শুধু ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

উপন্যাসও কাব্যের মতো রস-রচনা। সেই উপন্যাসই সার্থক, যাতে রস একটা পরিপূর্ণ মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গানের রসের যেমন দুটি উৎস—তার কথা ও তার সুর, তেমনি কথা-সাহিত্যের রসের দুটি উপকরণ, উপাখ্যান ও ভাব।

কাহিনীটির গঠন-চাতুরী ও তাহার রচনাসৌষ্ঠব হইতেই এক-প্রকার রস জন্মায়, তাহাতে আমাদের রসতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে। একটি সুগঠিত আদ্যোপান্ত অনবদ্য কাহিনী নিরলংকার ভাবে বলিয়া গেলেও, তাতে রসের প্রচুর উপকরণ থাকে, সে রসকে কথারস বলা যাইতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া, উপাখ্যানে যে জীবন চিত্রিত করা হয়, তার পর্বে পর্বে ভাবরসেরও প্রচুর অবসর থাকে—সেই রসও lyric কাব্যের মতো উপন্যাসেরও উপজীব্য। কথারস ও ভাবরসের সুনিপুণ বিন্যাসে ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে উপন্যাস রমণীয় হইয়া উঠে।

ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেহ বা কথারস, কেহ বা ভাবরসকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান রস ভাবরস। তিনি যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, প্রত্যেকটিই কেবলমাত্র কাহিনী হিসাবে সুন্দর, কিন্তু তার উপখ্যান ভাগ যাহা অতি সংক্ষেপে বলা যায় তার ভিতর ঘটনার বৈচিত্র্য বা বিবিধ চিত্তচমকপ্রদ ঘটনার সংঘাতের বাহুল্য নাই। যে সংক্ষিপ্ত ঘটনাবিরল কাহিনীটি লইয়া তাঁর উপন্যাস, তার পরতে পরতে ভাবরসের যে সকল সূক্ষ্ম অবসর আছে, সেইগুলি আশ্রয় করিয়া তিনি তাঁর কাহিনী অপরূপ সৌন্দর্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসই তাঁর এইসব সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতির ইতিহাস—কোমল তুলিকায় সূক্ষ্মতম রেখা ও বিন্দুপাতে আঁকা এক-এক বিচিত্র চিত্র।

এইটাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। সেগুলির ভিতর বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের অন্ত নাই, কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সের উপন্যাস 'রাজর্ষি' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বয়সের 'শেষের কবিতা' পর্যন্ত সবগুলির মধ্যেই এই একটি লক্ষণ খুব সুস্পষ্টভাবে তাঁর সৃষ্টিকে অপরের সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্রতা দান করিয়াছে। এ লক্ষণ তাঁর চিত্তের গঠনে ভাবরসের মুখ্যতার ফল।

জীবনের যে ইতিহাস উপন্যাসে লেখা হয়, তার ভিতর কোথায় কোনখানে lyric রসের সূক্ষ্ম অবসর আছে, তাহা তাঁর চক্ষু কখনও এড়াইয়া যায় না, আর সূক্ষ্মতম অবসরটুকুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি তাহা অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন। তাঁর এই কবিদৃষ্টি ও এই বিশিষ্ট রস-প্রবণতার

পরিচয় পাইয়াছিলাম একদিন তাঁর সঙ্গে আমার লিখিত একখানি উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে। অত্যন্ত সংকোচের সহিত সে কথাটা বলিতে সাহস করিতেছি, শুধু কথাটায় তাঁর উপন্যাসের এই দিকটা বুঝিবার সহায়তা হইবে বলিয়া। আমার সেই উপন্যাসে একটি বিবাহিতা পতিপ্রাণা নারী এবং তার সহচর একটি যুবক এক সঙ্গে জেলে যায়। তাদের দীর্ঘ কারাবাসের অবসরে পত্র বিনিময়ে তাদের ভিতর যে গুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমি যুবক-যুবতীর এইভাবের পরিণতি আমার শক্তি অনুসারে সংক্ষেপে মোটা তুলির দুই-চারিটি আঁচড়ে ইঙ্গিত মাত্র করিয়া গিয়াছিলাম। সেই বইখানার আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাকে দুই-চার কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, এইখানে ভাবের এই পরিণতিটি আরও অনেক বিস্তারিত করিয়া বলিবার অবসর ছিল। কারাগারের প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি হীনা-চরিত্রা নারীর সাহচর্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে গোপার চরিত্রের উপর সমাজের প্রচ্ছন্ন প্রভাব অপসৃত হইয়া অসংবিদ হইতে গুপ্ত কামনা ঠেলা মারিয়া উঠিল তাহার বিস্তীর্ণ ইতিহাসটা খুব চিত্তহারী করা যাইত। কাহিনীটির এইখানটায় এই lyric রসের প্রচুর অবসর ছিল; লিখিবার সময় আমার তাহা মনে পড়ে নাই, আর সে-রস অমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার শক্তিও আমার ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবরসবহুল কবিচিত্ত ঠিক এই ভাবরসের দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁর নিজের হাতে এমনি একটি কাহিনী পড়িলে এই রসটিকে নিশ্চয় তিনি অশেষ দরদের সহিত ফুটাইয়া তুলিতেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁর উপন্যাসের যে-কথাভাগ তাহা পরিকল্পনার গঠননৈপুণ্যে এবং পরিণতির স্বাভাবিকতা ও রসবাহুল্যে অনিন্দ্য। কিন্তু তবু, তাঁর উপন্যাসের যে প্রধান মাধুর্য, তাহা এই কাহিনীর সৌষ্ঠব নয়, তাঁর পূর্বে লক্ষিত যে-ভাবরস আছে, তাহাতে।

তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম পরিচয় দেখিতে পাই, তাঁর প্রথম উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাসে। 'রাজর্ষি'র উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "স্বপ্ন দেখিলাম কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সহিত তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনও মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।"

এই স্বপ্নে 'রাজর্ষি'র উদ্ভব। বলির রক্ত দেখিয়া শিশুর এই ভীতি ও বিক্ষোভ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তে যে ধাক্কা লাগিল তাহার পরিণতিমুখে রাজর্ষির চরিত্র সৃষ্টি—ইহাই এক উপাখ্যানের বিষয়। শুধু এই ব্যাপারটুকু লইয়া একটি অপূর্ব lyric লেখা যাইত। গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তের পরিণতির ইতিহাস লইয়া 'কথা ও কাহিনী' বা 'পলাতকা'-র কবিতার মতো অপেক্ষাকৃত বড়ো কবিতা লেখা যাইত। এই স্বপ্ন তাই রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চিত্তের পরিণতির এ ইতিহাস তাঁর কল্পনায় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহার ভিতর এত প্রচুর রসের অবসর ক্রমে তাঁর চক্ষে ফুটিয়া উঠিল যে, তাহা খণ্ডকাব্যের সংকীর্ণ পরিসরে ধরিয়া রাখা যায় না। তাই এই কাহিনীটি হইল উপন্যাস। তাঁর সৃষ্ট রস তিনি ভরিয়া দিলেন গোবিন্দমাণিক্যের ঐতিহাসিক চরিত্রের ভিতরে। সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক বহু ঘটনার বেষ্টনী দিয়া তিনি সৃজন করিলেন এক উপন্যাস।

'রাজর্ষি' কবির প্রথম উপন্যাস। ইহাতে এবং 'বৌঠাকুরানীর হাটে' তরুণ কবি সেকালের উপন্যাসের

প্রচলিত আদর্শের দ্বারা অনেকটা চালিত হইয়াছিলেন। তাই এই দুখানি উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। তবু, এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই বইয়েরও উদ্ভব হইয়াছে একটা ভাবরসবহুল কল্পনায় এবং সেই ভাবটার পরিণতিই এ কাহিনীর প্রতিপাদ্য। ইহার পর কবি আর যে-সব উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁর এই দিক দিয়া যে প্রকাণ্ড শক্তি আছে, তার ক্রম-পরিণতির একটা ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই। 'নষ্টনীড়ে' তার আরম্ভ, 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'-তে তার পুষ্টি, তার পরিপূর্ণ বিকাশ 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে'-তে। মানুষের অন্তরের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তের সবগুলি কোমল পদ্ম একটি একটি করিয়া তুলিয়া তাহার সকল মাধুরী বিকশিত করিয়া তুলিবার যে অপরূপ শক্তি রবীন্দ্রনাথের আছে, যে-শক্তির দ্বারা তিনি তাঁর lyric কবিতায় অপূর্ব সফলতার সহিত প্রতি মানবের চিত্তের অসংবদ্ধ বা অর্ধ-সংবদ্ধ ভাবরাশি উন্মীলিত করিয়া পূর্বেই দেশবাসীর চিত্ত-হরণ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিই যে কথা-সাহিত্যেও তাঁর প্রধান শক্তি, সে-কথা রবীন্দ্রনাথ ক্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরানীর হাটে' উপন্যাস-গঠনের প্রচলিত পদ্ধতির চাপে ইহা অনেকটা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'তে কবি তাঁর শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করিয়া তাঁর প্রধান অধিকারক্ষেত্রে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'গোরা'তে ও 'ঘরে বাইরে'-তে তাঁর এই শক্তিতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার হাতে যে ইন্দ্রজালের যন্ত্র আছে তাহার পূর্ণ শক্তি অনুভব করিয়া অপরিসীম পটুত্বের সহিত তিনি তাহার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁর এই দুইখানি উপন্যাসে। দীর্ঘকাল পরে আবার যখন তিনি উপন্যাস লিখিলেন তখন তাঁর অধিকারক্ষেত্র দখল হইয়া গেছে, সেইখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কবি তাঁর ইন্দ্রজালের অপরূপ লেখা দেখাইয়া গিয়াছেন। 'যোগাযোগ' এবং 'শেষের কবিতা'-য় কবির এই শক্তিরই অপরূপ বিকাশ। গল্পের ভিতর যে-কাব্যরস তাঁর প্রধান দান, তাই পরিপূর্ণ হইয়া জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে এ দুইখানি উপন্যাসে। 'গোরা' বা 'ঘরে-বাইরে'তে সে-রসের নবীনতার যে ফেনিল উচ্ছলতা ছিল তাহা মিলাইয়া গিয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে আরও নিবিড় হইয়া তার মাধুর্য।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপাখ্যানভাব সর্বত্রই অতি-সংক্ষিপ্ত। তাঁর উপাখ্যান-চয়নের ক্ষেত্রও খুব প্রশস্ত নয়। 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরানীর হাট' ছাড়িয়া দিলে, তাঁর আর সব কয়খানি উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু খুব সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। সম্পন্ন ভদ্র-পরিবারের সুশিক্ষিত পুরুষ ও নারী লইয়া তাঁর উপন্যাস। প্রত্যেকটিতেই দুটি-চারটি পাত্র পাত্রী লইয়া কথা। আর গল্পের প্রধান বিষয়—অবস্থাভেদে প্রেমের স্বরূপ ও পরিণতির বৈচিত্র্য। তাঁর চিত্রফলকের ভিতর রাশি রাশি লোক ভিড় করিয়া আসে না কোনও দিনই। তিন-চারিটি লোক লইয়া তাঁর উপন্যাস। আর তাদের জীবন এমন কিছু ভয়ানক বিস্ময়াবহ নয়। যুদ্ধ বা ডাকাতি, বা খুন-খারাপির মতো উত্তেজক বিষয় তাঁর উপন্যাসে কোথাও নাই। কাজের তাড়াও নাই। action-এর পরিমাণ তাঁর উপন্যাসে যৎসামান্য, এবং বিবর্তন মুখে সে পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া আসিয়া 'শেষের কবিতায়' দুটি যুবক-যুবতীর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

কিন্তু এই অপরিসর ক্ষেত্রে তিনি রসের ফসল জন্মাইয়াছেন সুপ্রচুর। ইহার তুলনা দেখিতে পাই আমরা বৈষ্ণব কবিতায়। পদাবলীর ভিতর যে অপরিমিত রস সঞ্চিত রহিয়াছে, খ্যাত ও অখ্যাত কত কবি যে কত নূতন রসের সঞ্চয় রাখিয়াছেন, তার বিষয়বস্তু কত ছোট। কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমমিলন ও

বিরহের যে প্রাচীন সংক্ষিপ্ত কাহিনী, সেই একটি কাহিনী আশ্রয় করিয়া সবাই লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই কাহিনী লইয়াই প্রত্যেকে কত না অপরূপ রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব তাঁর কথাবস্তুর প্রসারে নয়, রসসৃষ্টির গভীরতায়। রসের দীঘি তিনি কাটেন নাই, কাটিয়াছেন রসের খনি। সংক্ষিপ্ত বেষ্টনীর ভিতর আপনাকে আবদ্ধ করিয়া তিনি খুঁড়িয়া গিয়াছেন শুধু অন্তরের ভিতর। গভীর অন্তর হইতে মানবের চিত্তের ইতিহাস খুঁড়িয়া তুলিয়াছেন, আর সমগ্র পৃথিবীর সুমুখে ছড়াইয়া দিয়াছেন মানবচিত্তের গর্ভগত অপরূপ রসরাজি।

তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘটনার চমকপ্রদ বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু অশেষ বৈচিত্র্য আছে ভাবের। ঘটনার অপূর্ব পারম্পর্যে তিনি চিত্ত চমকিত করেন না, কিন্তু ভাবের অপরূপ গতি অনুসরণ করিতে গিয়া তিনি চিত্তে যে চমক দেন, যে ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তোলেন, তাহা ডিটেকটিভ উপন্যাসের চমকপ্রদ ঘটনার পারম্পর্যের চেয়ে কম নয়। 'গোরা'য় গোরা ও সুচরিতার চিত্তের ক্রমবিকাশে, 'ঘরে বাইরে'-তে বিমলার চিত্তের পরিণতির ইতিহাসে যে অপূর্ব রসচিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাঁর প্রতি রেখাপাতে যে কি একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা জন্মে তাহা তাঁর কোন্ পাঠক না অনুভব করিয়াছেন? কিন্তু এই effect সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁকে খুব চড়া করিয়া রঙ ফলাইতে হয় নাই, বর্ণের খুব তীব্র সংঘাত ঘটাইতে হয় নাই, শুধু সূক্ষ্ম রেখা ও বিন্দুপাতে পরিপূর্ণ করিয়া সমগ্র চিত্রটি আঁকিয়া পাঠকের চিত্তের এই মনোজ্ঞ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রফলকে অনেকগুলি মূর্তি আঁকেন নাই। দুই-চারিটির বেশি চিত্র কোনও উপন্যাসেই তাঁর নাই। কিন্তু সেই দুই-চারিটি চিত্র এমন পরিপূর্ণতার সহিত এবং এমন অনবদ্য সৌষ্ঠবের সহিত আঁকিয়াছেন যে, তারা পূর্ণাঙ্গ হইয়া তাদের সকল মাধুর্য, সকল মহিমা, সকল শক্তি, সকল দুর্বলতা উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাদের চরিত্রে mystery আছে, কিন্তু অস্পষ্টতা নাই। নিখিলেশের চরিত্রে mystery আছে, বিমলার ভিতর যে দুইটা সত্তার সংগ্রাম তাতে একটা মনোজ্ঞ mystery আছে, সন্দীপের তীব্র শক্তির সঙ্গে নীতির অভাবের সমন্বয়ে এবং নগ্ন শক্তির এত বড়ো প্রচণ্ড তাণ্ডবের সঙ্গে শেষ একটা "কিন্তু"র সমবায়ে mystery আছে। কিন্তু এর কোনও চরিত্রই অস্পষ্ট নয়। তারা যেমনটি তেমনি পরিপূর্ণভাবে রক্তমাংসে গঠিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তাদের চরিত্রের অন্তর্গত যে সমস্যা সেটা সমাধান করিবার ভার পাঠকের।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যেমন, উপন্যাসেও তেমনি আঁকিয়াছেন মানুষের ভাবজীবন। তাদের কর্মজীবন শুধু ভাবজীবনের আনুষঙ্গিকভাবে যতটুকু দরকার তাঁর বেশি উপন্যাসে স্থান পায় নাই।। মুখ্যত তিনি কবি, উপন্যাস তাঁর কবিজীবনের পরিণতিমুখে একটা গৌণ সৃষ্টি। কবি হিসাবে তিনি ভাবদৃষ্টিতে মানুষের জীবনের দিকে চাহিয়াছেন। সে জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, কোমলাতিকোমল ভাবকণাগুলি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিবার এবং সুকুমার রেখাপাতে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার অপূর্ব স্বাভাবিক শক্তি ও অর্জিত পটুত্বই তাঁর কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ গৌরব, এবং সেই শক্তি ও পটুত্বই উপন্যাসেও ভাবধারার ভিতর এই অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি ও অপরূপ বিন্যাসকৌশল দান করিয়াছে।

কাব্যে যেমন একটি ভাব, জীবনের এক-একটি খণ্ড বা বিশিষ্ট প্রকাশ আপনি এক-একটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, উপন্যাসে তেমন হয় না। উপন্যাসের বিষয় হয় সমগ্র জীবন। জীবনের স্রোতের ভিতর এক বা একাধিক বিশিষ্ট ভাবধারা লইয়া উপন্যাস। কাজেই কাব্যে কবি ঠিক যে প্রণালী অনুসরণ

করিয়াছেন, উপন্যাসে ঠিক সেই প্রণালীটি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কেবল ভাবচিত্রের পর ভাবচিত্র বসাইয়া গেলেই উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের রসের জীবন হইল একটা পরিণতির আকাঙ্ক্ষা। ঘটনাস্রোতের গতি অনুসরণ করিয়া পাঠকের চিত্তে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া উঠে। পরিণতির একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মায়—সমাপ্তিতে সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি সম্পাদন না করিলে উপন্যাস সার্থক হয় না। ঘটনার বা ভাবের মালা গাঁথিয়া গেলেই উপন্যাস হয় না। তার তলায় থাকা চাই একটা চলনশীল জীবনস্রোত।

তাই উপন্যাসে কবি আঁকিয়াছেন এই জীবনস্রোত। স্রোতের গতিমুখে যে ফুলগুলি ভাসিয়া যাইতেছে সেগুলি তিনি অবজ্ঞা করেন নাই—তাঁর উপন্যাসের আদ্যোপান্ত এইসব খণ্ডরসে ভরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তবু তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আছে এই জীবনস্রোতের উপর, আর সে জীবনস্রোত এমন করিয়াই তিনি আঁকিয়াছেন, এমন করিয়াই সে ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তার প্রতি রেখাপাতে আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠিয়া সমগ্র উপন্যাসকে কথারসভূয়িষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁর ভাব-বিশ্লেষণ সাইকলজির বিশ্লেষণ নহে, কবির বিশ্লেষণ। ইহাতে পাত্র-পাত্রীর মন যেন পাঠকের সামনাসামনি আসিয়া কথা বলিতে থাকে, আর দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের রানী যেমন করিয়া স্রোতের চিত্তকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, ক্ষুধিত পাষাণের অপূর্ব ইন্দ্রজাল যেমন তার গর্ভের ভিতর সকলকে অসহায়ভাবে টানিয়া লইয়াছিল, তেমনি করিয়া এ কাহিনী চিত্তকে আকৃষ্ট ও বন্দী করে।

এই রোমান্সের রোমাঞ্চসত্তার ভাবের বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া করিয়াছেন তেমন আর কোনও ঔপন্যাসিক করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের হাতে উপাখ্যানটি শুধু একটা খাঁচা, তাঁর উপন্যাসের প্রাণ এই ভাবরস। ভাবের পুষ্টি ও পরিণতিই তাঁর উপন্যাসের প্লট। ঘটনাগুলি শুধু সেই পরিণতির সহায়ক। শুধু ঘটনা নয়, যা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তার ভিতর অনেক কথাই আছে—ধর্মের কথা, সমাজতত্ত্বের কথা, পলিটিক্সের কথা, আরও কত কি আছে। সবগুলিই এই ভাবধারার সহায়ক মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিতর যত তত্ত্বালোচনা আছে, ভারী ভারী তত্ত্বের সুগভীর আলোচনা যত আছে, এমন খুব কম বইয়ে আছে।

তত্ত্বের আলোচনা আরও অনেকে করিয়া থাকেন। এক-আধজন ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা তত্ত্বালোচনায় অশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাঁদের গ্রন্থে, যদিও উপন্যাসের রসধারার সঙ্গে সে পাণ্ডিত্যকে মিশ খাওয়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য জগতের আধুনিক উপন্যাসে তত্ত্বের অশেষ বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং এমন একটা ধারণাও অনেক স্থলে দেখা যায় যে উপন্যাস যদি কোনও একটা গভীর তত্ত্বের বাহন না হয়, তবে সেটা তুচ্ছ। এই ভাবটা সবচেয়ে বেশি প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে রুশিয়ার অতি আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনার ভিতর। আবার যাঁরা এই আধুনিক রুশ সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, আমাদের দেশের সেই এক শ্রেণীর সমালোচকদের ভিতর এই ভাবটার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর একজন সমালোচক একবার অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদিগকে challenge করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি নূতন বাণী তাহারা দিয়াছে, কোন্ নূতন বার্তা দেশবাসীকে শুনাইয়াছে? যেন কথা লিখিবার একমাত্র প্রয়োজন নূতন একটা mes-age বা বাণী শুনানো।

আমি সাবেক আমলের লোক। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থকতা তার message বা বাণীতে নয়, নূতন তত্ত্বের ব্যাখ্যানে নয়—রসের নূতন প্রকাশে। উপন্যাস উপন্যাস-হিসাবে সার্থক হইয়াছে কিনা

তার একমাত্র মানদণ্ড তার রস-সমৃদ্ধি। আর এই রস-সম্পদ তাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া রসগ্রহীতার দ্বারা বিচার করতে হয়, প্রত্যেক উপন্যাসকে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমগ্র রসসৃষ্টি স্বরূপে বিচার করিয়া আলোচনা করিতে হয়। অনেকগুলিকে এক সঙ্গে করিয়া তার সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাবে একথা জিজ্ঞাসা করা চলে না যে, এই সমগ্র সমষ্টির মধ্যে নূতন রস আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, হইতেই পারে না। কেননা রসবস্তুটির প্রকাশ হয় ব্যষ্টিরূপে, প্রত্যেক উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে যে রসের বিকাশ তাদের কোনও সাধারণ পরিচয় হয় না।

উপন্যাস কোনও তত্ত্বের বাহন হইতে পারে; কিন্তু উপন্যাস হিসাবে তার সার্থকতা সে তত্ত্বের গুরুত্ব বা যাথার্থ্য দিয়া বিচার করা চলে না। সাহিত্য হিসাবে তার দেখিবার বস্তু শুধু এই যে, ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে তাহার ভিতর রস ফুটিয়া উঠিয়াছে কি-না, এবং সেই রসের গৌরব ও সমৃদ্ধিই উপন্যাসের গৌরবের পরিমাণ।

রবীন্দ্রনাথ তার কোনও উপন্যাসকে কোনও তত্ত্বের বাহন স্বরূপ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তত্ত্বের সাগর আছে তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে, তাহা হইতে তীব্র জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইতে পারে, অশেষ শিক্ষার উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। সেই শিক্ষা প্রচার করাই মনোগত ইচ্ছা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁর রসজ্ঞানের সমৃদ্ধি বশত তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁর উপন্যাসমালার মধ্যে অকৃপণভাবে তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন তত্ত্বালোচনা; কিন্তু সেই তত্ত্ব কোনও গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই; উপাখ্যানের পরিপূর্ণ রসরূপের মধ্যে সে তত্ত্বালোচনা এমন একটা নির্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে যেখানে রসসৃষ্টির দিক হইতে তার থাকিবার প্রয়োজন ছিল।

'ঘরে-বাইরে' খুব তত্ত্ববহুল উপন্যাস। ইহার পত্রে পত্রে ভাবাইবার অনেক কথা আছে। 'গোরা' তার চেয়েও তত্ত্বভূয়িষ্ঠ। ধরিতে গেলে এই গোটা বইখানার সবচেয়ে মোটা অংশ গোরার সঙ্গে আর সকলের তত্ত্বালোচনা। কিন্তু এই যে তত্ত্ব ইহা অনাবশ্যকভাবে জবরদস্তি করিয়া গ্রন্থের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় নাই এক স্থানেও। সর্বত্রই এই তত্ত্বালোচনা উপন্যাসের রসমূর্তির স্ফূরণের সহায়ক হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের মতো গোরাও প্রধানত পাত্র-পাত্রীদের চিত্তের পরিণতির সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণবহুল ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পরিণতির পথে প্রত্যেকটি তত্ত্বব্যাখ্যানে শুধু গোরা বা পরেশবাবু বা বিনয়ের বা সুচরিতার চরিত্র যে দীপ্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নয়, প্রত্যেকটি তর্কের পদে পদে এবং পরিসমাপ্তিতে পাত্র-পাত্রীদের কারও না কারও চিত্তের পরিণতি-কাহিনী কতকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র তত্ত্বালোচনাও এমনি মনের পরিণতিমুখে এক একটা ধাপ মাত্র। তত্ত্বের অনবদ্য মীমাংসা বা ব্যাখ্যানের অপেক্ষায় উপাখ্যানটি কোথাও বসিয়া থাকে নাই। তত্ত্বব্যাখ্যানের গতিমুখে উপাখ্যান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তত্ত্ব-ব্যাখ্যান এইরূপে উপন্যাসের রসমূর্তির ভিতরে অপরিহার্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একটি আলোচনা বাদ দিলে তার পরের অংশের গ্রন্থিসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এইজন্য বহু তত্ত্ব, বহু আলোচনা, আপাত-দৃষ্টিতে বহু অবান্তর বিষয়ের প্রচুর সমাবেশ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটি একটি পরিপূর্ণ রসবস্তু হইয়া পড়িয়াছে।

[প্রথম প্রকাশ……]

উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন'—সীতারাম উপন্যাসের এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন। অন্তর্বিষয় বলতে এখানে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন, তার অনুসন্ধানে পাঠককে বেশিদূর যেতে হয় না। ঐ শব্দে তিনি যে একটি নিটোল সারগর্ভ কথাবস্তুকেই বুঝেছিলেন, সে কথা অন্যত্র তাঁরই প্রদত্ত একটি স্বীকৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে—

> The novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea.[১]

তত্ত্বগত সারমর্মের বশবর্তী করে আনতে গিয়ে ঘটনা ও চরিত্রের যে শিল্পগত লাঞ্ছনা ঘটে, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরও অবিদিত ছিল না। তাই তাঁর জীবনে এমন এক সময় এল, যখন তিনি উপন্যাস রচনায় বীতরাগ হলেন এবং সেই অস্বস্তিকর সাহিত্যবাহন ত্যাগ করে সোজাসুজি তত্ত্বকথনে মনোনিবেশ করলেন।

উপরের অনুচ্ছেদের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র আঁকতে পারেননি। তাঁর আঁকা মানবমানবীর প্রদর্শনী থেকে অনেককেই আমরা মনে রেখেছি, মর্যাদা জ্ঞাপন করেছি। সেই সব চরিত্র যে আমাদের স্মৃতি-ধার্য, তার কারণ তাদের শিল্পী-জনকের তুলির টানের বলিষ্ঠতা। প্রতাপের মতো পুরোবর্তী নায়ক কিংবা চাঁদ শাহ ফকিরের মতো প্রচ্ছন্ন পার্শ্বচরিত্র—দৃঢ়িষ্ঠ তুলির আঁচড়ে প্রতিটি আলেখ্যই স্পষ্ট। এবং স্পষ্টতা যেমন তাদের চিত্র-লক্ষণ, স্পষ্টতাই আবার তাদের চরিত্রের সীমা। অর্থাৎ, রচয়িতার অভিভাবকোচিত সচেতন নিয়ন্ত্রণে প্রায়শই তারা সংযত, অংশত উন্মোচিত এবং অকালেই নিজ-নিজ জীবনবোধে উপনীত। ই. এম. ফর্স্টরের বিভাজিত প্রবাদপ্রতিম সেই চরিত্রবিভাগের কথা মনে এনে বলছি, বঙ্কিমচন্দ্র সরল স্বভাবের (flat character) মানুষই এঁকেছেন, জটিল প্রকৃতির (round character) চরিত্রসৃজন তাঁর প্রবণতা ও কৃতিত্বের বহির্ভূত ছিল। তিনি হলেন বাংলা সাহিত্যের ভিক্টোরীয় পর্বের লেখক, যিনি সতীর্থবৃন্দের মতোই চরিত্র-অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্দিষ্ট করে ফেলেন, তার দু-একটি প্রধান বৃত্তির মধ্যে তাকে বিধৃত করে দেন। আর যিনি 'মিড্-ভিক্টোরিয়ান' বলে আত্মবিদ্রূপে বিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জটিল চরিত্রের জন্য দরজা খুলে দিলেন—

> বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল—বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।[২]

---

১ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি, *Bengal : Past and Present*, April-June, 1914. p 275। শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের *A Critical Study of the Life and Works of Bunkimchandra* গ্রন্থে পত্রটি উদ্ধৃত আছে।

২ চোখের বালি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৮৮

চোখের বালির রচনাবলী-সংস্করণের সূচনায় এই কালান্তরের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন —

> আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।...ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

লক্ষ্য করতে হবে 'তাদের আঁতের কথা' বলতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রসমূহের অন্তরের কথা বা অন্তর্দ্বন্দ্বই মনে করেছেন। ঘটনার ধারাবিবরণী অথবা ভাষ্যজ্ঞাপনস্পৃহা ত্যাগ ক'রে ব্যক্তিচরিত্রের কাছে এই প্রত্যাবর্তনের দিক থেকে তিনি যুদ্ধোত্তর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে একপরিবারভুক্ত।

ঐতিহাসিক তথ্যক্রমের খাতিরে স্বীকার করতে হবে, বউঠাকুরানীর হাট আর রাজর্ষির লেখক বঙ্কিমের অনুগামী। কিন্তু যাঁরা বঙ্কিমের প্রভাবেই উক্ত দুটি গ্রন্থকে সীমাবদ্ধ করে দেখেন, সবিনয়ে তাঁদের কাছে দু'একটি প্রশ্ন নিবেদন করি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনায়াসসাধিত রোমান্সের রক্তিমা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কোথায়? কাহিনীবিন্যাসে রোমান্সের যে-উৎকণ্ঠা এই গ্রন্থ দুটিতে স্পন্দমান, পরিণামী শান্ত রসের চাহিদায় তা কি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেই অগ্রসর হয়নি? বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসে প্রকৃতি একটি প্রধান চরিত্র। অন্তত গীতাঞ্জলির যুগ পর্যন্ত সর্বাতিশায়ী এবং সর্বময়ী অর্থে প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের পরমা শক্তি। প্রকৃতির মধ্যেই বিরুদ্ধ শক্তি-সংঘর্ষের পর্যবসান ঘটে, তারই মধ্যে অপরাপর চরিত্র তাদের আপেক্ষিক সীমারেখা লুপ্ত করে দেয়। রক্তপিপাসু রাজপ্রাসাদকে পিছনে ফেলে উদয়াদিত্য যখন ভোরের আকাশে তাকালেন, প্রকৃতির প্রভাব সেখানে একমাত্র—

> প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।"[৩]

নক্ষত্ররায় যে গোবিন্দমাণিক্যকে হাতের মুঠিতে পেয়েও শীতল শোণিতে হত্যা করতে পারলেন না, তার মূলে প্রকৃতির আত্মাশক্তির অমোঘ প্রভাব—

> অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন "দাঁড়াও"!
>
> নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌গম্ করিতে লাগিল—সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে,

৩ বউঠাকুরানীর হাট। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫১৪-১৫

> শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।
>
> রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"[৪]

উপরের দুটি উৎকলন, আরো একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি। উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথেরও যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে, সেটি প্রমাণ করা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট একটি ভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে অধিকাংশ চরিত্র গড়ে তুলেছেন, আর রবীন্দ্ররচিত চরিত্রবর্গ পরিণতির মুখে এসে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—'বৃহৎ একটি ভাবের' কাছে আত্মবিসর্জন করেছে। হয়তো প্রথম পর্বের রচনায় রবীন্দ্রপ্রণীত চরিত্রসমূহের ঐ আত্মসমর্পণ অনেক অপীড়িত, সাবলীল। কিন্তু রচয়িতার পিতৃসুলভ কর্তৃত্ব কখনো তাদের আড়ষ্ট করেনি। তিনি শুধু তাদের জন্য একটি শুভেচ্ছা পোষণ করেছেন, তাদের কারো-কারো বিপথগামিতা নিয়ে মনে মনে যে উদ্বিগ্ন হননি, এমনও নয়। তৎসত্ত্বেও, তাদের গতিবিধি তিনি রেখায়িত করে দেননি। চোখের বালির রচনামুহূর্ত যে ক্রান্তিকারী, এ কথা আজ আর তথ্যসমেত প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন নেই। যে-মুহূর্তে চোখের বালি রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে পরিচিত তথ্যভূমিটি আবার এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রদোষসন্ধ্যা এবং বিশ শতকের প্রত্যূষপ্রহর য়ুরোপীয় ভূখণ্ডের মানসে যে-আতঙ্ক সঞ্চার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নিজের জন্য নিরাপদ একটি দূরত্ব নির্বাচন করে নেননি। চীন ও জাপানের যুদ্ধের আক্ষরিক দর্পণ না হোক, অন্তঃসাক্ষ্য বহন করছে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য। যে-শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘে অস্ত গেল, নৈবেদ্যের একাধিক কবিতায় তার মানব প্রতিক্রিয়া গ্রথিত হয়ে আছে। এক দিকে কবির নিজস্ব চরিত্র, অন্য দিকে পক্ষসাত যুগ, অনিবারণীয় ঘটনাচক্র; এ-দুয়ের টানাপোড়েনে নৈবেদ্যের কবিতাগুলি আলোড়িত। এবং নৈবেদ্যকালীন রচনা চোখের বালিতে একই দোটানা, একই টানাপোড়েনের অন্য অভিক্ষেপ। সেখানেও চরিত্রের উপরে আঘাত পড়েছে, চরিত্র উৎকেন্দ্রিক হতে চলেছে এবং পরিণামে বাসনা থেকে, বহির্জগৎ থেকে অচঞ্চল জীবনকেন্দ্রে ফিরেছে। নৌকাডুবিতে রবীন্দ্রনাথ ঘটনা-ঘনিষ্ঠ আখ্যানের একটি নক্‌শা আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর সমস্ত কাহিনীটিকে অনুধাবন ক'রে ঔপন্যাসিক নিজেই অন্যরকম বলেছেন—

> একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়ছে গৌণ।···ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ—তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে।[৫]

অধোরেখ অংশটিতে একটু যেন দ্বিধা আছে। প্রকৃত পক্ষে, নৌকাডুবিতে ঘটনা এসে চরিত্রের উপর হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে প্রাপ্য মনোযোগ চেয়েছে এবং অতঃপর শুধু চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রতিমুখী মনোভাবের সংগ্রামই চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে:

> ···যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবনসমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল তখনই নানা বিরুদ্ধ

৪ রাজর্ষি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪০১

৫ নৌকাডুবি, সূচনা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড

> ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল।[৬]

রমেশ রবীন্দ্রচরিত্রশালার প্রতিনিধি কোনোমতেই নয়, কিন্তু সে নিশ্চয়ই পাঠকের একটি অন্তরঙ্গ নস্ট্যাল্‌জিয়া। রমেশের আকাঙ্ক্ষা ও নির্বাণ, অন্বেষণ ও অন্তিম নিয়তির মধ্যে শুধু জীবন-বোধ নয়, জীবন আছে। এবং সব মিলিয়ে একটি চরিত্র আছে, যা ঘটনার ক্রীড়নক নয়, অন্তর্লীন ঘটমানতায় যা বিবর্তমান। ব্যক্তিবিশেষত্বই তার প্রস্থানভূমি, প্রত্যাবর্তনের নিশানা।

অথচ, ব্যক্তিবিশেষকে ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না, এবং বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষেরই প্রকাশ, এ কথা গোরা বলেছে। এটুকু শুনেই যাঁরা গোরা-চরিত্রকে ডকুমেণ্টারি তথ্যচিত্রের বাহন হিসেবে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েন, গোরা পড়তে গিয়ে তাঁরা বারংবার প্রতিহত হবেন। অন্তত টমাস এ কেম্পিসের *Imitation of Christ* নামক ধর্মগ্রন্থে মনোনিবেশের চেষ্টা করতে দেখে সুচরিতাকে ব্যক্তিত্ববর্জিত একটি মহিলা হিসেবে মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। বৃহৎ ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ, পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্ট্য গোরা উপন্যাসে আর-একটি উপসর্গ নিয়ে এসেছে, সে হল অতিকথন বা over-motivation। কিন্তু ঘটনা এবং চরিত্রের ক্রমবর্ধিষ্ণু দূরত্বকে মেলাবার জন্যও গোরা উপন্যাসখানি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এর পরে শুধু চরিত্র, শুধুই চরিত্রের অস্তিত্বের সমস্যা। ঘটনা একটা কোথাও ঘটছে, কিন্তু সে শুধু বহির্দেহলিতে, অন্দরমহলের প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে চরিত্র নিজের মুখোমুখি বসে আছে।

একালের একজন সমালোচক তাঁর প্রাসঙ্গিক অভিযোগ সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন--

> ...গোরার পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা যেন এই তৃপ্তিকর সমগ্রতার সন্ধান পাই না। ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই-একটি রঙিন ও সূক্ষ্মসূত্রকে পৃথক্‌করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।[৭]

সমালোচক যাকে পৃথকীকরণের চেষ্টা বলেছেন, তা সম্ভবত disintegrationএর প্রতিশব্দ। এবং গোরা-পরবর্তী উপন্যাস ঘরে বাইরের প্রসঙ্গে তৎকালীন একজন সমালোচক সে কথাই বলেছিলেন, আরো কঠোর ভঙ্গিতে—

> রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিখিলেশকে পরিবারবিমুখ করিয়া, আত্মসর্বস্বময় করিয়া, সংকীর্ণতার বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিয়া, তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের নহে।[৮]

নিখিলেশ পরিবারবিমুখ বা আত্মসর্বস্ব না হোক, disintegrated। সমাজ থেকে সে অবচ্ছিন্ন, ধ্যান-ধারণার নিঃসঙ্গ মৌলিকতায় তাকে প্রায় 'সমাজচ্যুত' বলা যেতে পারে। সত্যই সে ভারতীয়তার যান্ত্রিক

---

৬ নৌকাডুবি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড পৃ ২৪৫

৩২

৭ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ১৪২

৮ 'সাহিত্য', আষাঢ়, ১৩২৫, পৃ ২২৯-৩০। 'রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীআদিত্য ওহদেদার অংশটি উদধৃত করেছেন।

একজন প্রতিভূমাত্র নয়। এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার এমন কোনো আসক্তি নেই যা তার মানব-স্বভাব আচ্ছন্ন করতে পারে:

> আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ির সুবিধের জন্য ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে ওটা দুর্বলতার গোঁজামিলন।

নিখিলেশের এই কথাটা যে নিছক অধ্যাত্ম পূর্বসংস্কারের অভ্যাসে বলা হয়নি, তার ভিত্তি যে একান্ত মানবিক সৌন্দর্যচিন্তা ও শিল্পসংবিতের মধ্যে, তার একটি নজির রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' নামক সমালোচনা-গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত করছি—

> সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপর দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে; ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।[১]

নিখিলেশের চরিত্রের মর্মকথা এখানেই অনুস্যূত হয়ে আছে। নিখিলেশ প্রবৃত্তিকে পুরোমাত্রায় জ্বলে উঠতে দেয়নি, সঞ্চালিত করে দিয়েছে মাত্র। সুতরাং যাঁরা সন্দীপকে প্রবৃত্তি এবং নিখিলেশকে নিবৃত্তি বলেন, তাঁরা বাহির-দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবৃত্তির প্রকাশ্য অত্যাচার নিখিলেশে নেই, এবং প্রবৃত্তির অঙ্গার থেকে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গকে সে প্রশ্রয় দেয়নি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই প্রাণদ উত্তাপটুকুকে সে স্বীকার করে না; স্বীকার সে করেই, কিন্তু তার উপর একটি শর্ত আরোপও করে বলে, 'প্রবৃত্তির সঙ্গে একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায়, তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।' অর্থাৎ নিখিলেশ আগে থেকে চিহ্নিত হয়ে নেই; তার স্বগতোক্তির স্রোতোরাশি এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের তমঃপুঞ্জ পার হয়ে সে চলেছে এবং চলতে চলতে বুঝেছে, 'ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা।' এই ঝোড়ো রাস্তার অন্য নাম experience যার মধ্য দিয়ে নিখিলেশ যথার্থ innocence-এ পৌঁচেছে। ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রথমে যে-নিখিলেশকে দেখি, তার সঙ্গে শেষের নিখিলেশের পার্থক্য নেই তা নয়; শেষের নিখিলেশ অনেক রক্ত অনেক স্বাস্থ্য ঝরিয়ে কৃশ, ক্লান্ত এবং তার সেই কৃশতা এবং ক্লান্তির মধ্য থেকে তার ভিতরে যে-বিশ্বাস জেগে উঠেছে তাকে বলতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বাস। শান্ত রস তার চরিত্রের একটি আপাতলক্ষণ, একটি আবরণ, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ বা চারিত্র নয়।

চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে প্রায় সমকালীন। কালক্রমের বিচারে চতুরঙ্গ ঘরে বাইরের ঈষৎ আগে লেখা হলেও, ভাবগত আধুনিকতার দিক থেকে তা ঘরে বাইরে অপেক্ষা অগ্রসর বলে ঘরে বাইরে আলোচনার পরেই চতুরঙ্গ-প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করছি। বিশ্লেষণের দিক থেকে সুবিধার্থেও ভাবক্রমটির উপরেই এখানে জোর দিচ্ছি। চতুরঙ্গ উপন্যাস, নানা দিক থেকেই, আমাদের সময়ের অন্যতম একখানি আধুনিক উপন্যাস। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষণীতে বলাকা ও চতুরঙ্গ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে পাঠকের কাছে অনেক সংকেত উন্মোচিত হতে পারবে। যে বুনো হাঁসের দল ডিম পেড়েছিল, ঘর বেঁধেছিল, তারা শুধু বলাকায় নেই, চতুরঙ্গেও আছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস বা প্রচলিত নাস্তিক্যে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা চতুরঙ্গে আবার অন্য-কোনোখানে অগ্রস্রিয়মাণ। যুক্তিনির্ভর

---

১ 'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ ৩৫৭

পজিটিভিজ্‌ম থেকে ভক্তিনির্ভর বৈষ্ণব ধর্মের পথিক শচীশ যে শেষ পর্যন্ত কোথাও স্থিত হল না, স্থগিত হল না—তার কারণ, উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এর মধ্যে আরো বিপ্লবী হয়ে উঠেছে। 'যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি ক'রে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি'—নিখিলেশ বলেছিল। শচীশের সত্যও অন্তরের সত্য। পার্থক্য, শচীশের আন্তর সত্য অন্তর্জগতে পর্যাপ্ত ও পরিস্ফুট হতে চায়, বাহিরের ঘটনা-পরিবেশকে নিয়ে তার করণীয় কিছুই নেই। শচীশের মধ্যে চরিত্রের বিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি চূড়ান্ত momentum বা গতিরূপ লাভ করেছে। বিবর্তন, না জন্মান্তর বলব? রবীন্দ্রনাথ নিজের উপান্ত্য পর্যায়ের রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন—

> All of us have different incarnations in this very life. We are born again and again in this very life. When we come out of one period, we are as if born again.[১০]

শচীশের মৃত্যু ঘটেছে অনেকবার, জন্মও। ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা শচীশের একখানি মালা। এই মালা যার প্রাপ্য, সেই দামিনীর শত জন্মান্তরও আধুনিক চরিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বিমলা ও দামিনী সতীর্থা, দুজনেই পরিণামী সমুদ্রের দিকে গেছে, আপেক্ষিক স্বচ্ছন্দ ও সংকীর্ণ ধারণা পার হয়ে-হয়ে। কিন্তু দামিনী বিমলার চেয়ে আরো আশ্চর্য, তার তরঙ্গের বেগ ও বিস্তার আরো অনেক বেশি। পঞ্চভূতের 'নরনারী' রচনায় নারীকে 'প্রলয়কারিণী কার্যশক্তি' বলা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে, 'রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধু ধু করিয়া উঠে।' দামিনী বহির্বিপ্লবে যোগ দিয়েছে এবং তার ফলে তার পরিবেশ নয়, তার নিজের জীবনই নিমেষের মধ্যে ধু ধু ক'রে উঠেছে। দামিনী সেই মানবী, পুরুষচরিত্রের মতোই যে নিজেকে অনিঃশেষ খুঁজেছে, বিপর্যস্ত হয়েছে এবং যার মধ্যে জীবজিজ্ঞাসা ও দিব্য অতৃপ্তি মিলে গেছে। তার কাছে পরবর্তী সোহিনীও রক্তাল্পতায় বিবর্ণ।

'সর্বাপেক্ষা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary) বলে যে-বিচারক চতুরঙ্গকে অভিযুক্ত করেন তিনি মানবচরিত্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। মানবচরিত্র, বিশেষত পুরুষচরিত্র সর্বদাই অসম্পূর্ণ এবং অ-নির্ধারিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর শেষের দিকের রচনায় এ-প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা তাঁর এই পর্বের উপন্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে—

> পুরুষের কর্মপথে এখনও তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয়নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টি-কর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানেনি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।[১১]

অতঃপর এই নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ চরিত্রায়ণের মুহূর্তে নিজেকেই দিয়েছেন। এবং সৃষ্টিকালে আরো একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা চরিত্রের মসৃণ স্থাপত্যকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত—সে হল অবচেতনার সমস্যা। এখানে ফ্রয়েড বা ইয়ুং-এর প্রভাব খোঁজার সুযোগ এসে পড়ে, কিন্তু তা তত্ত্ব-তুলনার পর্যায়ে পড়বে বলে সে-প্রলোভন সংবরণ করছি। এখানে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসী আধুনিকতা লক্ষ্য ক'রে আমরা শুধু বিস্মিত স্তম্ভিত হতে পারি। প্রতি-দিনের নির্মিত ও নির্মীয়মাণ মানবচরিত্রকে অন্ধকার অবচেতনা এসে যে নিরাকার করে তুলতে পারে, নির্বস্তুক

১০ *Forward*, 23 February, 1936। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থের শেষে শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সংকলিত তথ্যপঞ্জী থেকে উদ্‌ধৃত।

১১ যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, পৃ ৩৭৯

উপাদানে ফিরিয়ে দিতে পারে, গিরিগুহাগাত্রে শিলালেখের মতো উৎকীর্ণ ক'রে সেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ নির্মম ভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কয়েকটি অনিবার্য দৃষ্টান্ত—

১. তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথম ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।—চতুরঙ্গ

২. যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই; এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'।—চতুরঙ্গ

৩. পরস্পরের আঁচলে চাদর বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্চে সেই দৃশ্যটা, আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস্ অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল স্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন্মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে। কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে।—যোগাযোগ

৪. একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের, সে-জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে এমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল ব'লে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায়নি—কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তার গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে, সেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।—যোগাযোগ

শৈবলিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে আবার অনায়াসে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, পক্ষান্তরে চরিত্রকে অস্তিত্বের সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, নিষিদ্ধ সেই অগ্নিপ্রপাতকে এড়িয়ে তাকে পালাতে দেননি। এমন কি, বিপ্রদাসের মতো সুস্থ সুন্দর যুধিষ্ঠিরকেও তিনি সংশয়বিদ্ধ করেছেন, বিধিবহির্ভূত চিন্তার নরকে নিয়ে এসেছেন। আর কুমুদিনীকে, তিনি নিষ্ঠুরতম নিয়তির মতো কৌতূহলে, গভীর গুহার দিকে নম্র বেদনায় অগ্রসর দেখেও আশু কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। (যোগাযোগ উপন্যাসের পরিণাম অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই সচেষ্ট প্রবর্তনার ফল, কিন্তু ততক্ষণে কুমুদিনী-চরিত্র সম্পূর্ণ আকার নিয়েছে।) এই সূত্রে একটি কথা অশোভন হবে না। বিপ্রদাস না থাকলেও কুমুদিনী-চরিত্রের মূল সূত্রটি হারিয়ে যেত না। বিপ্রদাসের কাছে গীতা আর কুমারসম্ভব সে পড়েছে, এবং বিপ্রদাসের সাহায্যেই তার জীবন-দর্শন ও মনের গড়নটি দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিপ্রদাস তার অন্তরার মুক্তিদাতাও বটে। বিবর্তনের মুহূর্তে কুমুদিনী একা, যেমন একা আশ্রম থেকে স্বনির্বাসিত শকুন্তলা। এবং কুমুদিনী চরিত্র সেই অস্তিত্বের বিপন্নতার মুখেই ফুটে উঠেছে। তার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তার চরিত্রকে আরো অনেক ঋদ্ধ করেছে, সম্ভাবনায় উন্মীলিত করেছে। সেখানে বিপ্রদাসের কোনো করক্ষেপ নেই। এই প্রসঙ্গটিকে আরো প্রসারিত করে এ কথা বলা হয়তো সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনায় তাঁর নাটকে চরিত্রের এই স্বাধীন বিবর্তন খণ্ডিত। তাঁর উপন্যাস এই অর্থে অনেক নাটকীয়। চরিত্রের

স্বাধিকার ঘটনার কাছে অভিভূত না হলেও ঘটনাই তার পরিণতি নিয়ে আসে। স্বাধিকার যত প্রকট, ট্র্যাজেডি ততই তীব্র। চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেছেন—

> নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপরে নির্ভর করে তা নয় চার দিকের ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, এক দিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ ও আরেকদিকে তার বাহিরের সংবাধ।[১২]

এলা-অতীনের নিয়তিসংকুল প্রেমের প্রবাহে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ 'চরিত্রের বিশেষত্ব' বলতে কোনো পূর্বনির্ণীত স্থাবর স্বভাবের কথা বলছেন না—চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্ব ও নিঃশর্ত বিবর্তনের উপরেই জোর দিচ্ছেন।

এই কারণেই তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রতিটি অংশের অঙ্গাঙ্গী সংগতি যাঁরা খুঁজেছেন, ভুল বুঝেছেন। নীরজাকে যে-আদিত্য এত নিবিড় ভালোবেসেছিল, সে কি করে সরলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারল? এবং যদি-বা সেই আকর্ষণ তার মধ্যে জেগে থাকে, তা অত আকস্মিক কেন, একটি পূর্বাঙ্কুরও তো থাকতে পারত। উত্তরে বলা চলে, চরিত্রের অন্তর্নিহিত অবচেতনের স্মৃতি দুর্মর বেগে জেগে উঠে কি রকম পরিচিত পরিবেশকে বদলে দেয়, paramnesia নামক মনস্তাত্ত্বিক সত্যে তার পরিচয় আছে। রোমান্টিক কবিদের রচনায় এটি একটি এষণা (motif) এবং রবীন্দ্রনাথ সেটিকেই এখানে ব্যবহার করেছেন। মালঞ্চ উপন্যাসের ত্রুটি তবু হয়তো এখানে যে তার মিতাখ্যান সংযম পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের পথে যতটা সময় প্রয়োজন তার চেয়েও কম সময় নিয়েছে। অর্থাৎ মালঞ্চ নাটকীয়তায় আক্রান্ত। প্রায়-শ্বাসরোধী। মনে হয়, দুই বোনে চরিত্রকে ঘিরে তত্ত্ববিশ্লেষণের যে তাগিদ, তা থেকে নতুন পথে যাবার জন্যই মালঞ্চ লেখা হয়েছিল।

এই সময় সংলাপের উপরে যে এত জোর পড়ল, সে-ও একই কারণে। সংলাপ চরিত্রেরই মুকুর। কিন্তু অনেক সময় প্রতিবিম্ব যেন মুখের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে। আধুনিক কালের উপন্যাসের সংলাপ বা শব্দসজ্জা অত্যন্ত জরুরী একটি প্রয়োজন। একজন সমালোচক তো এমনও বলেছেন—

> Character is merely the term by which the reader alludes to the pseudo objective image he composes of his responses to an author's verbal arrangements.[১৩]

এতদূর চরমপন্থী না হয়েও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের চরিত্রেরা শব্দকেই একটি মৌল মূল্যবোধরূপে আশ্রয় করেছে, এবং তাদের ভাষা কাব্যভাষা বা poetic diction। ভাষাশিল্পী এই চরিত্রগুলি অনেক সময় বাক্‌পটুতায় যুক্তির (reason) পরিবর্তে ওজর (rationalization) দিয়েছে। অমিত রায় এই শ্রেণীরই চরিত্রের পুরোধা।

এই পর্বের চরিত্রেরা জানে যে তারা পূর্ণতার পটভূমি থেকে বিচ্যুত এবং তারা সে বিষয়ে মর্মান্তিকরূপে সচেতন। মধুসূদনের প্রবৃত্তি এবং অমিতের ধীবৃত্তি দুয়েরই সীমা আছে এবং এ নিয়ে উভয়েরই মন সংকুচিত। 'এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে'—এ কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে অভীক

১২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩-৪৪

১৩ Martin Turnell-এর *The Novel in France* গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত C. H. Rickword-এর মন্তব্য।

এই শ্রেণীর চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সমগ্র থেকে এরা বিচ্ছিন্ন বলেই সমস্তকে আঁকড়ে ধরে পেতে চায় এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকট রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> Man must realize the wholeness of his existence, his place in the infinite.···Deprived of the background of the whole, his poverty loses its one great quality which is simplicity···In literature we miss the complete view of man which is simple and yet great. Man appears instead as a psychological problem, or as the embodiment of a passion that is intense because abnormal, being exhibited in the glare of a fiercely emphatic artificial light. [১৪]

রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ পর্ব সম্বন্ধে অনেক সময় এ-অভিযোগ উঠতে পারে, যে, সরল মহিমার সেই মানুষটির সাক্ষাৎ সেখানে আর মিলছে না। এ কথা ঠিক যে abnormal বা অস্বাভাবিক চরিত্রের ভিড় সেখানে বেড়েছে কিন্তু খণ্ডিত চরিত্রের সঙ্গে পূর্ণতার দ্বন্দ্ব সংঘটনই সেসব স্থলে লেখকের উদ্দেশ্য।

'তিন সঙ্গী' উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তিনটির মধ্যেই একটি ঐক্যসূত্র আছে এবং এর মধ্যে যে-কোনো দুটি অপরটির উপকাহিনী হতে পারত। এই গ্রন্থের এক-একটি চরিত্র উপন্যাসের চরিত্রের মতোই একটি ব্যাপক পটভূমি নিয়ে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, সবশেষে শুধু একটি ছোটগল্পের চমক রেখে যায়। আরো একটি দার্শনিক সূত্র আছে, empiricism। ইতিপূর্বে তাঁর নায়কেরা সম্পূর্ণতার যে-আস্বাদ ও মুক্তির মধ্যে নিস্ক্রমণ পেয়েছে এই পর্বে তার জায়গা জুড়েছে একরকম ক্ষণসাম্প্রতিক বোধ। তাই নবীনমাধবকে বলতে হয়—

> সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে চরিত্রের সেই প্রাণসেতু এখানে আর পাওয়া যাবে না। প্রকৃতি এখানে চরিত্রকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তার আপন চৈতন্যের ভরকেন্দ্র থেকে। নবীনমাধব ও অচিরার একটি কথোপকথনের ঈষদংশ—

> 'আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।'
>
> 'তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই অন্ধশক্তি। সেই জন্যেই আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করিনে, লজ্জা পাই।'
>
> 'কেন করেন না।'
>
> 'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।'[১৫]

প্রকৃতি ও চরিত্রে নিয়তি ও পুরুষকারের এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কথাসাহিত্যের একটি ফলুলক্ষণ। তাঁর চিত্রশিল্পে এই দ্বন্দ্ব যে জায়গা পেয়েছে, এখানে তা পায়নি, কিন্তু তা বলে যেটুকু পেয়েছে তাও উপেক্ষণীয় নয়।

কোনো এক বিদেশী সাময়িক পত্রের সমালোচক ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে একবার ডস্টয়েভ্স্কির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ঘরে বাইরে উপন্যাসের সূত্রে তিনি এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বলেছিলেন—

---

১৪ 'The Relation of the Individual to the Universe', *Sadhana*, pp 9-10

১৫ তিন সঙ্গী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃ ৩১৪-৩১৫

শিল্পী হিসেবে যে এ দুজনের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যরেখা টানা যায়, তা নয়। এ যেন ক্যাথিড্রাল অর্গ্যানের সঙ্গে একটি বাঁশির তুলনা। তা ছাড়া, সেই মহৎ রুশ লেখকের পটভূমিকা হল একটি গভীর খ্রীষ্টীয় জীবনবোধ। কিন্তু দুজনেই মূলত প্রাচ্যধর্মী; মানবিক মহত্ত্বের অন্তর্লীন আদর্শ সম্বন্ধে দুজনের ধারণায় অনেক মিল।[১৬]

ডস্টয়েভ্‌স্কির রাজসিক নায়কচরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নায়কদের পার্থক্য অনেকাংশেই দুস্তর; কিন্তু absolute বা সম্পূর্ণতার বুভুক্ষায় তারা সবাই সংকীর্ণ পথ ছেড়েছে; আবার সামাজিক সত্যকে যেমন তারা উপেক্ষা করেছে, তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবন-সত্যকে পাবার জন্য ঝুঁকিও নিয়েছে। অপর সাদৃশ্য, আত্মক্ষয়ী ব্যক্তি-চরিত্রের অহংকে এঁরা কেউই প্রশ্রয় দেননি, দাস্যরসের অশ্রুময়তায় প্রেমের কাছে, পরমের কাছে তার মাথা নত করেছেন। টলস্টয়ের 'এপিক-সুলভ উদাসীনতা এবং—তাঁরই ভাষায়—পৃথিবীর মস্ত প্রজাপতির গুটি থেকে নিরাসক্ত প্রজাপতির মতো বেরিয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নেই। তাঁর উপন্যাস, ডস্টয়েভ্‌স্কির মতোই, জীবনকে ভালোবেসে জীবনের সঙ্গে জড়িত হবার শিল্প।

এখানেই স্তাঁদাল বা প্রুস্ত্‌-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। খরবুদ্ধির সাহায্যে স্তাঁদালের যে-সব চরিত্র সমাজের বাইরে এসে সমাজকে আক্রমণ করে, রবীন্দ্রনাথের নায়কেরা তা করে না। প্রুস্ত্‌-এর মতোও তারা আপন অনুভূতির তন্তুজালে অন্তরীণ নয়, অথবা জীবন-বিন্যাসের বৃহৎ ব্যাপার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী সময়-চেতনার মধ্যে বাস করে না। একই সঙ্গে আত্মলীনতা এবং আত্ম-উত্তরণ তাঁর চরিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য অথবা ঈপ্সিত লক্ষ্য।

চরিত্রের এই পরমতা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপহার। শরৎচন্দ্র এখান থেকেই যাত্রা সূচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের ফলশ্রুতি রসোজ্জ্বল একটি আখ্যানের সমগ্রতা, চরিত্রের নয়। দু-তিনটি সমকালীন উদাহরণ বাদ দিলে, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস চরিত্রের এই বিবর্তনকে স্বীকার করেছে কিনা সন্দেহ। হয়তো শতচ্ছিন্ন আমাদের সময়ের বাসনালোকেও এই পূর্ণাভিমুখী বিবর্তনের জন্য কোনো বেদনা কিংবা প্রত্যাশা নেই। এবং শতধা সমাজের disintegration-কে মেনে নিয়েও যে বিব্রত ব্যক্তিসত্তা পূর্ণপ্রয়াণের পথে ত্বরান্বিত হতে পারে, এমন কোনো প্রবণতা শক্তিমান শিল্পীদের অধিকাংশের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না।

সোফোক্লেস জীবনকে স্থিরভাবে আর সমগ্রভাবে দেখেছিলেন, ম্যাথু আর্নল্ডের অভিমত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যও সমগ্র জীবনকে স্থির ও গভীরভাবে দেখা। এবং যেহেতু আত্মসন্ধান এবং জীবনসন্ধিৎসা রবীন্দ্রচরিত্রের মূলসূত্র, তাঁর রচিত চরিত্রাবলীতে তার আভ্যন্তরিক অভিজ্ঞান আছে। এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন, রবীন্দ্রনাথেরই মতো, সমস্ত জীবন ছেঁকে সমগ্রতার স্যমন্তক মণি অর্জন করেছে।

[প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮]

১৬ *The Church Times* 1.8. 1919। A. Aronson-এর *Rabindranath Through Western Eyes* গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।